গ্রামের নাম কাঁকনডুবি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

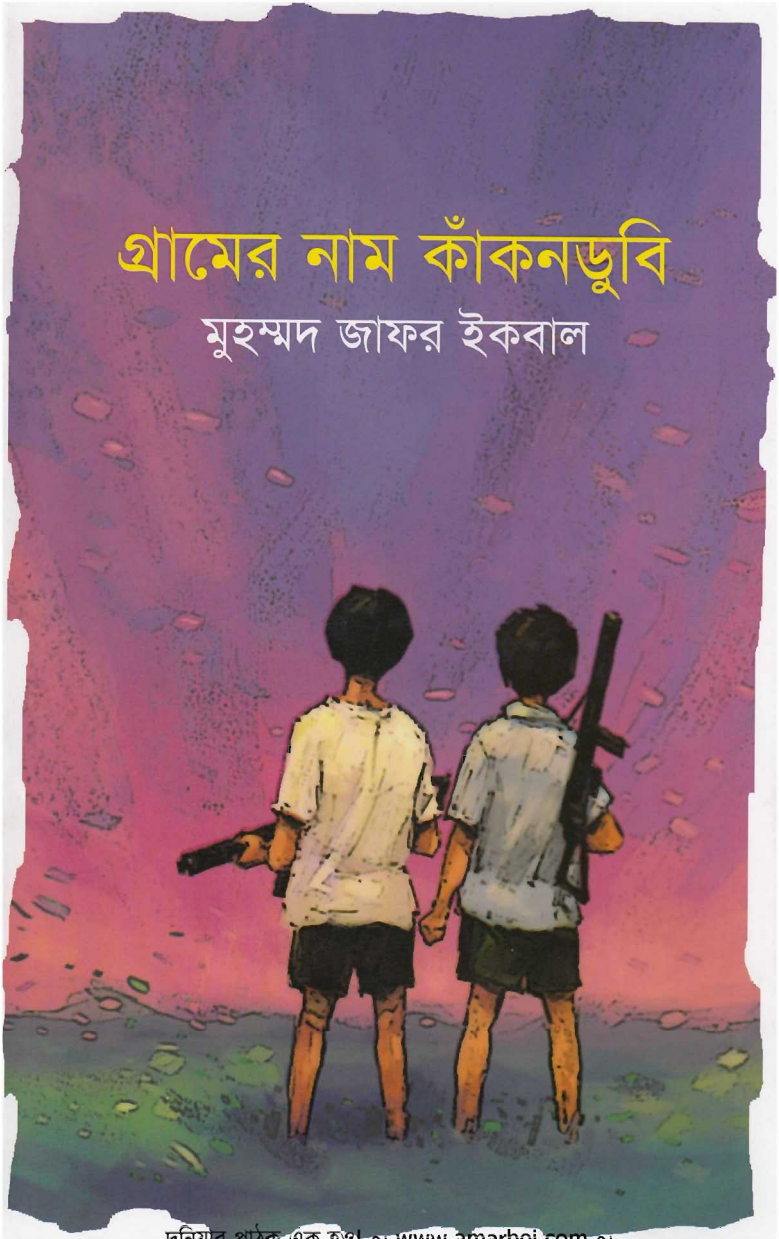

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

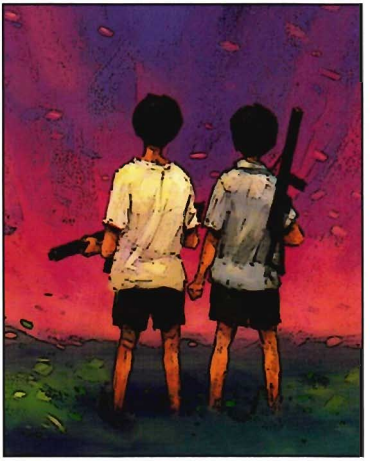

মেয়েগুলো আমাদের দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি এত আশ্চর্য যে আমার বুকটা ধক করে উঠল। এত তীব্র দৃষ্টি আমি কখনো দেখিনি, সেখানে কোনো ভয় বা আতঙ্ক নেই, দৃষ্টিটা আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ। আমি কী বলব, বুঝতে পারলাম না। ঢোঁক গিলে বললাম, "আপনাদের আর কোনো ভয় নাই। যুদ্ধ শেষ। খোদার কসম। যুদ্ধ শেষ।"

লালচে চুলের একটা মেয়ে, যার চোখের দৃষ্টি সবচেয়ে ভয়ংকর, সে আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তোমাদের যুদ্ধ শেষ। আমাদের যুদ্ধ শুরু।"

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আরাফাত করিম
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

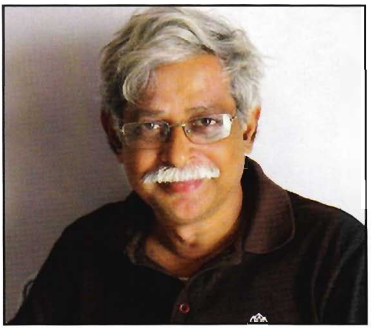

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র : তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

* পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ
* বাপ্পার বন্ধু
* ইস্টিশন
* রাশা
* শুকনো ফুল রঙিন ফুল
* কেপলার টুটবি
* যারা বায়োবট
* অবনীল
* জলজ
* এক টুকরো লাল সবুজ কাপড়
* নিউরনে অনুরণন
* নিউরনে আবারো অনুরণন
* গণিতের মজা মজার গণিত
* আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড, প্রশ্ন ও উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

তাম্রলিপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

গ্রন্থস্বত্ব : প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

তাম্রলিপি : ২৭৭

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আরাফাত করিম

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪০০.০০

GRAMER NAM KAKONDUBI
By : Muhammed Zafar Iqbal
First Published : February 2015 by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 400.00

ISBN-984-70096-0277-1

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সেই কিশোরী, তরুণী আর নারীদের—,
যারা একাত্তরে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.

স্কুল ছুটির পর আমি আর মামুন কালী গাংয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলাম। বটগাছের কাছে এসে সড়কটা যেখানে পুব দিকে মোড় নিয়েছে, ঠিক সেখানে বলাই কাকুর চায়ের স্টল। বলাই কাকু মনে হয় সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ভালো চা বানায়— তার একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো কেতলি আছে, সেখানে পানি গরম করলেই চায়ের লিকার বের হয়, সেটা গ্লাসে ঢেলে তার মাঝে যখন ঘন দুধ আর চিনি দিয়ে বলাই কাকু আচ্ছা মতন ঘুঁটে দেয়, তখন তার যা একটা স্বাদ হয়, সেটা বলার মতো না। চা খাওয়ার জন্য নগদ পয়সা আমাদের কারোরই থাকে না— কিন্তু যদি চায়ের স্টলে খরিদ্দার না থাকে তাহলে বলাই কাকু আমাদের ছোট ছোট গ্লাসে হাফ কাপ ফ্রি চা বানিয়ে দেয়। আমাদের জন্য দুধ-চিনি বেশি করে দেয়। তাই বাড়ি যাবার সময় আমরা প্রত্যেক দিনই বলাই কাকুর চায়ের স্টলে একটু উঁকি দিয়ে যাই।

আজকে উঁকি দেওয়ার আগেই শুনলাম ভেতরে কোনো একজন উঁচু গলায় কথা বলছে। গলার স্বরটা অপরিচিত, তাই স্টলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। শার্ট-প্যান্ট, চোখে চশমা, হাতে সিগারেট কমবয়সী একজন মানুষ হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে, কী বলছে আমরা ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলাম না। তার পরেও বুঝে গেলাম নিশ্চয়ই রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে। ইলেকশনের পর থেকে সবাই সব সময় আজকাল রাজনীতি নিয়ে কথা বলে। চশমা চোখের কমবয়সী মানুষটার সামনে আমাদের গ্রামের দুইজন মুরব্বি বসে আছে। তারা সব কথা বুঝে ফেলছে, সেই রকম ভান করে মাথা নাড়ছে, কিন্তু তাদের মুখ দেখেই বুঝে গেলাম তারা আসলে কিছুই বুঝতে পারছে না। হালচাষ, গরু-ছাগল ছাড়া তারা কিছুই বোঝে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চশমা চোখের কমবয়সী মানুষটাকেও আমরা চিনতে পারলাম না। আমাদের কাঁকনডুবি গ্রামের মানুষ না— কাঁকনডুবি গ্রামের সবাইকে আমরা চিনি। শুধু মানুষ না এই গ্রামের সব গরু-ছাগলকেও আমরা চিনি। এই মানুষটা অন্য জায়গা থেকে এসেছে, দেখে মনে হয় শহর থেকে এসেছে। শহরের মানুষদের দেখলেই চেনা যায়, তারা অন্য রকম করে চুল কাটে। তা ছাড়া গ্রামের মানুষদের চোখে কখনো চশমা থাকে না।

আমি মামুনকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "মানুষটা কে?"

আমি যেহেতু চিনি না তাই মামুনেরও চেনার কথা না, কিন্তু মামুন আমার থেকে অনেক বেশি খবর রাখে। মানুষটাকে না চিনলেও কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে— সেটা জানতেও পারে। কিন্তু সেও চিনল না, মাথা নেড়ে বলল, "চিনি না। আগে দেখি নাই।"

"কোনো বাড়িতে আসছে মনে হয়?"

"মনে হয় কোনো বাড়িতে আসে নাই।"

"তাহলে?"

মামুন দাঁত বের করে হাসল, বলল, "মনে হয় বিয়া করতে আসছে। কাঁকনডুবির জামাই।"

"জামাই?"

মামুনের বুদ্ধি অনেক বেশি, এই সব বিষয় সে খুব ভালো অনুমান করতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে বিয়ে করবে?"

মামুন মুখ টিপে হাসল, বলল, "মনে হয় লতিফা বুবুকে।"

লতিফা বুবু ছিল আমাদের লিডার, যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা সবাই লতিফা বুবুর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতাম। লতিফা বুবু লেখাপড়াতেও খুব ভালো ছিল, আমাদের থেকে দুই ক্লাস উপরে পড়ত কিন্তু যখন একটু বড় হয়ে গেল তখন তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামের মেয়েরা যখন ছোট থাকে তখন স্কুলে যায়, যখন একটু বড় হয় তখন তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। লতিফা বুবুর বিয়ের কথা হচ্ছে, মামুন মনে হয় ঠিকই বলেছে। এই চশমা পরা মানুষটা মনে হয় লতিফা বুবুকেই বিয়ের জন্য এসেছে। লতিফা বুবু যখন ছোট ছিল, আমাদের নিয়ে জঙ্গলে-মাঠে ঘুরে বেড়াত তখনই তার চেহারা খুব ভালো ছিল, এখন চেহারা আরো ভালো হয়েছে। বাড়ি থেকে বের হয় না তাই বেশি দেখা হয় না কিন্তু যখন দেখা হয় তখন তাকে চিনতেই পারি না। শাড়ি পরলেই মেয়েরা অন্য রকম হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই কাকুর চায়ের স্টল থেকে বের হয়ে আমরা আবার সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে আমাদের গ্রামের ভেতর ঢুকে গেলাম। সড়কটা গ্রামের ঠিক মাঝখান দিয়ে গিয়েছে, দুই পাশে ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির সামনে গাছপালা, বড় বড় বাঁশঝাড়। বাড়ির বাইরে গরু বেঁধে রেখেছে, গরুগুলো খুবই শান্ত ভঙ্গিতে খড় চিবিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখে কেমন যেন শান্তি শান্তি ভাব, মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় মানুষের থেকে বুঝি এই গরুদের মনেই শান্তি বেশি! অনেক মানুষ আছে তাদের মানুষ না হয়ে গরু হয়ে জন্ম হলেই মনে হয় ভালো ছিল।

সড়কের নরম ধুলায় পা ডুবিয়ে হাঁটতে কী মজাই না লাগে। জুতো জিনিসটা আবিষ্কার হয়েছে কেন, কে জানে? জুতো পরে এই নরম ধুলার মাঝে হাঁটার মধ্যে কি কোনো মজা আছে? তারপর যখন বৃষ্টির সময় আসবে তখন এই সড়কে যে কাদা হবে সেই কাদার মাঝে কার বাবার সাধ্যি আছে জুতো পরে হাঁটবে? মনে হয় সেই জন্যই কাঁকনডুবি গ্রামে জুতো-স্যান্ডেল পরে সে রকম মানুষ বলতে গেলে কেউ নাই।

আমি আর মামুন গল্প করতে করতে গ্রামের মাঝামাঝি চলে এলাম, মামুন তখন তার বাড়িতে ঢুকে গেল, বাকি পথটা ধীরে-সুস্থে একা একা হেঁটে আমি আমার বাড়িতে এসে উঠানে মাত্র পা দিয়েছি, তখনই নানি চিৎকার করতে শুরু করল। আমার মনে হয় সারা কাঁকনডুবিতে নানির মতো আর কারো গলায় জোর নাই!

আমাকে দেখেই নানি চিৎকার করে হাত-পা নেড়ে বলতে শুরু করল, "এই যে! এই যে লাট সাহেবের বাচ্চা এখন বাড়ি এসেছেন। কখন স্কুল ছুটি হয়েছে আর লাট সাহেবের বাচ্চার এখন সময় হলো বাড়িতে আসার!"

কথাটা সত্যি। স্কুল ছুটির পর কোনো দিনই আমি সাথে সাথে বাড়ি আসি না। এসে কী হবে? একটু ঘুরেফিরে বাড়ি আসি। আজকে অবশ্যি সে রকম দেরি হয়নি কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। নানি ধরে নিল দেরি হয়েছে আর হাত-পা নেড়ে বলতে থাকল, "যদি পেটে কিছু দিতে না হইত তাহলে লাট সাহেবের বাচ্চা মনে হয় বাড়িতেই আসত না। বান্দরের মতো গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াইত।"

নানিকে খেপানোর জন্য বললাম, "বান্দরই ভালো। বান্দরদের স্কুল নাই, লেখাপড়া নাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানি ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর বান্দর।"

আমি হি হি করে হেসে বললাম, "আমি যদি বান্দর হই তাহলে তুমি হলে বান্দরের নানি বান্দরানী।"

নানি তখন রেগেমেগে আমাকে ধরার চেষ্টা করল, পারল না। আমি নিজে থেকে ধরা না দিলে নানি কি কোনো দিন আমাকে ধরতে পারবে? মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছা করে ধরা দিই, নানি তখন আমার কান মলে দেয়, চুল ধরে টান দেয়— ভান করে খুব রেগেমেগে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে, আসলে ওসব কিছু না। আসলে আমাকে একটু আদর করে দেয়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়, আধো আধো ঘুমের মাঝে আমি দেখি নানি আমার পাশে বসে আমার মাথায়, চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে কিছু বলছে। নানি ছাড়া আমার আর কেউ নাই, নানি আমাকে দেখেশুনে না রাখলে আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি না থাকলে নানিও নিশ্চয়ই এত দিনে মরে-টরে যেত।

নানি একেবারে হাল ছেড়ে দেবার ভান করে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "যা হাত-মুখ ধুয়ে একটু মানুষ হয়ে খেতে আয়।"

খাওয়ার জন্য কেন হাত-মুখ ধুয়ে মানুষ হতে হবে, সেটা নিয়ে আমি আর নানির সাথে তর্ক করলাম না, কলসি থেকে টিনের মগে একটু পানি ঢেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধোয়ার একটু ভান করলাম। নানি একটা পিঁড়ি দিল বসার জন্য তারপর থালায় ভাত বেড়ে দিল।

আমি যখন খেতে বসি নানি তখন পাশে বসে থাকে। তার নকশি করা পিতলের পানের বাটা থেকে পান বের করে, কুচি কুচি করে সুপারি কাটে, তারপর পানে চুন-সুপারি দেয়, জর্দা দেয় তারপর পানটা মুখে পুরে খুবই তৃপ্তি করে চিবুতে থাকে। তখন নানিকে দেখে মনে হয় তার থেকে সুখী মানুষ বুঝি পৃথিবীতে আর একজনও নাই।

নানির কথায়বার্তায় অবশ্যি সুখের কোনো নমুনা থাকে না। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা বলতে শুরু করে। একা একা কথা বললে মানুষ পাগল বলে তাই নানির কথা বলার জন্য একজন মানুষ দরকার। আশপাশে কেউ থাকলেই নানি কথা বলতে শুরু করে, সেই মানুষটা তার কথা শুনছে কি না, নানির সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না। আজকেও নানি কথা বলতে শুরু করল, সেই একই কথা, যেটা আমি একশ বার শুনেছি।

"রঞ্জু। ও রঞ্জু তুই ঠিক করে ক। এই কাজটা কি তোর বাপ-মা ঠিক করল? আমি বুড়া মানুষ, আমার ঘাড়ে তোর দায়িত্ব দিয়া তোর বাপ-মা দুইজন চইলা গেল? কাজটা কি ঠিক হইল?"

আমি কোনো কথা না বলে খেতে থাকি। নানি আসলে আমার মুখ থেকে কোনো উত্তর শুনতে চায় না, এমনিই বলে।

"আমি তোর বাপরে বললাম, দিনটা ভালো ঠেকে না। মনের মাঝে কু-ডাক দেয়। বাবা আজকে না গেলে হয় না? তোর বাপ হাসে। বলে আম্মাজান কুনো ভয় নাই। আপনার মেয়ের দায়িত্ব আমার। বুকে থাবা দেয় আর কয়, শরীলে যতক্ষণ দম আছে আপনার মেয়ের কিছু হতে দিমু না। তা কথা মিছা কয় নাই।"

নানি তার আঙুলের ডগায় লাগানো চুন জিবের ডগায় লাগিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "শরীলে যতক্ষণ দম ছিল তোর মায়ের কিছু হইতে দেয় নাই। যখন দম শেষ তোর বাপ শেষ, তোর মাও শেষ। রাক্ষুসী কালী গাং তোর মুখে আগুন তোর চৌদ্দ গুষ্টির মুখে আগুন তুই জাহান্নামে যা, হাবিয়া দোজখে তুই জ্বলেপুড়ে মর। মুখে রক্ত উঠে তুই মর, তুই নির্বংশ হ, তোর বংশে বাতি দেওয়ার জন্য যেন কেউ না থাকে—"

নানি এমন ভাবে কালী গাংকে অভিশাপ দিতে থাকে, যেন সেটা একজন মানুষ। নানির কাছে শুনেছি আমার বাবা-মা কালী গাংয়ে ডুবে মারা গেছে, নৌকা নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঝড় উঠেছে, কিছু বোঝার আগে নৌকাটা পাক খেয়ে ডুবে গেছে। আমি ছোট, নানির কাছে ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। বাবা খুব ভালো সাঁতার জানত, মাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে বাঁচতে পারে নাই। আমার কিছু মনে নাই, বাবা-মায়ের চেহারাও কোনো দিন দেখি নাই। বাড়িতে তাদের একটা ফটোও নাই।

নানি পান চিবুতে চিবুতে একটু এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে, "রঞ্জু, ভাইডি তুই খুব সাবধানে থাকবি। বাপ-মা থাকলে তার দোয়া থাকে। তোর বাপও নাই, মাও নাই। তোর জন্য দোয়া করার কেউ নাই—"

আমি বললাম, "তুমি দোয়া করবা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নানির দোয়া কামে লাগে না। বাপ-মা অন্য রকম—"

"তোমার দোয়া কামে না লাগলে আমার দোয়ার দরকার নাই। দোয়া ছাড়াই আমি থাকতে পারি নানি—"

খুবই একটা ভয়ংকর কথা বলে ফেলেছি এ রকম ভান করে নানি বলল, "ছি ছি ছি, এই রকম বলে না। দোয়া লাগে। সবার দোয়া লাগে।"

নানি বিড়বিড় করে নিজের মনে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা কথা সব সময় মনে রাখবি রঞ্জু।"

কী কথাটা আমার মনে রাখতে হবে আমি জানি, তার পরেও আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী কথা?"

"তুই কালী গাং থেকে দূরে থাকবি। সব সময় কমপক্ষে একশ হাত দূরে থাকবি। কালী গাংয়ের পানিতে নামবি না, গাংয়ের পাড়েও যাবি না।"

কেন আমার কালী গাংয়ের কাছে যাওয়া নিষেধ, সেটাও আমি নানির কাছে অনেকবার শুনেছি। তার পরও আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কেন নানি?"

"কালী গাং হচ্ছে রাক্ষুসী। তোর বাপরে খাইছে, মা'রে খাইছে, তোরেও খাইতে চায়। তার পানিতে নামলে তোরে খপ করে ধরে পানিতে ডুবায়া দিব, তোরে ছাড়ব না এই রাক্ষুসী তোরে ছাড়ব না—"

নানির কথা শুনে আমার কেমন জানি গা শিরশির করে, মনে হয় সত্যিই বুঝি কালী গাং একটা নদী না— একটা রাক্ষুসী— আমার দিকে তাকিয়ে আছে! কিন্তু আমি অবশ্যি কালী গাংকে ভয় পাই না, অন্যদের সাথে কালী গাংয়ে লাফ দিই, শীতের সময় যখন পানি কম থাকে তখন সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাই। বর্ষার সময় যখন পানির খুব স্রোত থাকে, ঘোলা পানি নদীর মাঝখানে পাক খেতে থাকে, তখন অবশ্যি কোনো দিন পার হবার চেষ্টা করি নাই। কোনো এক বর্ষায় সেইটা করতে হবে। নানি অবশ্যি এগুলো কিছুই জানে না। জানার দরকার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২.

টিফিন ছুটির আগে ব্যাটারি স্যারের ক্লাস। এই স্কুলে সব স্যারদের একটা করে নাম আছে। নামগুলো কে দেয়, কেউ জানে না কিন্তু কীভাবে কীভাবে জানি ছাত্রছাত্রীদের কাছে আসল নামটা চাপা পড়ে যায়। যেমন ব্যাটারি স্যারের নামটা ব্যাটারি তার কারণ স্যার দেখতে ব্যাটারির মতো, খাটো গোল শরীর তার ওপর ছোট মাথা, কোনো ঘাড় নাই। ধর্ম স্যারের শুকনো শরীর, লম্বা গলা, মাথায় আরো লম্বা টুপি, তার নাম বোগলা স্যার। বকের সাথে মিল তাই বোগলা স্যার! ইংরেজি স্যারের তেলতেলে ফর্সা চেহারা ছোট ছোট নিষ্ঠুর চোখ, হাতে বেত নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন, কথায় কথায় বলেন, "ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব" তাই তার নাম ডাণ্ডি স্যার। গায়ের রং কালো বলে বাংলা স্যারের নাম কাউলা স্যার। থুতনিতে ছাগলের মতো দাড়ি বলে উর্দু স্যারের নাম ছাগলা স্যার।

যাই হোক, আমরা যখন ব্যাটারি স্যারের জন্য অপেক্ষা করছি তখন খুবই বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল, ব্যাটারি স্যারের বদলে ক্লাসে ঢুকলেন টিবি স্যার (স্কুলের হেডমাস্টার কিন্তু যক্ষ্মা রোগীর মতো শুকনো বলে নাম টিবি স্যার) কিন্তু সেটা বিচিত্র না কারণ তার পিছু পিছু ক্লাসে ঢুকল কমবয়সী একজন মানুষ, শার্ট-প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। আমি আর মামুন মানুষটাকে চিনে গেলাম, গতকাল বলাই কাকুর চায়ের স্টলে এই মানুষটা হাত-পা নেড়ে রাজনীতির কথা বলছিল।

টিবি স্যার চশমা পরা মানুষটাকে নিয়ে ক্লাসে ঢুকতেই আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, স্যার হাত নেড়ে আমাদের বসার ইঙ্গিত করলেন, আমরা তখন বসে গেলাম। টিবি স্যার একটু কেশে বললেন, "তোমাদের মজিদ স্যারের অসুখ, কিছুদিন ছুটি নিয়েছেন (আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন মনে পড়ল ব্যাটারি স্যারের আসল নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁকনডুবি-২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্দুল মজিদ)। যে কয় দিন ছুটিতে আছেন তোমাদের বিজ্ঞানের ক্লাস নেবার জন্য আমি মাসুদকে অনুরোধ করেছি, মাসুদ পি.কে. কলেজে বিএসসি পড়ে (টিবি স্যার অবশ্যি বিএসসি বললেন না, উচ্চারণ করলেন বি.এচ.চি) সে খুবই মেরিটরিয়াস ছাত্র, আমি তারে অনেক দিন থেকে চিনি। কলেজ বন্ধ এই গ্রামে বেড়াতে আসছে। আমি মজিদ স্যারের ক্লাসটা নিতে বলেছি, সে রাজি হয়েছে। তোমরা খবরদার মাসুদ স্যারকে জ্বালাবে না, মাসুদ স্যারের কথা শুনবে।"

টিবি স্যার আরও কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর মাসুদ স্যার নামে শার্ট-প্যান্ট পরা চোখে চশমা কমবয়সী মানুষটাকে ক্লাসে রেখে চলে গেলেন।

কমবয়সী মানুষটা আমাদের দিকে তাকাল, মনে হলো একটু লজ্জা লজ্জা পাচ্ছে। একটু হেঁটে দুই পা এগিয়ে এসে বলল, "শোনো, আমি কিন্তু তোমাদের স্যার না। আমিও তোমাদের মতো একজন ছাত্র। কলেজের ছাত্র। তাই কেউ আমাকে মাসুদ স্যার ডাকবে না।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী ডাকব?"

"ভাই। মাসুদ ভাই।"

ঠিক কী কারণ জানা নেই। কথাটা শুনে আমাদের সবার কেমন জানি এক ধরনের আনন্দ হলো। স্কুল মানেই অত্যাচার, স্যার মানেই যন্ত্রণা—তখন যদি স্কুলের কমবয়সী একটা স্যার বলে আমাকে মাসুদ ভাই বলে ডাকবে তাহলে আনন্দ হতেই পারে। আমরা আনন্দে হি হি করে হাসলাম, আমাদের ক্লাসে যে অল্প কয়টা মেয়ে আছে, তারাও একজন আরেকজনের কানে কিছু একটা বলে একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে কুট কুট করে হাসল।

চশমা পরা কমবয়সী মানুষটা— যে আমাদেরকে মাসুদ ভাই বলে ডাকতে বলেছে একটু গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মতো বলল, "আমি আসলে কখনো কাউকে পড়াই নাই। কেমন করে পড়াতে হয়, জানি না—তার পরও যখন আমাকে পড়াতে বলেছে, তখন কেন রাজি হয়েছি জানো?"

আমরা মাথা নেড়ে বললাম যে জানি না। তখন মাসুদ ভাই নামের মানুষটা হাসি হাসি মুখে বলল, "তার কারণ আসলে কেউ কোনো দিন কাউকে কিছু শিখাতে পারে না। যার যেটা দরকার, সে নিজেই সেটা শিখে নেয়। মাস্টারদের কাজ হচ্ছে উৎসাহ দেওয়া। আমি এসেছি তোমাদের উৎসাহ দিতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে আমাদের খুবই উৎসাহ হলো। শুধু যে মাসুদ ভাই ডাকব তা নয় মাসুদ ভাই কিছু পড়াবেও না, কোনো লেখাপড়া নাই, কী মজার কথা। কী আনন্দের কথা!

মাসুদ ভাই বলল, "বলো, তোমাদের কী নিয়ে উৎসাহ দেব?"

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, এই ভাবে যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটা বিষয় ঠিক করে দেওয়া যায়, সেইটাও জানতাম না। লেখাপড়া করতে কারোরই ভালো লাগে না, সেটা বলা যায় কিন্তু সেটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারলাম না— লেখাপড়া নিয়ে কথাবার্তা যত কম হয় ততই ভালো। এর মাঝে মামুন দাঁড়িয়ে গেল, বলল, "আমাদের এই গ্রামটার অবস্থা খুবই খারাপ, এইখানে কিছু নাই। থাকার ইচ্ছা করে না।"

মাসুদ ভাই নামের মানুষটা চোখ কপালে তুলে বলল, "বলো কী? এই গ্রামে কিছু নাই? একটা ভরা নদীর পাশে একটা ছোট ছবির মতো গ্রাম! এত সুন্দর একটা স্কুল। কিছু নাই মানে?"

আমরা আবার একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম! সুন্দর স্কুল? স্কুলের কোন জায়গাটা সুন্দর?

মাসুদ ভাই বলল, "আমাদের দেশে আর কয়টা ভালো স্কুল আছে? এ রকম গ্রামের মাঝে বিশাল একটা স্কুল। আশপাশের দশ গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়া করতে আসে। তোমরা যে এই নবকুমার হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সেইটা নিয়ে গর্ব হওয়া উচিত।"

গর্ব হওয়া উচিত কি না বুঝতে পারলাম না, তবে এটা সত্যি কথা আশপাশের সব গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়তে আসে। আমাদের স্কুলের পাকা দালান, সামনে বড় মাঠ, পাশে বিশাল দিঘি। এই এলাকায় আর কোথাও পাকা দালান নাই।

মাসুদ ভাই বলতে থাকল, "শুধু কি তাই! তোমাদের গ্রামের নামটা কী সুন্দর। কাঁকনডুবি। কোনো দিন চিন্তা করেছ নামটা কোথা থেকে এসেছে?"

মামুন আবার তার ফিচলে বুদ্ধি দিয়ে চেষ্টা করল, বলল, "মনে হয় অনেক কাক ছিল—"

মাসুদ ভাই দুই হাত নেড়ে বলল, "না না না। কাঁকনডুবি নাম মোটেও কাক থেকে আসেনি। এসেছে কাঁকন— মানে হাতের চুড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে। নিশ্চয়ই এখানে একদিন কোনো একজন রাজকন্যা ছিল, সে কোনো একটা বড় দিঘিতে গোসল করতে নেমেছে তখন হাত থেকে কাঁকনটা খুলে ডুবে গেছে। সেই থেকে এই গ্রামের নাম কাঁকনডুবি।"

আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "রাজকন্যা কোথা থেকে এল?"

"হয়তো এখানেই রাজার বাড়ি ছিল। সেখানে রাজা থাকত, রানি থাকত, রাজপুত্র-রাজকন্যা থাকত। তোমাদের গ্রামের উত্তরে যে বিশাল জঙ্গল সেখানে কোথাও হয়তো সেই রাজার প্রাসাদ মাটির নিচে লুকিয়ে আছে। কে বলবে?"

মাসুদ ভাই এমনভাবে বলল যে আমার মনে হলো সত্যিই বুঝি আমাদের গ্রামের পেছনে জঙ্গলের ভেতরে কোথাও একটা রাজপ্রাসাদ আছে, গাছপালায় ঢেকে আছে কিন্তু ভেতরে অনেক রহস্য।

ঠিক তখন একটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমাদের ক্লাসে যে মেয়েরা আছে তাদের একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, বলল, "স্যার।"

মেয়েরা ক্লাসে কখনোই কোনো কথা বলে না, আমরা তাদের সবার নাম পর্যন্ত জানি না! এই বছর শেষ হবার পর এদের অর্ধেকই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেবে। সে রকম একটা মেয়ে নিজ থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকালাম। এই মেয়েটার নাম নীলিমা, হিন্দুপাড়ায় থাকে।

মাসুদ ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। স্যার না। বলো মাসুদ ভাই—"

মেয়েটা লজ্জায় লাল-নীল-বেগুনি হয়ে গেল, তার পরও সাহস করে বলল, "মাসুদ ভাই। মেয়েরা যখন দিঘিতে স্নান করে তাদের হাতের কাঁকন তো এমনি এমনি খুলে যায় না!"

মাসুদ ভাই বলল, "অবশ্যই খুলে যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু হয়তো মেয়েটি ছোট একটি মেয়ে ছিল, শখ করে তার মায়ের কাঁকন পরেছিল। ঢলঢলে কাঁকন হাত থেকে খুলে গিয়েছিল। কিংবা—কিংবা—" মাসুদ ভাই কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, "হয়তো মেয়েটার খুব অসুখ করেছিল শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছিল, হাতের কাঁকন ঢলঢলে হয়ে গিয়েছিল, সুন্দর একটা দিঘির টলটলে পানি দেখে মেয়েটার সেই পানিতে স্নান করার ইচ্ছে করল। কে বলবে? কত কী হতে পারে। তোমরা কল্পনা করে নাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন আমাকে ফিসফিস করে বলল, "মাথায় গোলমাল আছে মনে হয়।"

আমি কিছু বললাম না, মাথায় গোলমাল থাকলে থাকুক— কথাগুলো তো শুনতে ভালোই লাগে।

মাসুদ ভাই বলল, "কল্পনা খুব বড় জিনিস। তুমি যত বেশি কল্পনা করবে তোমার পৃথিবীটা হবে তত বড়। তোমার যেটা নাই, তুমি কল্পনায় সেটা ইচ্ছা করলেই পেয়ে যেতে পারবে।"

মামুন আবার তিড়িং করে লাফ দিল, বলল, "না মাসুদ ভাই। এটা ঠিক না! ধরেন আপনার খুব খিদা লাগছে, তখন যদি আপনি কল্পনা করেন আপনি কোরমা-পোলাও খাচ্ছেন তাহলে কি লাভ হবে? খিদা তো কমবে না—"

"আর যদি কল্পনা না করো, তাহলে কি খিদে কমবে?"

মামুন ইতস্তত করে বলল, "না— তা— কমবে না।"

"তাহলে? খিদে কমানোর জন্য তোমাকে খাবার খুঁজে পেতে আনতে হবে, খেতে হবে। সেটা তো আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমাকে কল্পনা করতে হবে। যদি কোরমা-পোলাও খাওয়ার কথা কল্পনা করো, তাহলে একদিন হয়তো কোরমা-পোলাও খাবে। তা না হলে সারা জীবন শুঁটকি ভর্তা খেতে হবে। প্রথমে কল্পনা করবে তারপর একদিন সেই কল্পনা সত্যি হবে। এটা আমার কথা না— এটা অনেক বড় মানুষের কথা।"

কথা বলতে বলতে মাসুদ ভাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, আমি দেখলাম তার চোখটা জানি কেমন চুলু চুলু হয়ে গেল। মাসুদ ভাইয়ের নিশ্চয়ই কিছু একটা কল্পনা আছে, একদিন তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার কল্পনাটা কী। আর কল্পনার এই কথাটা কোন বড় মানুষ বলেছে তার নামটাও জিজ্ঞেস করতে হবে। মাসুদ ভাই নামের মানুষটাকে আমার খুব পছন্দ হলো। মামুন যদিও মাথা নেড়ে আমাকে ফিসফিস করে বলছে, "পাগল! বদ্ধ পাগল।" কিন্তু আমি জানি মানুষটাকে মামুনেরও পছন্দ হয়েছে। মনে হয় সবারই পছন্দ হয়েছে।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর আমি আর মামুন যখন হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছি তখন আবার বলাই কাকুর চায়ের স্টলে দাঁড়ালাম। চায়ের স্টলে আজকে কেউ নাই, শুধু বলাই কাকু বসে বসে তার রেডিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনছেন। রেডিওতে উর্দুতে একজন মানুষ খবর পড়ছে। উর্দুতে কী বলে আমরা তার একটা-দুইটা শব্দ বুঝতে পারি। মাগরেবে পাকিস্তান মানে পশ্চিম পাকিস্তান, মাশরেকে পাকিস্তান মানে পূর্ব পাকিস্তান। যখন পূর্ব পাকিস্তানে দুইটা বাজে তখন পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বাজে। কী আজব একটা ব্যাপার। একটা দেশের দুইটা অংশ একেকটা অংশে একেকটা সময়। দুই অংশেই এক সময় করে দিলে ক্ষতি কী ছিল? মাসুদ ভাইকে একদিন এই প্রশ্নটা করতে হবে।

বলাই কাকু আমাদের দুইজনকে দেখে বললেন, "তোমাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?"

বলাই কাকু আমাদের দেখলে সব সময় লেখাপড়ার খোঁজ নেন। আমরা বললাম, "ভালো।"

বলাই কাকু বললেন, "হ্যাঁ। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। বুঝেছ?"

আমরা মাথা নাড়লাম। বলাই কাকু এর পরে কী বলবেন— সেটাও আমরা জানি, বলবেন, "লেখাপড়া করে যেই গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।" সত্যি সত্যি সেটা বললেন, আমরা তখন আবার মাথা নেড়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম— ফ্রি চা খেতে দেন কি না দেখার জন্য।

বলাই কাকুর মনে হয় ফ্রি চা দেবার কথা মনে নেই, ছোট ছোট কাচের গ্লাসগুলো পানিতে ধুতে ধুতে অন্যমনস্কভাবে রেডিও শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে বললেন, "মনে হয় না ক্ষমতা দেবে।"

কে কাকে ক্ষমতা দেবে আমরা বুঝতে পারলাম না। মনে হয় রাজনীতির কোনো কথা বলছেন। ইলেকশনের পরে সবাই এখন রাজনীতির কথা বলে। মামুন জিজ্ঞেস করল, "কাকে ক্ষমতা দেবে না বলাই কাকু?"

"শেখ সাহেবকে। ইয়াহিয়া খান মনে হয় না শেখ সাহেবকে ক্ষমতা দেবে।"

দেশে কী হচ্ছে আমরা কিছুই জানি না, তাই বুঝতে পারলাম না কেন ইয়াহিয়া খান শেখ সাহেবকে ক্ষমতা দেবে না। মামুন আমার থেকে বেশি খোঁজখবর রাখে, সে বলল, "ইয়াহিয়া খান মানুষ ভালো না। আইয়ুব খান হলে নিশ্চয়ই শেখ সাহেবকে ক্ষমতা দিয়ে দিত। তাই না বলাই কাকু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই কাকুর আইয়ুব খানের ওপরও খুব ভরসা আছে বলে মনে হলো না, অনিশ্চিতের মতো বললেন, "কী জানি বাপু। আমি পাঞ্জাবিদের কাজকর্ম বুঝি না। যারা ভাত না খেয়ে রুটি খায়, তাদের বুদ্ধি আর কত হবে?"

আমি আর মামুন একসাথে মাথা নাড়লাম, কথাটা সত্যি, যারা ভাত না খেয়ে রুটি খেয়ে থাকে তাদের বুদ্ধি খুব বেশি হবার কথা না, তাদের কাজকর্মে বোকামি থাকতেই পারে।

বলাই কাকু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সারা দেশে কী হচ্ছে কোনো খোঁজ পাই না। খুবই অস্থির লাগে।"

তাঁর গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, সেটা শুনে আমি আর মামুন দুজনেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। মামুন জিজ্ঞেস করল, "কী হচ্ছে বলাই কাকু?"

"শেখ সাহেব এতগুলো সিট পেয়েছে এখন তারে যদি ক্ষমতা না দেয় তাহলে বাঙালিরা কি বসে থাকবে? কিছু একটা গোলমাল শুরু হবে না?"

মামুন সবকিছু বুঝে ফেলেছে এ রকম একটা ভঙ্গি করে বলল, "বলাই কাকু, গোলমাল হলেও তো আমাদের কাঁকনডুবিতে কখনো গোলমাল হবে না! সব গোলমাল হয় ঢাকায়।"

"তা ঠিক।"

"আমাদের কোনো ভয় নাই। আছে বলাই কাকু?"

"মনে হয় নাই।"

বলাই কাকুর সাথে রাজনীতির আলাপ করে আমরা যখন চলে আসছি তখন তাঁর ফ্রি চায়ের কথা মনে পড়ল। আমাদের ডেকে কাচের গ্লাসে করে আধ কাপ চা বানিয়ে দিলেন, সাথে একটা কুকি বিস্কুট।

আমরা খুব তৃপ্তি করে চা-বিস্কুট খেলাম। খেতে খেতে আমি মামুনের সাথে রাজনীতির আলাপ করার চেষ্টা করলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দেবে না— আইয়ুব খান হলে দিত তার কারণটা কী মামুন?"

মামুন তার চায়ের গ্লাসের শেষ ফোঁটাটা খুব তৃপ্তি করে খেতে খেতে বলল, "আইয়ুব খান হচ্ছে বাঘের বাচ্চা! কী চেহারা। আর ইয়াহিয়া খানের ছবি দেখেছিস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "দেখি নাই।"

"ইয়াহিয়া খানের চেহারা একেবারে জানোয়ারের চেহারা। যেই মানুষের চেহারা জানোয়ারের মতো তার কাজকর্ম সবকিছু জানোয়ারের মতো।"

"এইটাই কারণ?"

মামুন মাথা নাড়ল, বলল, "এইটাই আসল কারণ।"

মাসুদ ভাই অবশ্যি চেহারাটা আসল কারণ, সেটা বলল না। আমি যখন ক্লাসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম মাসুদ ভাই একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কারণটা এত সোজা না। এর কারণটা বুঝতে হলে অনেক কিছু বুঝতে হবে।"

"কী বুঝতে হবে, মাসুদ ভাই?"

"এইখানে আসলে তিনটা আলাদা আলাদা দেশ হওয়ার কথা ছিল। বাঙালিদের একটা দেশ, পাঞ্জাবিদের একটা দেশ আর ইন্ডিয়া। বাঙালিদের আলাদা দেশটা দেয় নাই— সেইটা পাকিস্তানের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে।"

আমরা বিষয়টা বুঝে ফেলেছি সেইভাবে মাথা নাড়লাম।

"পাকিস্তান হওয়ার পর কী হলো? মার্শাল ল-এর পর মার্শাল ল।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "মার্শাল ল মানে কী?"

"মিলিটারি শাসন। খুব খারাপ জিনিস। আইয়ুব খানই বারো বছর ক্ষমতায় থাকল। দেশটারও বারোটা বাজিয়ে দিল।"

মামুনকে একটু বিমর্ষ দেখলাম সে আইয়ুব খান, বিশেষ করে তার চেহারার, খুব ভক্ত।

মাসুদ ভাই বলতে থাকল, "সংখ্যায় আমরা বেশি কিন্তু শাসন করে পাঞ্জাবিরা। পূর্ব পাকিস্তানকে চুষে চুষে খায়। আমাদের চাষিরা কত কষ্ট করে পাট চাষ করে সেই পাট বেচে যে টাকা আসে সেই টাকা নিয়ে যায় পাঞ্জাবিরা, উন্নতি হয় পশ্চিম পাকিস্তানের। যে-ই প্রতিবাদ করে তাকেই জেলখানায় আটকে রাখে। কী অত্যাচার চিন্তা করতে পারবে না।"

আমরা একটু অবাক হয়ে মাসুদ ভাইয়ের কথা শুনছিলাম, আমরা এই সব কিছুই জানি না। আমাদের স্কুলে আমরা প্রত্যেক দিন সকালে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ টানাই, এসেমব্লিতে পাকিস্তানের 'মহান আদর্শের'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলি। পাকিস্তানের সেবা করে 'আদর্শ মুসলিম দেশ' তৈরি করার কথা বলি। এই দেশের এত সমস্যা, সেটা এত দিন কেউ বলে নাই কেন?

মাসুদ ভাই বলল, "সব রাজনৈতিক নেতাদের জেলে ভরে রেখেছে, আন্দোলন করার কেউ নাই। তখন আন্দোলন করল কারা? ছাত্ররা। আমার মতো ছাত্ররা। তোমাদের মতো ছাত্ররা। ঊনসত্তরে সে কী আন্দোলন! আইয়ুব খানকে কানে ধরে সরানো হলো, জেলখানা থেকে নেতারা ছাড়া পেলেন। কী একটা সময়!" মাসুদ ভাইয়ের মুখটা আনন্দে ঝলমল করতে থাকে।

মামুন মুখ শক্ত করে বসে রইল, তার পছন্দের মানুষ আইয়ুব খানকে কানে ধরে সরানো হয়েছে বিষয়টা সে মানতে পারছে না।

"বঙ্গবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন—"

একজন জিজ্ঞেস করল, "বঙ্গবন্ধু কে?"

মাসুদ ভাই প্রশ্নটা শুনে মনে হলো একটু অবাক হলো, বলল, "শেখ সাহেবকে সবাই বঙ্গবন্ধু ডাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যাই হোক বঙ্গবন্ধু সারা দেশে ঘুরে ছয় দফার ডাক দিলেন। ইলেকশন হলো—ইলেকশনে পূর্ব পাকিস্তানের দুইটা ছাড়া সবগুলো সিট বঙ্গবন্ধুর।"

এবারে আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, ইলেকশনের কথা আমাদের মনে আছে। আমাদের কাঁচাডুবিতে ইলেকশনের মিছিল হয়েছে, কয়েকটা স্লোগানের কথা এখনও মনে আছে, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন? জবাব চাই জবাব চাই।' 'ভোট দিবে কিসে? নৌকা মার্কা বাক্সে।' বঙ্গবন্ধুর মার্কা ছিল নৌকা।

নৌকার বিপক্ষ পার্টির মার্কা ছিল গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুলের মিছিলে লোক কম হতো, মিছিলের পর পান-বিড়ি খেতে দিত, তার পরও লোকজন বেশি হতো না। মজা দেখার জন্য আমরা অবশ্যি সব মিছিলেই থাকতাম।

মাসুদ ভাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারে নাই ইলেকশনে বঙ্গবন্ধু এইভাবে জিতবে। যদি বুঝত তাহলে ইলেকশন দিত না। এখন তার কোনো উপায় নাই, এখন বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা দিতে হবে। এই প্রথম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে বাঙালি! মিলিটারিরা সেইটা সহ্য করতে পারছে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক কী কারণ জানি না, আমার কেমন জানি এক ধরনের উত্তেজনা হলো। বলাই কাকু কেন দুশ্চিন্তা করছিলেন এখন বুঝতে পারলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মিলিটারি যদি ক্ষমতা না দেয় তাহলে কী হবে মাসুদ ভাই?"

মাসুদ ভাই একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, "বাঙালিরা সেটা মেনে নেবে না। ক্ষমতা যদি না দেয় তাহলে কী হবে জানো?"

"কী হবে?"

"তাহলে আমরা আলাদা হয়ে যাব। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে।"

মাসুদ ভাই কেমন যেন জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মাসুদ ভাই মনে মনে চাইছে ইয়াহিয়া খান যেন ক্ষমতা না দেয় আর আমরা যেন স্বাধীন হয়ে যাই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা স্বাধীন হলে দেশটার নাম কী হবে মাসুদ ভাই?"

কে যেন বলল, "পূর্ব বাংলা।"

মাসুদ ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "না। বাংলাদেশ। দেশটার নাম হবে বাংলাদেশ।"

আমি মনে মনে বললাম, 'বাংলাদেশ' আর সাথে সাথে শরীরে কেমন জানি শিহরণ হলো। কেন হলো, কে জানে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.

কার কাছে যেন শুনেছিলাম সব গ্রামে নাকি একটা করে পাগল থাকে। কথাটা মনে হয় সত্যি, আমাদের গ্রামে একজন পাগল আছে, নাম হাবীবুর রহমান। আমাদের পাশের গ্রামেও একটা পাগল আছে, তাকে সবাই ডাকে নূরা পাগলা। তবে আমার মনে হয় সব গ্রামে শুধু পাগল না, কিছু ফালতু মানুষও থাকে। একজন পাগল আর কিছু ফালতু মানুষ না হলে একটা গ্রাম পুরো হয় না।

আমাদের গ্রামের যে পাগল হাবীবুর রহমান, তাকে দেখে বোঝাই যাবে না সে পাগল। সে খুবই স্বাভাবিকভাবে কথা বলে। কথা বলা শেষ করার পর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর যেটা নিয়ে কথা বলেছে, সেটা নিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকে। তখন হঠাৎ করে সবাই টের পায় যে মানুষটার মাথায় গোলমাল আছে। হাবীবুর রহমান খুবই শান্তশিষ্ট পাগল, বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া সে আর কোনো ঝামেলা করে না। সেই তুলনায় আমাদের পাশের গ্রামের নূরা পাগলা রীতিমতো ভয়ংকর। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, তার পরও পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সে নাকি শিকল ভেঙে বের হয়ে যায়। হাতে দা নিয়ে সামনে যাকে পায় তাকেই কোপাতে থাকে—দশজন মানুষ মিলেও তখন নাকি তাকে ধরে রাখা যায় না। আমাদের যখন কোনো কাজ থাকে না তখন আমরা দলবেঁধে নূরা পাগলাকে দেখতে যাই। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, লম্বা লম্বা নখ, সারা গায়ে মাটি, লাল লাল চোখ, একটু পরেই হিংস্র পশুর মতো শব্দ করছে দেখলেই ভয়ে বুক কাঁপে। আমাদের খুবই কপাল ভালো কাঁকনডুবি গ্রামের পাগল হাবীবুর রহমান খুবই শান্তশিষ্ট পাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গ্রামের ফালতু মানুষটার নাম মতি। পুরো নাম মতিউর রহমান, লতিফুর রহমানের ছেলে। যারা গরিব মানুষ তাদের ফালতু হলে সংসার চলে না, তাদের সবাইকে কাজকর্ম করতে হয়। সকালে গরু নিয়ে মাঠে যায় সারা দিন হালচাষ করে, ধান বোনে, খেতে সার দেয়, ধান বড় হলে ধান কাটে, বাড়িতে আনে মাড়াই দেয়। মাথায় করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে— তাদের ফালতু হবার সময় কোথায়? কিন্তু আমাদের মতিউর রহমানের বাবা লতিফুর রহমান গ্রামের মাতবর। মুসলিম লীগের নেতা, টাকা-পয়সা আছে, জমি-জিরাত আছে, তাই মতি কোনো কাজকর্ম করে না। তিনবার পর পর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছে, তখন বাবা লতিফুর রহমান রেগেমেগে সব বই বাড়ির উঠানে পুড়িয়ে দিয়েছে। তার পর থেকে মতিউর রহমানের আর কিছুই করতে হয় না, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। আমরা তাকে আড়ালে ফালতু মতি ডাকি।

আমি আর মামুন যখন স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছি তখন লতিফা বুবুর বাড়ির সামনে ফালতু মতির সাথে দেখা হলো। একটা হাফ হাতা শার্টের হাতাটা আরেকটু গুটিয়ে রেখেছে, লুঙিটার একটা কোনা খুব কায়দা করে ধরে তুলে রেখেছে। মনে হয় পায়ে রোবারের কালো জুতোগুলো যেন দেখা যায় সে জন্য।

আমাদের দেখে মুখের একটা কোনা উপরে তুলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, "ইস্কুল থেকে আসছিস?"

আমরা মাথা নাড়লাম।

ফালতু মতি জিজ্ঞেস করল, "লেখাপড়া হয় ইস্কুলে?"

মামুন বলল. "হয়।"

মতি মুখটা আরো বাঁকা করে বলল, "নাকি খালি রাজনীতি হয়?"

আমরা খুবই অবাক হলাম, স্কুলে কেন রাজনীতি হবে? এটা আবার কী রকম কথা? মামুন বলল, "কথাটা বুঝলাম না মতি ভাই।"

"নূতন একটা মাস্টার আসছে সে নাকি স্কুলের পোলাপানদের নিয়ে রাজনীতি করছে।"

এবারে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, মাসুদ ভাইয়ের কথা বলছে। ক্লাসে আমাদের সাথে কী বলেছে, সেটা ফালতু মতি জানল কেমন করে? মতি বলল, "কলেজের ছাত্র কোনো পাস দেয় নাই কিছু নাই তারে মাস্টার বানাল কোন আক্কেলে? ইস্কুল কি হেডমাস্টারের বাপের সম্পত্তি? যারে-তারে নিয়া আসবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা কিছু বললাম না, মতির সাথে কথা যত কম বলা যায়, তত ভালো। সে বুকপকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল, আরেকটা পকেট থেকে ম্যাচ বের করল, সে যে অন্যদের মতো বিড়ি খায় না, সিগারেট খায় সেটা বোঝাবার জন্য সিগারেটটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে আমাদের মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "তোদের চ্যাংড়া মাস্টারকে বলিস মাস্টারি করার আগে যেন একটা-দুইটা পাস দেয়।"

আমরা মাথা নাড়লাম। মতি তখন আবার তার লুঙিটার কোনা ধরে একটু উপরে তুলে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে। আমি আর মামুন কিছুক্ষণ মতিকে হেঁটে যেতে দেখলাম। মামুন গলা নামিয়ে বলল, "মতি ভাই এইখানে হাঁটাহাঁটি করে কেন জানিস?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"তার লতিফা বুবুরে বিয়ে করার শখ। সেই জন্য সেজেগুজে এই বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করে।"

'মতি বিয়ে করবে লতিফা বুবুরে' দৃশ্যটা চিন্তা করেই আমি আর মামুন হি হি করে হাসতে লাগলাম!

আমি আর মামুন হেঁটে হেঁটে আরেকটু সামনে গিয়েছি, লতিফা বুবুদের বাড়ির বাংলাঘরের পাশে দেখলাম শাড়ি পরা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলা আমাদের ডাকল, "এই রঞ্জু, মামুন—"

আমরা ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম মহিলাটা আসলে আমাদের লতিফা বুবু, শাড়ি পরলে সব মেয়েকে এত বড় দেখায়! আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, "লতিফাবু!"

লতিফা বুবু হাসল, বলল "কী হলো? তোরা আমার কোনো খোঁজ নিতেও আসবি না?"

আমরা কী বলব বুঝতে পারলম না, লতিফা বুবু ছিল আমাদের লিডার, তার পিছু পিছু আমরা সারা কাঁকনডুবি চষে বেড়াতাম, সবার খোঁজ নিতাম। সেই লতিফা বুবু বলছে আমরা তার খোঁজ নিই না। আমি বললাম, "লতিফাবু, তোমাকে দেখে আমি চিনতে পারি নাই। ভেবেছি অন্য কেউ।"

লতিফা বুবু কিছু বলল না, কিছুক্ষণ আমাদের দেখল, আমাদের হাতের বইগুলোর দিকে তাকাল, তারপর বলল, "দেখি তোদের বইগুলো।"

আমি বইগুলো দিলাম, মাত্র কয়েক দিন হলো ক্লাস শুরু হয়েছে এর মাঝেই বইগুলো কাহিল হয়ে গেছে। লতিফা বুবু অবশ্যি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখল তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলল। ফালতু মতির লেখাপড়া করার কোনো শখ নাই তার পরও সে তিনবার ম্যাট্রিক দিয়েছে, আর লতিফা বুবুর এত লেখাপড়া করার শখ তার স্কুল বন্ধ করে তাকে বাড়িতে আটকে রেখেছে!

মামুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখন কী করো লতিফাবু?"

"এই তো সংসারের কাজ করি।"

"বই পড় না?"

"বই? বই আমাকে কে দেবে?"

আমি বললাম, "আমাদের স্কুল লাইব্রেরি থেকে তোমাকে বই এনে দেব?"

লতিফা বুবুর চোখ চক চক করে উঠল, "দিবি? এনে দিবি?"

মামুন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "স্কুলের লাইব্রেরিতে কোনো ভালো বই নাই। সব পুরান পুরান বই।"

লতিফা বুবু মাথা নেড়ে বলল, "হোক পুরান। তুই এনে দে।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক আছে লতিফাবু।"

আমরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু কথা বলার কিছু খুঁজে পেলাম না। কী আশ্চর্য ব্যাপার একসময় আমাদের কথা বলা নিয়ে কোনো সমস্যা হতো না, কে কার আগে কী বলবে, সেটা নিয়েই ঝগড়া লেগে যেত। ধান ক্ষেতে লতিফা বুবু হয়তো একটা ফড়িং ধরেছে, ধরে বলত, "এই দেখ। কেমন করে হেলিকপ্টার বানাতে হয় তোদের দেখাই।"

আমরা লতিফা বুবুকে ঘিরে দাঁড়াতাম, লতিফা বুবু তখন একটা লম্বা চোরাকাঁটা নিয়ে ফড়িংয়ের পেছনে ঠেলে ঢুকিয়ে দিত। তারপর ফড়িংটা ছেড়ে দিয়ে বলত, "এই দেখ।"

বেচারা ফড়িং সেই চোরাকাঁটা নিয়ে ওড়ার চেষ্টা করত, আমরা আনন্দে হাত তালি দিয়ে হি হি করে হাসতাম। মামুন বলত, "হেলিকপ্টারের পাখা থাকে উপরে— এইটার পাখা উপরে হয় নাই।"

লতিফা বুবু মামুনের মাথায় চাটি মেরে বলত, "চুপ কর। তুই বেশি জানিস?"

ঠিক তখন হয়তো আরেকজন চিৎকার করে লাফানো শুরু করেছে, তার পায়ে জোঁক ধরেছে। লতিফা বুবু বাঘ-সিংহকেও ভয় পেত না কিন্তু জোঁককে খুব ভয় পেত, দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকত, "টেনে ছুটিয়ে দে— ছুটিয়ে দে।"

আমরা জোঁক টেনে ছুটিয়ে এনে তখন সেটা দিয়ে লতিফা বুবুকে ভয় দেখাতাম, লতিফা বুবু একেবারে হাত জোর করে বলত, "ভাইডি ভাইডি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইডি তোর আল্লাহ্‌র কসম লাগে, বড় পীর সাহেবের কসম লাগে— খোদার কসম লাগে— কাছে আনিস না। ফেল্লে দে— পা দিয়ে পিষে ফেল—"

জোঁকটাকে পা দিয়ে পিষে ফেলে আমরা লতিফা বুবুকে জিজ্ঞেস করতাম, "তুমি জোঁককে এত ভয় পাও কেন?"

লতিফা বুবু বলত, "জোঁক খুব খারাপ। খুব ভয়ংকর।"

"কেন।"

"একবার হয়েছে কী, একটা মেয়ে পুকুরে সাঁতরাতে গেছে—"

"তারপর।"

লতিফা বুবু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলত, "না। বলা যাবে না।"

"কেন বলা যাবে না।"

লতিফা বুবু রেগে চুলের ঝুঁটি টেনে বলত, "আমি বলেছি বলা যাবে না, সেই জন্য বলা যাবে না।"

সেই গল্প আর কখনো শোনা হয় নাই। সেই লতিফা বুবু এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য। তার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা বলার কিছু খুঁজে পাই না!

পরদিন আমি আর মামুন স্কুলের লাইব্রেরিতে লতিফা বুবুর জন্য বই আনতে ঢুকলাম। কাজটা অবশ্য খুব সহজ হলো না। স্কুলের লাইব্রেরি ঘরটা বেশির ভাগ সময় তালা মারা থাকে। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান নাই। চিকা স্যার (চেহারার মাঝে একটা চিকা ভাব আছে সেই জন্য নাম চিকা স্যার) দায়িত্বে থাকেন। চিকা স্যার অবশ্যি মানুষটা ভালো, লাইব্রেরি থেকে বই নিতে চাই শুনে খুশিই হলেন। দপ্তরি রসময়ের হাতে চাবি দিয়ে আমাদের জন্য লাইব্রেরি খুলে দিতে বললেন।

লাইব্রেরির ভেতরে ধুলা আর মাকড়সার জাল। আলমারি বোঝাই বই, বইগুলো বাঁধাই করা। আমরা খুঁজে খুঁজে দুইটা বই বের করলাম, একটা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমগ্র, আরেকটা ভেষজ উদ্ভিদের গুণাবলির ওপর। বইয়ের ভেতরে কী আছে তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দিলাম বইয়ের সাইজের ওপর। মোটা বই হলে লতিফা বুবু অনেক দিন পড়তে পারবে।

বইগুলো নিয়ে ক্লাসে আসার পর একটা সমস্যা হয়ে গেল, সবাই জানতে চায় এত মোটা বই দিয়ে আমরা কী করব। মানুষ বই পড়ে, কাজেই খুবই সোজা উত্তর হচ্ছে যে আমরা বইগুলো পড়ব, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সবাই জানে আমরা বই পড়ার মানুষ না, তাও এ রকম মোটা বাঁধাই করা বই! বইগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই কেউ পড়বে কিন্তু কে পড়বে, সেটাই সবাই জানতে চাইছে। লতিফা বুবুর নামটা বলা ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছিলাম না।

ক্লাস শুরু হবার পর মাসুদ ভাই এসেও আমাদের সামনে এই মোটা বই দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি এই মোটা বই পড়বে? বাহ্। কী চমৎকার। ভেরি গুড। বই পড়া খুব ভালো অভ্যাস। কী বই দেখি?"

আমি মাথা চুলকে বইটা মাসুদ ভাইয়ের হাতে দিলাম। মাসুদ ভাই বইটা খুলে আরো অবাক হলো, "বঙ্কিম রচনাবলি। তুমি বঙ্কিমের বই পড়ো। কী অসাধারণ।"

ক্লাসের সব ছেলে তখন একসাথে আপত্তি করল, রীতিমতো চিৎকার করে বলল, "না, মাসুদ ভাই। রঞ্জু কোনো বই পড়ে না—"

মাসুদ ভাই একটু অবাক হয়ে বলল, "বই পড়ো না? তাহলে এত মোটা বই কেন নিচ্ছ?"

আমাকে তখন সত্যি কথাটা বলতে হলো। আমাদের লতিফা বুবুর খুব লেখাপড়ার শখ, এখন তার স্কুল বন্ধ। তাই বাড়িতে বসে থাকে, তার জন্য এই বই। লতিফা বুবুর কথা শুনে মাসুদ ভাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "একটা ছেলে থেকে একটা মেয়ের লেখাপড়া করা বেশি দরকার। আমরা এমন একটা সিস্টেম করে রেখেছি যে, মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে না।"

মাসুদ ভাই এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাল যে মনে হলো দোষটা আমাদের। তার কথাটা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করলাম না, আমার নানি লেখাপড়া জানে না, তার যন্ত্রণায় আমার জীবন শেষ। নানি যদি লেখাপড়া জানত তাহলে কী উপায় ছিল?

মাসুদ ভাই বলল, "তোমাদের লতিফা বুবুর জন্যও মনে হয় বইগুলো একটু কঠিন হয়ে যাবে! দরকার শরৎচন্দ্রের বই, তা না হলে তারাশংকর কিংবা বিভূতিভূষণের বই। আরো সোজা হবে আশাপূর্ণা দেবী কিংবা শংকরের—" হঠাৎ তার কিছু একটা মনে পড়ে গেল, তখন চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি আশাপূর্ণা দেবীর একটা বই পড়ছি। নাম হচ্ছে প্রথম প্রতিশ্রুতি! বইটা প্রায় শেষ, আর কয়েক পৃষ্ঠা বাকি। আমি নিয়ে আসব, তোমাদের লতিফা বুবুকে পড়তে দিতে পারো। পড়ে আবার ফেরত দিতে হবে কিন্তু।"

আমি বললাম, "ফেরত দেবে মাসুদ ভাই। লতিফা বুবুর কাছ থেকে আমি বই ফেরত এনে আপনাকে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন তখন আমার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে চোখ টিপে বলল, "বলেছিলাম না।"

"কী বলেছিলি?"

"মাসুদ ভাই এই গ্রামের জামাই। এখনই বই দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে। তারপর কী দেওয়া-নেওয়া হবে বুঝলি না?"

আমি আসলেই কিছু বুঝলাম না। মামুনের অনেক কথাই আমি বুঝি না।

মাসুদ ভাই তখন আমাদের বিজ্ঞান পড়াতে শুরু করল। আর্কিমিডিসের সূত্র দিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করল কেন লোহা ডুবে যায় কিন্তু লোহার তৈরি জাহাজ ভেসে থাকে। খুবই উৎসাহ নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু আমরা কিছুই বুঝলাম না। মাসুদ ভাই একটু পরে পরে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "বুঝেছ তো?" আমরা কিছুই বুঝতে পারি নাই কিন্তু খুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলাম যে সব বুঝে ফেলেছি। মাসুদ ভাই তখন আর্কিমিডিসের গল্পটা বলল, রাজার জন্য সোনার মুকুট তৈরি হয়েছে তার মাঝে খাদ আছে কি না সেটা আর্কিমিডিসকে বের করে দিতে হবে। আর্কিমিডিস সমস্যাটা চিন্তা করতে করতে গোসল করার জন্য পানির গামলায় নেমেছে, তখন হঠাৎ করে সমাধানটা মাথায় এসে গেছে। ইউরেকা ইউরেকা বলে চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে ন্যাংটো হয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে—

গল্পের এই জায়গায় মামুন মাসুদ ভাইকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "মাসুদ ভাই, ন্যাংটো হয়ে কেন?"

মাসুদ ভাই থতমত খেয়ে গেল, বলল, "ইয়ে মনে হয় ওই সময় মানুষ ওইভাবে গোসল করত—"

মামুন বলল, "খুবই বেশরম মনে হয়।"

এত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে বেশরম বলায় মাসুদ ভাই মনে হলো একটু রাগ হলো কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না, আবার আর্কিমিডিসের সূত্র দিয়ে সোনার মুকুটের খাদ বের করা হয় সেটা বোঝাতে লাগল। আমরা কিছুই বুঝলাম না, মাসুদ ভাই রাজনীতির কথা, দেশের কথা খুব ভালো বোঝাতে পারে কিন্তু বিজ্ঞান কিছুই বোঝাতে পারে না। তখন আমি শোনা বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। লেখাপড়াটা আমার জন্য না। নানির যন্ত্রণায় স্কুলে আসতে হয়— এই যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। মনে হয় একদিন বন্ধ করে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম কে জানে হঠাৎ করে চমকে উঠলাম, শুনলাম মাসুদ ভাই গলা উঁচু করে বলছে, "এই যে, এই যে ছেলে—"

আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখি মাসুদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার?"

"রঞ্জু।"

"তা রঞ্জু, তুমি এত মনোযোগ দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছ। ব্যাপারটা কী? আমি ক্লাসে পড়াচ্ছি—"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম, বলতে তো পারি না যে, 'আপনি কী পড়াচ্ছেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।'

মাসুদ ভাই বলল, "দেখে মনে হচ্ছিল খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা ভাবছিলে। কী ভাবছ?"

আমি আসলে কিছুই ভাবছিলাম না। সব সময়েই কিছু একটা ভাবতে হবে কে বলেছে?

মাসুদ ভাই বলল, "বলো, কী ভাবছিলে?"

তখন আমার মাথায় মাসুদ ভাইয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা বুদ্ধি এল। বললাম, "দেশের অবস্থা খুব খারাপ, কী গোলমাল হয় সেটা চিন্তা করে ভয় লাগছে!"

পুরোপুরি মিথ্যা কথা কিন্তু আমার কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। মাসুদ ভাই একেবারে আমার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আরে রঞ্জু, তোমার ভয় পাওয়ার কী আছে? এটা আমাদের দেশ না? এখানে কে কী করবে?"

আমি কিছু বললাম না, শুধু দেশের চিন্তায় খুবই কাহিল হয়ে আছি এ রকম একটা ভাব করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করল, "এইটা কী মাস?"

"মাঘ মাস।"

"ইংরেজি?"

গ্রামের মানুষ আমরা বাংলা মাস দিয়েই কাজ চালিয়ে দিই, তাই ইংরেজি মাসটা বলতে পারলাম না। মাসুদ ভাই বলল, "ফেব্রুয়ারি।" এমনভাবে বলল যে ফেব্রুয়ারি মাসটা খুবই সম্মানিত একজন মানুষ! এটাকে রীতিমতো পা ছুঁয়ে সালাম করতে হবে।

"ফেব্রুয়ারি মাসটা কিসের মাস জানো?"

মেয়েদের ভেতরে কে একজন চিকন গলায় বলল, "জানি।" মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম নীলিমা। নীলিমা মনে হয় সবকিছু জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই মনে হলো খুবই উৎসাহ পেল, বলল, "বলো দেখি।"

নীলিমা বলল, "রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার মাস।"

মাসুদ ভাই উৎসাহে হাতে কিল দিয়ে বলল, "ভেরি গুড। শুধু একজন জানলে হবে না। সবাইকে জানতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে শহীদ দিবস। ঢাকা শহরে বিশাল শহীদ মিনার আছে, একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ খালি পায়ে ফুল দিতে যায়।"

আমরা প্রত্যেক দিনই খালি পায়ে স্কুলে আসি তাই খালি পায়ে প্রভাতফেরি করে বাড়তি কী লাভ ধরতে পারলাম না। কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করলাম না, মাসুদ ভাই যত উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান বোঝায় তার থেকে অনেক বেশি উৎসাহ নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এগুলো বোঝায়।

মাসুদ ভাই উৎসাহে টগবগ করতে করতে বলল, "এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা অন্য রকম। সারা দেশে একটা উত্তেজনা! ঢাকা শহরে অন্য রকম অবস্থা, মানুষের মাঝে সাংঘাতিক রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা। এই ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একটা জবাব দেওয়া হবে—" কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাসুদ ভাই থেমে গেল, জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল, মাথা ঘুরিয়ে কী যেন দেখে আবার ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমাদের সমস্যাটা কী জানো?"

আমাদের অনেক সমস্যা, মাসুদ ভাই কোনটার কথা বলছে বুঝতে পারলাম না। মাসুদ ভাই আমাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না, বলল, "তোমাদের সমস্যা হচ্ছে তোমাদের স্কুলে কোনো শহীদ মিনার নাই।"

আমরা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালাম, "শহীদ মিনার?"

"হ্যাঁ। প্রত্যেকটা স্কুলে একটা শহীদ মিনার থাকতে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরি করে সেখানে ফুল দিতে হয়।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "শহীদ মিনার কী রকম হয়?"

"তোমরা কখনো শহীদ মিনার দেখ নাই?"

আমরা মাথা নাড়লাম, "না।"

মাসুদ ভাই চক নিয়ে বোর্ডের কাছে শহীদ মিনার আঁকতে গেল। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল, ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা এই স্কুলে একটা শহীদ মিনার বানাব।"

লেখাপড়া ছাড়া অন্য সব কাজে আমাদের উৎসাহের শেষ নাই। তাই আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

আমি আর মামুন তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন ফালতু মতি আমাদের পেছন থেকে ডাকল, "হেই! হেই পোলাপান।"

আমরা মোটেও পোলাপান না কিন্তু ফালতু মতির কথাবার্তা এই রকম। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম, তখন মতি তার বাহারি লুঙিটার কোনা ধরে খানিকটা উপরে তুলে হেঁটে হেঁটে আমাদের কাছে এল, ঠোঁটের এক পাশটা উপরে তুলে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কই যাস?"

আমি বললাম, "স্কুলে।"

"আজকে আবার কিসের স্কুল। আজকে শুক্রবার না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা স্কুলে শহীদ মিনার বানাচ্ছি তো—"

ফালতু মতির মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম সে শহীদ মিনার বানানোর খবর পেয়ে গেছে কিন্তু ভান করছে আমাদের মুখ থেকে প্রথম শুনছে। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী বানাচ্ছিস?"

"শহীদ মিনার।"

"সেইটা আবার কী বস্তু? কী হবে এইটা দিয়ে?"

মামুন বলল, "একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাতফেরি করে ফুল দেব।"

"ফুল দিবি? মুসলমানের বাচ্চা ফুল দিবি মানে?"

আমি আর মামুন একজন আরেকজনের মুখে তাকালাম। মামুন জিজ্ঞেস করল, "ফুল দিলে কী হয়?"

"গুনাহ হয়। মুসলমানের বাচ্চা ফুলটুল দেয় না। ফুল দেয় মালাউনের বাচ্চারা। তোরা কি মালাউন?"

ফালতু মতি হিন্দুদের হিন্দু না বলে মালাউন ডাকে। কেন ডাকে জানি না। আমরা কী বলব বুঝতে পারলাম না তাই চুপ করে থাকলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতি বলল, "এই সব কামকাজ ওই নূতন মাস্টারের। লেখাপড়া নাই কোনো পাস নাই তারে স্কুলের মাস্টার বানাইছে আর সেই চ্যাংড়া মাস্টার স্কুলের পোলাপানদের নিয়া রাজনীতি করে? স্কুলে শহীদ মিনার বানায়? কত বড় সাহস। আমি আজকেই নালিশ দিমু। লিখিত নালিশ।"

আমি বললাম, "নালিশ দিয়ে লাভ নাই মতি ভাই। এখন সব স্কুলে শহীদ মিনার থাকে। সারা দেশ এখন জয় বাংলা।"

"সারা দেশে কী?"

"জয় বাংলা।"

মতি কী রকম যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। জয় বাংলা কথাটা শুনে মনে হয় কেমন জানি টাশকি মেরে গেল!

আমি আর মামুন আর না দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। খানিক দূর গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি মতি উল্টো দিকে হাঁটছে। লতিফা বুবুর বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নাই। এই রকম মানুষ আমরা জন্মেও দেখি নাই।

স্কুলে গিয়ে দেখি হুলুস্থুল অবস্থা। অনেক ছেলে এসেছে। মেয়েদের মাঝে খালি নীলিমা। বড় বড় বাঁশ আনা হয়েছে। আমাদের গ্রামের কাঠমিস্ত্রী কালীপদ করাত দিয়ে সেই বাঁশ কাটছে। কয়েকজন মিলে মাটি কেটে স্কুলের এক কোনায় উঁচু করে একটা ভিটে মতন তৈরি করছে। তার মাঝে মাসুদ ভাই কানে একটা কাঠপেন্সিল লাগিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে।

আমরা পৌঁছাতেই মাসুদ ভাই আমাদের কাজে লাগিয়ে দিল, স্কুলের পেছনে একটা দেয়াল ধসে পড়েছে, সেখানে অনেক ইট খুলে পড়েছে। মাসুদ ভাই আমাদেরকে ইট আনতে লাগিয়ে দিল। আমরা মহা উৎসাহে ভাঙা দেয়াল থেকে টেনে টেনে ইট আনতে লাগলাম।

বিকেলের মাঝে শহীদ মিনারটা দাঁড়িয়ে গেল। মিনার শব্দটার জন্য আমি ভেবেছিলাম ওপরে হয়তো গম্বুজের মতো কিছু একটা থাকবে। কিন্তু দেখা গেল সে রকম কিছু না। অনেকটা মইয়ের মতন, শুধু মইয়ের কাঠিগুলো আড়াআড়ি না হয়ে লম্বা লম্বি। মাঝখানে দুইটা, তার দুই পাশে একটু ছোট আরো দুইটা। শহীদ মিনার বানানো এত সোজা জানলে আমরা নিজেরাই বানিয়ে ফেলতে পারতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ মিনার শেষ করার পর মাসুদ ভাই একটু দূর থেকে শহীদ মিনারটা দেখে তৃপ্তির একটা শব্দ করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এইটাই শহীদ মিনার?"

মাসুদ ভাই একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এইটা আমাদের শহীদ মিনার। একেক জায়গায় একেক রকম শহীদ মিনার হয়। পিলারগুলো একটু চিকন হয়েছে, মোটা হলে আরেকটু ভালো হতো।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করব?"

"একুশে ফেব্রুয়ারির দিন প্রভাতফেরি করে ফুল দেব।"

"আর কিছু করব না?"

"বাঁশগুলো সাদা রং করতে হবে। পেছনে একটা লাল সূর্য দরকার। বাজার থেকে লালসালু কিনে আনতে হবে।"

আমরা যখন চলে আসছিলাম তখন মাসুদ ভাই আমাদের থামাল, তারপর তার ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা মোটা বই বের করে আমাদের হাতে দিয়ে বলল, "নাও। এই বইটা তোমাদের লতিফা বুবুর জন্য। পড়ে আবার ফেরত দিতে হবে কিন্তু।"

আমি বইটা হাতে নেওয়ার আগেই মামুন খপ করে বইটা নিয়ে নিল, বলল, "দেব মাসুদ ভাই। বইটা ফেরত দেব।"

স্কুল থেকে বের হয়ে সড়কটার উপরে উঠতেই মামুন এদিক-সেদিক তাকিয়ে বইটা খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা খুঁজতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খুঁজছিস?"

"চিঠি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কার চিঠি?"

"বেকুব কোথাকার! তুই জানিস না বইয়ের ভেতর দিয়ে চিঠি চালাচালি হয়?"

মামুন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অবশ্যি ভেতরে কোনো চিঠি খুঁজে পেল না। মনে হলো সে জন্য খুবই বিরক্ত হলো।

লতিফা বুবু বইটা পেয়ে খুবই খুশি হলো। আমরা কোথা থেকে বইটা পেয়েছি জানতে চাইল, আমরা তখন মাসুদ ভাইয়ের কথা বললাম। মাসুদ ভাই যে শহীদ মিনার তৈরি করেছেন সেটাও বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ মিনার যে কয়েকটা বাঁশের খাম্বা পুঁতে তৈরি করা হয়েছে সেটা অবশ্যি আর বললাম না! শহীদ মিনারের কথা শুনে লতিফা বুবু খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, "আমাকে দেখাবি?"

"তুমি যাবে? স্কুলের মাঠের কোনায় তৈরি, এখনো রং দেওয়া হয় নাই। রং দিলে একেবারে চিনতেই পারবে না।"

"কী রং দিবি?"

মামুন গম্ভীর হয়ে বলল, "সাদা। শহীদ মিনার সব সময় সাদা হয়।"

আমি বললাম, "তুমি যদি যেতে চাও একুশে ফেব্রুয়ারিতে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। খালি পায়ে যেতে হবে কিন্তু। প্রভাতফেরিতে সব সময়ে খালি পায়ে যেতে হয়।"

খালি পা লতিফা বুবুর জন্য সমস্যা না— খালা-খালু হচ্ছে সমস্যা। খালা-খালু লতিফা বুবুকে এখন ঘর থেকেই বের হতে দেয় না।

একুশে ফেব্রুয়ারি যতই এগোতে লাগল আমাদের উত্তেজনা ততই বাড়তে লাগল। যাদের গানের গলা আছে তাদেরকে নিয়ে মাসুদ ভাই প্রভাতফেরির গান শেখাতে লাগল। মাসুদ ভাই কীভাবে কীভাবে জানি স্কুলের স্যারদেরকেও প্রভাতফেরি করতে রাজি করিয়ে ফেলেছে। পুরনো খবরের কাগজের ওপর কালো কালিতে একুশে ফেব্রুয়ারির উপর পোস্টার লেখা হলো, আমরা সেগুলো সারা গ্রামে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। সেই ইলেকশনের সময় গ্রামে একটু হইচই হয়েছিল তারপর এতদিনে আর কিছু হয় নাই। তাই গ্রামের লোকজন মনে হয় বেশ আগ্রহ নিয়েই ব্যাপারটা দেখল। তা ছাড়া বঙ্গবন্ধু ইলেকশনে সবগুলো সিট পাওয়ার পর সারা দেশেই একটু জয় বাংলা জয় বাংলা ভাব। আমাদের কাঁকনডুবিতেও একই অবস্থা। বিশ তারিখ রাত্রি বেলা ঘুমানোর আগে আমি নানিকে বললাম, "নানি আমাকে খুব সকালে ঘুম থেকে তুলে দিবা।"

নানি মুখের মাঝে একটা পান ঢুকিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, "তুই সকালে ঘুম থেকে উঠবি? এই কথা তুই আমারে বিশ্বাস করতে বলিস? বেলা হওয়ার পরেও তোরে ঠেলা দিয়ে ঘুম থেকে তোলা যায় না— তুই উঠবি অনেক সকালে!"

"নানি কালকে প্রভাতফেরিতে যেতে হবে— একেবারে অন্ধকার থাকতে প্রভাতফেরি শুরু হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানি হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "তোরা কি চোর নাকি যে অন্ধকার থাকতে বের হবি?"

আমি বললাম, "নানি কালকে একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ মিনারে ফুল দিতে হবে।"

"ফুল দিলে দিবি। তয় অন্ধকারে কেন?"

"সেইটা আমি জানি না। যেটার যে নিয়ম।"

"ফুল পাবি কই?"

আমাদের কাঁকনডুবি গ্রামে কেউ ফুলগাছ লাগায় না। বনে জঙ্গলে কিছু জংলি ফুল আছে। কাজীবাড়ির সামনে কিছু ফুলগাছ আছে, বিকেল বেলা দেখে এসেছি। অন্ধকার থাকতে বের হওয়ার সেইটাই হচ্ছে আসল কারণ, সেখান থেকে ফুল চুরি করতে হবে। মহৎ কাজের জন্য এই রকম ছোটখাটো চুরিচামারি করলে দোষ হয় না। নানিকে অবশ্যি সেইটা বললাম না, হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করলাম।

বিছানায় ঢুকে কাঁথা গায়ে দিয়ে নানিকে বললাম, "মনে আছে তো নানি? একেবারে শেষরাতে তুলে দেবে?"

নানি বলল, "মনে আছে।"

"ঘড়ির টাইমে সকাল পাঁচটা।"

নানি দাঁত বের করে হাসল, কাঁকনডুবি গ্রামে কারো বাড়িতে কোনো ঘড়ি নাই! আমরা কেউ ঘড়ির সময়ে চলি না। তাই সকাল পাঁচটার কোনো অর্থ নাই!

ভোর রাতে সত্যি সত্যি নানি আমাকে তুলে দিল। সকালে ঘুম থেকে ওঠা আমার জন্য খুবই কঠিন একটা কাজ কিন্তু আজকে চট করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানালার ঝাঁপিটা সরিয়ে বাইরে তাকালাম অন্ধকার কেটে ফরসা হতে শুরু করেছে। আমি তখন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। দেরি করা ঠিক হবে না, আলো হয়ে গেলে ফুল চুরি করা কঠিন হয়ে যাবে।

আমি বালিশের নিচে ভাঁজ করে রাখা শার্টটা পরে নানিকে বললাম, "নানি আমি গেলাম।"

"গেলি মানে কী? মুখে চাইরটা ভাত দিয়া যা।"

"না নানি। ভাত খাওয়ার সময় নাই।"

"হাত-মুখ ধুয়ে যা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মসজিদের সামনে কলের পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নেব।"

"একটু মুড়ি খেয়ে যা— খিদা লাগবে তো।"

"দেও দেও নানি। তাহলে মুড়ি দেও তাড়াতাড়ি।"

আমি অবশ্যি মুড়ি খেয়ে সময় নষ্ট করলাম না, দুই পকেট ঠেসে মুড়ি ভরে নিলাম, যেতে যেতে খাওয়া যাবে। ঘর থেকে বের হবার সময় নানি হাতে একটা কলা ধরিয়ে দিল।

আবছা অন্ধকারে আমি ছুটতে ছুটতে কাজীবাড়িতে হাজির হলাম। এই বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই দেশবিদেশে থাকে। বাসায় বেশি মানুষ নাই— যারা আছে তাদের কেউ নিশ্চয়ই এত সকালে ঘুম থেকে ওঠেনি কিন্তু আমি যেই বাড়ির সামনে বেড়াটা টপকে ভেতরে ঢুকেছি, তখনই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। আমি কুকুরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম— ডাকাডাকি করে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেই সমস্যা। আমি চাপা গলায় তু তু করে কুকুরটাকে ডাকলাম, সে তখন খুব ভালো মানুষের মতো লেজ নাড়তে নাড়তে আমার কাছে এগিয়ে এল, আমি তখন তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। কাঁকনডুবি গ্রামের সবাই সবাইকে চেনে— মানুষকেও চেনে, গরু-ছাগল-কুকুরকেও চেনে।

আমি সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ডাঁটাসহ কয়েকটা ফুল ভেঙে নিলাম, অন্ধকারে ফুলের রং বোঝা যায় না কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। শহীদ মিনারে কী রঙের ফুল দেয়া যায় তার নিশ্চয়ই কোনো নিয়ম নাই। কুকুরটা আমার পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে ফুল চুরির ব্যাপারে আমাকে আরো সাহায্য করতে পারছে না বলে লজ্জিত এবং দুঃখিত!

আমি দেরি না করে ফুলগুলো হাতে নিয়ে আবার ছুটতে থাকি, কুকুরটা আমাকে সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। সড়কটাতে উঠে পকেট থেকে এক খাবলা মুড়ি বের করে চিবুতে লাগলাম। হিন্দুপাড়ার মুড়ি, খুবই মচমচে। খাওয়ার আগে দাঁত মেজে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়ার কথা, একদিন পরের কাজটা আগে আর আগের কাজটা পরে করলে কোনো দোষ নাই। সড়কটাতে কোনো মানুষজন নাই, মসজিদের কাছে এসে কয়েকজন মুসল্লিকে পেলাম, ফজরের নামাজ পড়ে বাড়ি যাচ্ছে। আমাকে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, "এইটা কেডা? রঞ্জু না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "জি চাচাজি।"

"এত সকালে কই যাস?"

"প্রভাতফেরিতে।"

"সেইটা আবার কী জিনিস?"

প্রভাতফেরি বিষয়টা কেমন করে বোঝাব চিন্তা করছিলাম। তখন পাশের মানুষটা বুঝিয়ে দিল, "পোলাপানের কাম। স্কুলে মনে হয় ভ্যারাইটি শো হবি, তাই না রে?"

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলাম। এই মুরব্বিদের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। মসজিদের সামনে টিউবওয়েলের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে আমি আবার স্কুলের দিকে রওনা দিলাম। স্কুলের কাছাকাছি এসে দেখি এর মাঝে অনেকেই হাজির হয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারে সবাইকে চেনা যায় না, শুধু আলাউদ্দিন চাচাকে চিনতে পারলাম। একটা গ্রামে যে রকম একজন পাগল থাকে আর একজন ফালতু মানুষ থাকে ঠিক সে রকম একজন গায়কও থাকে। আলাউদ্দিন চাচা আমাদের কাঁকনডুবির গায়ক। তার লম্বা ঝাঁকড়া চুল—সেই চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে যখন গানে টান দেয় সবাই তখন টাশকি মেরে যায়। আলাউদ্দিন চাচা কালী গাংয়ে খেয়া পারাপার করে। নিশুতি রাতে আমরা শুনি কালী গাংয়ের মাঝখান থেকে আলাউদ্দিন চাচা গান ধরেছে। আলাউদ্দিন চাচার সংসারে মন নাই, সেই জন্য বাড়িতে খুব অশান্তি। আজকে অবশ্যি আলাউদ্দিন চাচার ভাবভঙ্গিতে কোনো অশান্তির চিহ্ন নাই, একটা হারমোনিয়াম গামছা দিয়ে বেঁধে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়েছে, তার মাঝে খুবই উৎসাহ, দেখে মনে হয় আলাউদ্দিন চাচা অনেক দিন পরে একটা মনের মতো কাজ পেয়েছে।

মাসুদ ভাই খুব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, আমাকে দেখে বলল, "রঞ্জু, এসেছ। এই যে কালো ব্যাজ, সবাইকে লাগিয়ে দাও দেখি।"

কালো ব্যাজ কেন পরতে হবে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মাসুদ ভাই নিজে আমাকে এত বড় কাজ দিয়েছে, গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি আমার ফুলগুলো বগলে চেপে মাসুদ ভাইয়ের হাত থেকে অনেকগুলো কালো ব্যাজ আর আলপিন নিয়ে সবার বুকে লাগানো শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠতে লাগল, স্কুলের আরো ছেলেরা আসতে শুরু করল। শুধু ছেলেরা নয়, স্কুলের কয়েকজন মেয়েও চলে এসেছে, আমি নীলিমাকেও দেখতে পেলাম।

মাসুদ ভাই তখন আমাদের সবাইকে দুই লাইনে দাঁড়া করিয়ে দিল। লাইনের সামনে আলাউদ্দিন চাচা তার সাথে আরো কয়েকজন, মাসুদ ভাই এই কয়েক দিন তাদের গান শিখিয়েছে। আলাউদ্দিন চাচা তখন তার মোটা গলায় গাইতে শুরু করল, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি!' গানটা খুবই সোজা ঘুরেফিরে এই দুইটা লাইনই গাইতে হয় তাই একটু পরে আমরাও যোগ দিলাম, আমাদের গলায় কোনো সুর নাই কিন্তু তাতে সমস্যা কী?

আমাদের স্কুল খুবই কাছে কিন্তু মাসুদ ভাই আমাদেরকে নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল, পুরো গ্রাম ঘুরে এসে তারপরে আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া হবে। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ!

আমরা সবাই ফুলগুলো হাতে ধরে রেখে আস্তে আস্তে হাঁটছি। যে যে রকম পারি সে রকম আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটি গাইছি। আমার পাশেই মামুন সে হঠাৎ গান থামিয়ে আমাকে ডাকল, "এই রঞ্জু।"

"কী?"

"তুই ফুল না এনে গাছের পাতা এনেছিস কেন?"

আমি আমার হাতের দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি আমার হাতে কোনো ফুল নাই, শুধু কিছু পাতা। অন্ধকারে ফুল মনে করে আমি কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনেছি! আমি এদিক-সেদিক তাকালাম, সবার হাতেই কোনো না কোনো ফুল, শুধু আমার হাতে গাছের পাতা! নিজেকে বেকুবের মতো লাগছিল কিন্তু কী আর করব, শুধু গাছের পাতা নিয়েই হাঁটতে থাকলাম। পাজি মামুনটা ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলতে লাগল, "দেখ দেখ। রঞ্জুটা কী গাধা, ফুল না এনে কয়েকটা গাছের পাতা নিয়ে এসেছে।" সবাই আমাকে দেখে হি হি করে হাসতে লাগল, আমি শুধু গম্ভীর হয়ে বললাম, "ভালো হবে না কিন্তু। শহীদ দিবসে হাসাহাসি করছিস তোদের লজ্জা করে না? মাসুদ ভাইকে বলে দেব কিন্তু।"

শহীদ দিবসে হাসাহাসি করা ঠিক হবে না ভেবে তখন সবাই অবশ্যি হাসাহাসি থামিয়ে মুখ গম্ভীর করে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা গ্রামের সড়ক ধরে একেবারে শেষ পর্যন্ত গিয়ে হিন্দুপাড়াটা ঘুরে ফিরে এলাম। আমাদের গান শুনে সবাই বাড়ির ভেতর থেকে বের হতে লাগল। বাড়ির বউ-ঝিরা উঁকি দিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। মজা দেখার জন্য ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের সাথে সাথে হাঁটতে লাগল। অনেকেই আমাদের প্রভাতফেরিতে যোগ দিতে লাগল। ফালতু মতির বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় আমরা মতিকে দেখলাম, সে একটা দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ধরে রেখে তাদের বাংলাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন মতির দিকে তাকালাম তখন মতি পিচিক করে মাটিতে থুতু ফেলল। আমরা যখন লতিফা বুবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম লতিফা বুবুও বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এসে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের দেখে লতিফা বুবু হাত নাড়ল, আমরাও তখন জোরে জোরে হাত নাড়তে থাকলাম।

আমাদের প্রভাতফেরি যখন আমাদের স্কুলের শহীদ মিনারে এসে পৌঁছেছে তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। শহীদ মিনারটাকে চুনকাম করে সাদা রং করা হয়েছে, ঠিক মাঝখানে লালসালু দিয়ে তৈরি গোল সূর্য। আসল শহীদ মিনার আমি দেখি নাই কিন্তু আমাদেরটা থেকে সেটা বেশি সুন্দর হবে বলে মনে হয় না।

শহীদ মিনারে গিয়ে সবাই একে একে ফুল দিতে লাগল। আমার হাতে ফুল নাই শুধু গাছের পাতা, তাই আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মাসুদ ভাই তখন শহীদ মিনারের বেদিতে আলাউদ্দিন চাচা আর অন্যদের বসার ব্যবস্থা করছিল, আমি তখন তার সাথে কথা বলার ভান করে বেদিতে উঠে খুবই সাবধানে আরেকজনের দেওয়া কয়েকটা ফুল তুলে নিলাম। একই দিনে দ্বিতীয়বার চুরি করতে হলো— মহৎ কাজে ছোটখাটো চুরিচামারি করলে কোনো দোষ হয় না।

তবে সমস্যা হলো মামুনকে নিয়ে, আমি যখন ফুল হাতে নিয়ে বেদির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন সে চিৎকার করে উঠল, "এই রঞ্জু। তুই এই ফুল কোথায় পেয়েছিস? নিশ্চয়ই চুরি করেছিস?"

আমি বললাম, "খবরদার কথা বলবি না। চুপ করে থাক। না হলে দাঁত ভেঙে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামুন চুপ করে থাকত কি না জানি না, কিন্তু শহীদ দিবসে ঝগড়া করা ঠিক হবে না মনে করেই হয়তো শেষ পর্যন্ত চুপ করে রইল।

মাসুদ ভাই আমাদের সবাইকে শহীদ মিনারের সামনে বসিয়ে দিল। স্কুলের স্যারেরা বেদির উপরে বসলেন, তারপর বক্তৃতা শুরু হলো। স্যারদের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নাই তাই যার যা কিছু মনে আসে বলে গেলেন। চিকা স্যারের বক্তৃতাটা আমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, শুনলাম বলা ভুল হবে, বলা উচিত 'দেখলাম'। তার কারণ বক্তৃতা দিতে দিতে স্যার কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন, তাঁর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, মুখে কেমন যেন ফেনা জমে গেল এবং স্যার কেমন যেন মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে শুরু করলেন। তখন অন্য কয়েকজন স্যার চিকা স্যারকে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন। চিকা স্যার বসে থেকেই কেমন যেন তিরতির করে কাঁপতে থাকলেন। সবার শেষে বক্তৃতা দিলেন মাসুদ ভাই, বক্তৃতাটা পুরো বুঝতে পারলাম না, দেশের খুব বড় ঝামেলা হচ্ছে, সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কিছু একটা করে ফেলতে হবে, এ রকম কিছু কথা বলল কিন্তু কী করতে হবে আমরা বুঝতে পারলাম না।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর গান শুরু হলো। আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা কয়টা গান গাইল। আমাদের ক্লাসের নীলিমাও একটা গান গেয়ে শোনাল, সে যে গান গাইতে পারে, আমরা কেউই জানতাম না। সবার শেষে গান গাইল আমাদের আলাউদ্দিন চাচা— পকেট থেকে মুড়ি বের করে চিবুতে চিবুতে আমি গান শুনতে লাগলাম, কী সুন্দর সেই গান, সেটা আর বলে বোঝানো যাবে না।

সব মিলিয়ে আমাদের ছোট কাঁকনডুবি গ্রামের সেই একুশে ফেব্রুয়ারিটা ছিল বিশাল একটা ঘটনা। ঠিক কী কারণ জানা নেই কিন্তু আমাদের সবারই মনে হতে লাগল আমরা বুঝি একটুখানি হলেও বড় হয়ে গেছি। মনে হতে লাগল এই যে কাঁকনডুবি গ্রাম, এখানকার গাছপালা, নদী-রাস্তা তার বাইরেও বড় কিছু একটা আছে। দেশ কথাটা আগে কতবার শুনেছি, কিন্তু সেটা কী আগে বুঝতে পারিনি, কেন যেন মনে হতে লাগল দেশ ব্যাপারটা একটু একটু বুঝতে পারছি। কার সাথে এটা নিয়ে কথা বলা যায় আমি শুধু সেটা বুঝতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

সোমবার স্কুল থেকে বের হয়েই টের পেলাম কিছু একটা হয়েছে কিন্তু কী হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না। মানুষজনের মাঝে একধরনের উত্তেজনা, নিজেরা কথা বলছে এবং খুবই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছে, আমরা ছোট বলে কেউ আমাদের পাত্তা দেয় না। তাই ব্যাপারটা কী ঘটেছে কেউ আমাদেরকে বলছে না। ইলেকশনের পর যখন নৌকা মার্কা বলতে গেলে সবগুলো সিট পেয়ে গেল সেই দিন সারা গ্রামের মানুষের মাঝে এ রকম উত্তেজনা ছিল— কিন্তু সেই উত্তেজনাটা ছিল আনন্দের উত্তেজনা। আজকের উত্তেজনাটা কেমন, যেন রাগী রাগী উত্তেজনা— মনে হয় ঢাকা শহরে বড় কিছু ঘটে গেছে।

আমি আর মামুন তাড়াতাড়ি হেঁটে বলাই কাকুর চায়ের স্টলের দিকে রওনা দিলাম, আর কেউ কিছু আমাদের না বললেও বলাই কাকু নিশ্চয়ই আমাদের বলবে।

বলাই কাকুর চায়ের স্টলে গিয়ে দেখি সেখানে অনেক ভিড়, বলাই কাকুর রেডিওটা চলছে আর সবাই খবর শোনার চেষ্টা করছে। মাসুদ ভাইও সেখানে আছে তার মুখটা কেমন জানি থমথম করছে, দুই আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট, একটু পর পর সেটা টানছে।

ভিড় ঠেলে আমি মাসুদ ভাইয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মাসুদ ভাই, কী হয়েছে?"

মাসুদ ভাই রাগী রাগী গলায় বলল, "যেটা সন্দেহ করেছিলাম বদমাইসগুলি তাই করেছে।"

"কোন বদমাইশগুলি? কী করেছে?"

"পরশু দিন পার্লামেন্ট বসার কথা— ইয়াহিয়া খান আজকে বন্ধ করে দিয়েছে। সারা দেশে আগুন ধরে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখন কী হবে?"

"জানি না। বঙ্গবন্ধু হরতাল ডেকেছে।"

বলাই কাকু কাঁপা গলায় বলল, "রেডিও পাকিস্তানে কিছু বলে না, বিবিসি শুনতে হবে।"

মাসুদ ভাই বলল, "ফার্মগেটে মিলিটারি গুলি করে অনেক পাবলিক মেরে ফেলেছে।"

একজন বলল, "কত বড় সাহস।"

বলাই কাকু বলল, "শুধু ঢাকাতে না, খুলনা, যশোর, চিটাগাং সব জায়গায় গোলাগুলি হয়েছে। কারফিউ দিয়ে রেখেছে।"

কারফিউ কথাটা শুনলেই ভয় লাগে। কারফিউয়ের সময় বের হলেই গুলি। কী ভয়ানক।

মাসুদ ভাই মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, "এটা হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না।"

বলাই কাকুর চায়ের দোকানে তখন সবাই কথা বলতে লাগল, টেবিলে থাবা দিতে লাগল। বলাই কাকু চিন্তিত মুখে চা বানাতে লাগলেন, টেবিলে টেবিলে চা দিতে লাগলেন। আজকে আর আমাদের ফ্রি চা খাওয়ার কোনো আশা নাই, আমরা তাই আর অপেক্ষা না করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

বাড়িতে এসে দেখি নানি উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে। মানুষ বুড়ো হলে শুয়ে-বসে থাকে, একটু আরাম করার চেষ্টা করে। নানি হচ্ছে তার উল্টো, সারাক্ষণই কাজ করছে— যখন কোনো কাজ থাকে না তখনো কীভাবে কীভাবে জানি কাজ আবিষ্কার করে ফেলে। আমাকে দেখে নানি অবাক হবার ভান করে বলল, "কী ব্যাপার! আজকে লাট সাহেব এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে? ব্যাপারটা কী?"

আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, "নানি, দেশে খুব বড় বিপদ।"

"কী বিপদ?"

"ইয়াহিয়া খান পার্লামেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।"

"কী বন্ধ করে দিয়েছে?"

"পার্লামেন্ট।"

"সেইটা আবার কী?"

সেইটা কী, আমি নিজেও জানি না তাই আলাপটা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলাম, বললাম, "বঙ্গবন্ধু খুবই রাগ, হরতাল ডেকেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হরতাল আবার কী?"

হরতাল জিনিসটা কী আমরা শিখে গেছি, তাই নানিকে বোঝালাম, "হরতালের সময় কোনো গাড়ি-ঘোড়া চলে না, দোকানপাট খোলে না, সবকিছু বন্ধ থাকে—"

নানির মুখে যা একটু দুশ্চিন্তার ভাব এসেছিল এবারে সেটা পুরোপুরি কেটে গেল। বলল, "আমাগো কাঁকনডুবিতে গাড়ি-ঘোড়াও নাই, দোকানপাটও নাই, হরতাল হলে কী আর না হলেই কী?"

নানি আবার উঠান ঝাড়ু দিতে যাচ্ছিল তখন আমি বললাম, "সারা দেশে কারফিউ। মিলিটারি গুলি করে অনেক মানুষ মারছে। অনেক গোলমাল।"

এইবারে নানির মুখের মাঝে একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। একটু মাথা নেড়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আহারে। কার বুকের ধন, কে জানি কাইড়া নিল! ইশ রে!"

আমি বইগুলো ঘরের ভেতর বিছানার উপরে রেখে বাইরে এলাম। নানি আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে। ঝাড়ু দিতে দিতে কথা বলছে, একা একা যতক্ষণ ছিল কথা বলে নাই, এখন আমি এসেছি আর সাথে সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। এখন কথাগুলো হচ্ছে অভিশাপ আর গালি, যে মিলিটারিগুলো গুলি করে দেশের মানুষ মারছে তাদেরকে গালি, "তোরা মর। তোরা গুষ্টি নিয়ে মর। মরে নির্বংশ হ। মুখে রক্ত উঠে মর-মরে দোজখে যা, জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মর—"

নানির গালিগুলো খুবই শক্তিশালী, নিঃশ্বাস না ফেলে নানি টানা গালি দিয়ে যেতে পারে, শুনতে খুবই ভালো লাগে।

বাড়িতে মন টিকছিল না বলে ভাত খেয়ে আবার বের হলাম। দুপুরের উত্তেজনাটা একটু কমেছে, পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেবার পর বঙ্গবন্ধু কী বলেন সবাই এখন সেটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি একা একা কাঁকনডুবি গ্রামের ভেতর হেঁটে বেড়ালাম। ঠিক কী কারণ জানি না ভেতরে ভেতরে একটু অস্থির লাগছিল।

পরের কয়েকটা দিন খুবই উত্তেজনার মাঝে কাটল। তার কারণ মাসুদ ভাই আমাদেরকে জানাল বাংলাদেশ প্রায় হয়েই গেছে। বাংলাদেশের একটা ফ্ল্যাগ তৈরি করা হয়েছে সেটা এখন সারা দেশে উড়ছে। নূতন একটা দেশ হলে ফ্ল্যাগের সাথে সাথে একটা জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীত লাগে, সেটাও হয়ে গেছে। 'আমার সোনার বাংলা' বলে নাকি রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, সেটা হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীত। এত কষ্ট করে মাত্র 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' গানটা শিখেছি এখন আবার নূতন করে সোনার বাংলা গানটা শিখতে হবে! নীলিমা মনে হয় এখনই সেটা জানে। বাংলাদেশ যে হয়েই গেছে তার আরও প্রমাণ আছে, আগে বলত রেডিও পাকিস্তান ঢাকা এখন বলে ঢাকা বেতার কেন্দ্র। আমি মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম রেডিও বাংলাদেশ কেন বলে না, মাসুদ ভাই বলল যে এখনো বাংলাদেশের আসল ঘোষণাটা দেওয়া হয় নাই, সেই জন্য রেডিও বাংলাদেশ বলছে না। বঙ্গবন্ধু ৭ তারিখে ঢাকার রেসকোর্সের ময়দানে বাংলাদেশের ঘোষণা দেবেন তখন থেকে পুরোপুরি বাংলাদেশ হয়ে যাবে। আমার ভেতরে একই সাথে একধরনের আনন্দ-উত্তেজনা আর ভয় কাজ করতে লাগল। যখন আশপাশে কেউ নেই তখন মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "৭ তারিখে বাংলাদেশের ঘোষণা দিলে মিলিটারিরা আক্রমণ করবে না? ইয়াহিয়া খান এমনি এমনি মেনে নেবে?"

মাসুদ ভাই তখন প্রথমে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর একটু মাথা চুলকে বলল, "মেনে নেওয়ার কথা না। কিন্তু পুরো দেশটা এখন চলছে বঙ্গবন্ধুর কথায়। সারা দেশে এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা নাই। মিলিটারি কী করবে? তবে—"

"তবে কী?"

"দরকার হলে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করার জন্যও সবাই রেডি হচ্ছে। সব জায়গায় ছেলেমেয়েরা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে।"

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল, জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা ট্রেনিং নেব না?"

মাসুদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "যুদ্ধ হচ্ছে বড়দের ব্যাপার। বড়রা ট্রেনিং নেবে! তোমরা ছোট।"

আমার একটু মন খারাপ হলো, মাসুদ ভাই আমাকে বিশ্বাস করছে না কিন্তু ঠিকই আমি ট্রেনিং নিতে পারব। লেখাপড়ায় আমি সুবিধা করতে পারি না কিন্তু দৌড়ঝাঁপ সাঁতার মারামারিতে আমার ধারে-কাছে কেউ নাই। যুদ্ধ তো এক রকম মারামারিই— হাতে না করে বন্দুক দিয়ে করবে এই পার্থক্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বড়দের ট্রেনিং কি হবে?"

"চেষ্টা করছি। আমি তো মিলিটারি ট্রেনিং দিতে পারব না। মিলিটারি ট্রেনিং দিতে দরকার মিলিটারি মানুষ। শুনেছি পাশের এক গ্রামে একজন রিটায়ার্ড ইপিআর সুবেদার আছে তাকে নিয়ে আসব ভাবছি।"

সব গ্রামে একজন পাগল একজন ফালতু মানুষ আর একজন গায়ক থাকে। কিন্তু সব গ্রামে রিটায়ার্ড ইপিআর সুবেদার থাকে না— কোনো কোনো গ্রামে থাকে। আমাদের কাঁকনডুবিতে নাই।

আস্তে আস্তে আমাদের কাঁকনডুবিতে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মার্চের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়ে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ করে দেবেন সেই জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছি। দেশের মানুষ অবশ্যি থেমে নেই, সব জায়গায় মিছিল করছে, পাকিস্তান মিলিটারি গুলি করে এখানে-সেখানে মানুষ মারছে। সেই জন্য বঙ্গবন্ধু রেগে আগুন হয়ে আছেন।

বলাই কাকুর চায়ের স্টলে গিয়ে একদিন আরেকটা ভয়ংকর খবর পেলাম, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মানুষটা পাঞ্জাবি হলেও নাকি ভালোই ছিল এখন তাকে সরিয়ে সেখানে টিক্কা খান নামে একটা জল্লাদকে বসিয়েছে। এই জল্লাদ তাদের দেশে এত মানুষ গুলি করে মেরেছে যে তাকে নাকি কসাই টিক্কা বলে ডাকে।

বলাই কাকুর চায়ে চুমুক দিতে দিতে একজন বলল, "টিক্কা খানের চেহারা নাকি জানোয়ারের মতো, চোখ দুইটা সব সময় লাল।"

আরেকজন বলল, "গায়ের রং নিশ্চয়ই কুচকুচে কালো তা না হলে নাম টিক্কা কিসের জন্য।"

কথাটাতে যুক্তি আছে, গ্রামের মানুষ হুঁকো খাওয়ার সময় যে টিকেতে আগুন জ্বালায় সেটা আসলেই কুচকুচে কালো। সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

আরেকজন বলল, "তামুক খাওয়ার সময় টিক্কার পেছনে আমরা আগুন দিই না? এই টিক্কার পেছনেও আগুন দিয়ে তারে দেশ থেকে তাড়াতে হবে।"

খুব ভালো একটা রসিকতা হয়েছে চিন্তা করে সবাই আনন্দে হা হা করে হাসল। আমাদের গ্রামের মানুষ খুবই সাদাসিধা ধরনের তারা অল্পতেই হাসে আবার অল্পতেই রেগে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর ৭ তারিখের ভাষণটা রেডিওতে শোনাবে, সেই জন্য আমরা সেই দুপুর থেকে বলাই কাকুর চায়ের স্টলে হাজির হলাম। বলাই কাকু ছাড়াও যাদের বাড়িতে রেডিও আছে সেখানে সবাই ভিড় করল। ভাষণ শুরু হবার আগে একজন রেসকোর্সের বর্ণনা দিচ্ছে, সে বলল সেখানে নাকি কমপক্ষে বিশ লক্ষ মানুষ আছে। বিশ লক্ষ মানুষ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার। এর আগে কি পৃথিবীর কোনো দেশে একটা ভাষণ শুনতে বিশ লক্ষ মানুষ হয়েছে? আকাশে হেলিকপ্টার উড়ছে। মিলিটারির হেলিকপ্টার, তাদের আবার কোনো বদ মতলব নাই তো?

ঠিক যখন ভাষণ শুরু হতে যাবে তখন রেডিও থেকে প্রচার বন্ধ করে দিল। যারা হাজির ছিল প্রথমে সবাই রেগে চিৎকার করে উঠল, তখন একজন বলল, "রেসকোর্সে কিছু হয় নাই তো? মিলিটারি আক্রমণ করে নাই তো?"

তখন সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সত্যিই তো রেসকোর্সে মিলিটারি আক্রমণ করে নাই তো? বঙ্গবন্ধুর কিছু হয় নাই তো?

বলাই কাকু তাড়াতাড়ি রেডিওর নব ঘুরিয়ে অন্যান্য স্টেশনে কী বলে শোনার চেষ্টা করলেন, আকাশবাণীতে শুনলেন, সবকিছু শুনে বুঝলাম বঙ্গবন্ধুর কিছু হয় নাই, শুধু পাকিস্তানিরা তার ভাষণটা প্রচার করতে দিচ্ছে না। রাগে আমার গা জ্বলে গেল! এই মুহূর্তে ঢাকার রেসকোর্সে যে বিশ লক্ষ মানুষ আছে শুধু তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা শুনতে পাচ্ছে, আমরা কেউ শুনতে পাচ্ছি না।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ছটফট করে বেড়ালাম, রাত্রিবেলা খবর পেলাম বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে নাকি এমন একটা ভাষণ দিয়েছেন যে রকম ভাষণ সারা পৃথিবীতে আগে কেউ কখনো দেয় নাই পরেও কেউ কখনো দেবে না! আজকে থেকে পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে বাংলাদেশ সেই কথাটা বলেন নাই কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এই সংগ্রামটা এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম! সবাইকে বলেছেন দরকার হলে যার কাছে যেটা আছে, সেটা নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। পাকিস্তানিরা এইটা মানতেও পারছে না, আবার কিছু করতেও পারছে না।

আমি যখন রাত্রে বাড়ি এসেছি তখন নানি পারলে আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলে। চিৎকার করে হাত-পা নেড়ে বলতে লাগল, "ওরে আমার লবাবের বাচ্চা, দেখো কত রাতে বাড়িতে আসে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা শুনতে চাচ্ছিলাম—"

"তুই ভাষণ শুনবি? আগে আমার ভাষণ শোন! দিন নাই, রাত নাই ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবি, আমি বুড়া মানুষ আজকে আছি, কালকে নাই— আমার উপরে তোর মায়া-দয়া নাই? তোর বাপ-মা এইটা কেমন করে করল? আমার কাছে তোর দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল। আমি তোরে কেমন করে মানুষ করব? তোর নাকে টিপলে দুধ বের হবে আর তুই মাঝরাত্রে বাড়ি ফিরে আসিস, যত দিন যায় তত জংলি হয়ে বড় হচ্ছিস—"

আমি বললাম, "বেশি রাত হয় নাই নানি। কাজীবাড়ির ঘড়িতে দেখে আসছি মাত্র আটটা—"

"আমারে তুই ঘড়ির টাইম শুনাবি? আর কী শুনাবি তুই? আয় তুই কাছে, যদি তোর কান আজকে টেনে ছিঁড়ে না ফেলি।"

নানির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না, তাই আমি মুখের মাঝে একটা কাঁচুমাচু ভাব করে নানির কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগলাম। নানি টানা চিৎকার করতে লাগল, আমি ধৈর্য ধরে শুনতে লাগলাম। নানির চিৎকার শুনতে আমার ভালোই লাগে!

এর পরের দিনগুলো কেমন যেন অস্থির অস্থিরভাবে কেটে যেতে লাগল। এমনিতে কাঁকনডুবি গ্রামটা দেখে বোঝারই উপায় নাই সারা দেশে কত কী ঘটে যাচ্ছে। টিক্কা খানকে গভর্নর বানিয়েছে কিন্তু হাইকোর্টের জজ তাকে শপথ পড়াতে রাজি হন নাই, তাই টিক্কা খান নাকি মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে বলেছে বঙ্গবন্ধু যেন এখনই কিছু না করে ফেলেন— সে বঙ্গবন্ধুর সাথে মীমাংসা করার কথা বলতে আসছে। শুধু ইয়াহিয়া খান না পশ্চিম পাকিস্তানে ইলেকশনে জিতেছে যে মানুষ— জুলফিকার আলী ভুট্টো সেও আসছে। আমি অবশ্যি ভেবে পাই না একজন মানুষের নাম ভুট্টো হয় কেমন করে? ভুট্টা কিংবা ভুট্টো যদি নাম হতে পারে তাহলে মাষকলাইয়ের ডাল কেন নাম হতে পারে না? জুলফিকার আলী মাষকলাইয়ের ডাল! কেমন লাগে শুনতে?

একদিন খবর পেলাম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাথে জুলফিকার আলী ভুট্টো আর ছোট-বড়-মাঝারি অনেক নেতা চলে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে মনে হয় সবার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। একজনের পর আরেকজন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করে যাচ্ছে। এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপের কী আছে আমি বুঝি না। ঘাড় ধরে সবগুলোকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিলেই হয়!

একদিন বলাই কাকুর চায়ের স্টলে যখন কেউ নাই, বলাই কাকু তার কাচের গ্লাসে বেশি করে দুধ-চিনি দিয়ে আমাকে আধা গ্লাস ফ্রি চা বানিয়ে দিয়েছে তখন আমি চা খেতে খেতে বলাই কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বলাই কাকু, বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে সাথে অন্য সবগুলোকে ঘাড় ধরে বের করে দেয় না কেন?"

বলাই কাকু হেসে ফেললেন, "কেমন করে বের করবেন?"

"মনে নাই তাঁর ভাষণে বিশ লাখ লোক হয়েছিল! এই বিশ লাখ লোককে অর্ডার দেবেন, বলবেন যাও সবাইকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।"

বলাই কাকু এবারে হাসলেন না, বললেন, "সেই কাজটা বেআইনি হতো। বঙ্গবন্ধু এখন পর্যন্ত একটা বেআইনি কাজ করেন নাই!"

"তারা বেআইনি কাজ করলে দোষ নাই, প্রত্যেক দিন গোলাগুলি করে, মানুষ মারে তখন কিছু হয় না। আর বঙ্গবন্ধু করলে দোষ?"

বলাই কাকু মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু হচ্ছে। জয়দেবপুরে তো বাঙালিদের সাথে পাকিস্তানিদের একটা যুদ্ধই হয়ে গেল।"

কোথায় কোথায় কীভাবে যুদ্ধ হয়েছে আমি জানতাম না, বলাই কাকু সেগুলোর গল্প শোনালেন। সোয়াত নামে একটা জাহাজে করে পাকিস্তানিরা অনেক অস্ত্র এনেছে, সেই অস্ত্র বাঙালিরা নামাতে দিচ্ছে না। যশোর থেকে খুলনায় মিলিটারিদের একটা ট্রেন যাচ্ছিল, সেই ট্রেন বাঙালিরা আক্রমণ করে বসেছে। সারা দেশে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব।

আমাদের কাঁকনডুবিতেও একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব শুরু হয়েছে। পাশের গ্রাম থেকে ইপিআরের সুবেদারকে খুঁজে বের করে মাসুদ ভাই মিলিটারি ট্রেনিং শুরু করেছে। স্কুলের মাঠে বিকেলবেলা ছেলেদের নিয়ে সুবেদার লেফট-রাইট করায়। সুবেদারের কেমন জানি রাগী রাগী চেহারা দেখলে ভয় লাগে। মাসুদ ভাই থানার সাথে যোগাযোগ করেছে তাদের রাইফেলগুলো ধার দেওয়ার জন্য। তাহলে সবাইকে রাইফেল চালানো শেখাবে। আমরা বিকেলবেলা স্কুলের মাঠে বসে বসে ট্রেনিং দেখি। খুবই সোজা ট্রেনিং। ইচ্ছা করলেই আমরা এই ট্রেনিং নিতে পারি কিন্তু ছোট বলে আমাদের নেয় না। দুঃখে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই বাংলাদেশের একটা পতাকাও তৈরি করে এনেছে। সবুজের মাঝখানে লাল একটা সূর্য, তার ভেতরে হলুদ রঙের পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ— এখন অবশ্যি আমরা কেউ পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ বলি না, বলি বাংলাদেশের ম্যাপ। বাংলাদেশের ম্যাপটা হওয়ার কথা সোনালি রঙের, সোনালি রং পাওয়া ঝামেলা বলে কাছাকাছি হলুদ রং তৈরি করা হয়েছে। বড় পতাকাটা স্কুলের মাঠে টানানো হয়, সবাই যখন লেফট-রাইট করে তখন এই পতাকাটাকে স্যালুট করতে হয়। মাসুদ ভাই বলেছে আরো ছোট ছোট বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ তৈরি করে দেবে, আমরা সেগুলো আমাদের বাড়িতে টানাব। সারা দেশে কারফিউ দিয়ে মানুষজনকে মারছে সেই জন্য বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি কালো পতাকাও টানাতে হবে। কালো পতাকা বানানো অবশ্যি সোজা, একটা কালো কাপড়কে চারকোনা করে কাটলেই হয়ে গেল, সেই তুলনায় বাংলাদেশের পতাকা অনেক কঠিন। ম্যাপটা বানাতেই বারোটা বেজে যায়। সেটা সেলাই করে লাগানো আরো কষ্ট।

সবকিছু মিলিয়ে চারপাশে অস্থির অস্থির ভাব, কবে যে এই অস্থির ভাবটা শেষ হবে কে জানে।

AMARBOI.COM

মার্চ মাসের ২৫ তারিখ একটা ভাসা ভাসা গুজব শোনা গেল যে ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলাপ নাকি ভেঙে গেছে। ব্যাপারটা ভালো হলো না খারাপ হলো আমি বুঝতে পারলাম না। বিকেলবেলা স্কুলে যখন মিলিটারি ট্রেনিং হচ্ছে তখন মাসুদ ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসুদ ভাইও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারল না। ছাত্ররা নাকি সারা ঢাকা শহরে ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে যেন মিলিটারি কোথাও যেতে না পারে।

রাত্রিবেলা যখন শুয়েছি তখন শুনলাম একটা কুকুর ঠিক মানুষের কান্নার মতো শব্দ করে ডাকছে, শুনে কেমন জানি ভয় করে। নানি বলল, "এই অপয়া কুত্তাটা এই রকম করে কান্দে কেন? এই কু-ডাক তো ভালো না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয় এইভাবে ডাকলে?"

"বিপদের সময় কুত্তারা এইভাবে কান্দে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুর বিপদের খবর আগে থেকে পায় তার কারণটা কী হতে পারে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে গেলাম।

গভীর রাত্রে নানি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল, বলল, "এই রঞ্জু ওঠ। তাড়াতাড়ি।"

আমি ধড়মড় করে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে নানি?"

"কী যেন হয়েছে। শুনতে পাচ্ছিস না?"

আমি কান পেতে শুনলাম, আমাদের বাড়ির সামনে সড়কে মানুষের গলার শব্দ। তার মাঝে একজন কোনো একটা কিছুতে ঠনঠন করে শব্দ করল, তখন মানুষের গলায় শব্দ থেমে গেল, তখন একজন চিৎকার করে কিছু একটা বলতে লাগল। ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না তাই আমি দরজা খুলে ছুটে বাইরে বের হয়ে এলাম, নানি আমাকে থামাল না। নিজেও পেছনে পেছনে বের হয়ে এল।

বাড়ির সড়কে এই মাঝরাত্রেও অনেক ভিড়। একজনের হাতে হ্যারিকেন, সামনে একজনের হাতে একটা কেরোসিনের খালি টিন, মানুষটা এটাতে বাড়ি দিয়ে ঠনঠন শব্দ করে। সবার সামনে আমাদের গ্রামের নজু ভাই। মাসুদ ভাইয়ের মিলিটারি ট্রেনিংয়ে সব সময় থাকে। নজু ভাই চিৎকার করে বলছে, "জাগো। গ্রামবাসী জাগো। জাগো দেশবাসী জাগো। জাগো বাঙালি জাগো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তান মিলিটারি ঢাকা শহরে আক্রমণ করেছে। পুলিশ-ইপিআর ছাত্র-জনতা তাদের সাথে যুদ্ধ করছে। ঢাকা শহরে এখন ভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছে। এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ।"

আমার বুকের ভেতরটা জানি কেমন করে উঠল। মানুষগুলো হেঁটে হেঁটে চলে যাবার পরও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম দূর থেকে নজু ভাই চিৎকার করে ডাকছে, "জাগো দেশবাসী জাগো। জাগো দেশবাসী জাগো!"

নানি আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "আয়, ঘরে আয়।"

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "নানি। এখন কী হবে?"

নানি উত্তর দেবার আগেই কুকুরটা ঠিক মানুষের কান্নার মতো শব্দ করে ডেকে উঠল। কী ভয়ংকর সেই ডাক।

নানি চাপা গলায় বলল, "ফি আমানিল্লাহ! ফি আমানিল্লাহ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬.

বলাই কাকুর চায়ের স্টলে খুব ভিড়। মানুষগুলোর উশকু-খুশকো চেহারা, কাল রাতে মিলিটারি ঢাকা শহর আক্রমণ করেছে খবর পাবার পর কেউ আর ভালোমতো ঘুমাতে পারেনি। ঢাকা রেডিও স্টেশনে খুবই খারাপ উচ্চারণে একজন মাঝে মাঝে হুমকি-ধামকি দিয়ে কথা বলছে— কী অবাক লাগে যখন একটা রেডিও থেকে কেউ এই ভাষায় কথা বলে। চিটাগাং রেডিও স্টেশনটা ঠিক আছে, সেখানে জানা গেল সারা দেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে, পাকিস্তানি মিলিটারি যুদ্ধে প্রায় হেরেই যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবার দুশ্চিন্তা, জানা গেল বঙ্গবন্ধু নিরাপদে আছেন। সেটা শুনে বলাই কাকুর চায়ের দোকানে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বঙ্গবন্ধু ভালো থাকলেই কেউ কিছু করতে পারবে না।

আকাশবাণী কলকাতা থেকে শুধু আমার সোনার বাংলা গানটি গেয়ে শোনাচ্ছে, একবার বলে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, পাকিস্তান মিলিটারির সাথে বাঙালি পুলিশ, ইপিআর ছাত্র-জনতা যুদ্ধ করছে, তারপর আমার সোনার বাংলা গানটি শোনায়! আর অন্য কোনো অনুষ্ঠান নাই।

বিবিসি শুনে বোঝা গেল ঢাকায় সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা। পুরো শহরটা মনে হয় ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে, কত লোক মারা গেছে তার কোনো হিসাব নাই। বাইরে থেকে কেউ কোনো খবর পাচ্ছে না, কারণ সব বিদেশি সাংবাদিকদের ধরে জোর করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা এয়ারপোর্টে যাবার সময় যেটুকু দেখেছে তাতেই পুরোপুরি স্তম্ভিত। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ।

আমি বেশ কিছুক্ষণ বলাই কাকুর চায়ের স্টলে বসে থাকলাম, রেডিওতে যা বলছে, লোকজন যেসব আলোচনা করছে সেগুলো শুনলাম। মাসুদ ভাই এক কোনায় বসে উত্তেজিতভাবে একটার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। যখন বিদেশি কোনো রেডিও স্টেশনে ইংরেজিতে কিছু বলে মাসুদ ভাই সেটা বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সবাই মাসুদ ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছিল এখন কী হবে, মাসুদ ভাই এই প্রশ্নটার উত্তর ভালো করে দিতে পারে না। মাথা চুলকে বলে, "যদি পাকিস্তান মিলিটারিকে এখন হারিয়ে দিতে পারি তাহলে তো হয়েই গেল—"

"যদি না পারি?"

"তাহলে যুদ্ধ হবে। গেরিলা যুদ্ধ।"

"কত দিন?"

মাসুদ ভাইয়ের মুখটা শক্ত হয়ে যায়, চাপা স্বরে বলেন "নয়-দশ বছর।"

সেটা শুনে সবাই অবিশ্বাসের শব্দ করে। একজন জিজ্ঞেস করে, "এত দিন?"

মাসুদ ভাই বলেন, "আপনি জানেন ভিয়েতনাম কত দিন থেকে আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করছে?"

কেউই সেটা জানে না, তার পরেও সবাই এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সবকিছু জানে! আমাদের গ্রামের মানুষগুলো এ রকমই।

বলাই কাকুর চায়ের স্টলে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমি বের হলাম, বাড়ির কাছাকাছি আসার পর রাস্তায় মামুনের সাথে দেখা হলো। গাধাটা সারা রাত ঘুমিয়েছে, দেশে কী হচ্ছে কিছুই জানে না। সারা দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সেটা শুনে এত অবাক হলো যে বলার মতো নয়। আমি যখন তাকে সবকিছু বলছি তখন সেটা শোনার জন্য আমার চারপাশে আরো কিছু মানুষ জড়ো হয়ে গেল। আমি একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বললাম। একজন জিজ্ঞেস করল, "বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন?"

আমি পরিষ্কার জানি না তার পরেও বলে দিলাম, "নিরাপদে আছেন, গোপন জায়গা থেকে যুদ্ধের অর্ডার দিচ্ছেন।"

"যুদ্ধের কী অবস্থা?"

ভাসা ভাসা যেটুকু শুনেছি সেটাই একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বললাম, "চিটাগাং আমাদের দখলে। সেইখান থেকে আমাদের সৈন্য ঢাকার দিকে আগাচ্ছে। কালকের ভেতর ঢাকা দখল করে ফেলবে।"

"ঢাকার অবস্থা কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুব খারাপ, ঢাকা শহরের একটা মানুষও বেঁচে নাই।"

"ইয়া মাবুদ।"

আমি আর মামুন গ্রামের মাঝে ঘুরে বেড়ালাম। অনেকেই আমাদের কাছে দেশের খবর জানতে চাইল, আমি আমার মতো করে দেশের খবর দিতে লাগলাম, আমার দেখাদেখি একটু পরে মামুনও বানিয়ে বানিয়ে যুদ্ধের খবর বলতে লাগল। মোটামুটিভাবে বিকেলের মাঝে কাঁকনডুবি গ্রামের সবাই জেনে গেল, ঢাকা শহরে একজন মানুষও বেঁচে নাই কিন্তু এ ছাড়া পুরো বাংলাদেশ আমাদের দখলে। তুমুল যুদ্ধ করে পাকিস্তানি মিলিটারিদের হারিয়ে সবাই ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। ঢাকা যেকোনো সময়ে দখল হয়ে যাবে। তখন সারা দেশ হবে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু হবেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট।

পরের দিন দুইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, দুপুরের দিকে চিটাগাং রেডিও স্টেশন থেকে মেজর জিয়া নামে একজন বঙ্গবন্ধুর নামে একটা ঘোষণা দিয়ে বলল বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। শুনে আমরা আনন্দে লাফাতে লাগলাম, আমি আর মামুন সবচেয়ে বেশি খুশি হলাম, তার কারণ আমরা নিজে থেকেই এটা আগেই সবাইকে বলে রেখেছি, আমাদের কথাটাই সত্যি বের হয়েছে।

বিকেলের দিকে অবশ্যি একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল। ঢাকা থেকে সরাসরি একজন মানুষ আমাদের কাঁকনডুবিতে হাজির হলো। মানুষটার খালি পা, পরনে লুঙি, গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট সেই শার্টে শুকনো রক্তের দাগ। মানুষটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো টকটকে লাল। চেহারার মাঝে এক ধরনের ভয়ের ছাপ।

সবাই মানুষটাকে ঘিরে দাঁড়াল, একজন জিজ্ঞেস করল, "ভাই ঢাকার কী অবস্থা?"

খুবই সহজ একটা প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া মোটেই কঠিন না কিন্তু মানুষটা উত্তর না দিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। যখন একজন বড় মানুষ কাঁদে সেই দৃশ্যটা কেন জানি খুবই খারাপ লাগে। আমার দেখার ইচ্ছা করছিল না, তবু দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের কাঁকনডুবির একজন মুরব্বি মানুষটার গায়ে হাত দিয়ে বলল, "বাবা, কান্দো কেন? বলো কী হইছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা শার্টের হাতায় চোখের পানি নাকের পানি মুছে বলল, "আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না কী অবস্থা! আমাদের বাসায় একটা জয় বাংলার পতাকা টানানো ছিল, নামাতে মনে নাই, মিলিটারি এসে বাসায় আগুন দিল। আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য বাসা থেকে বের হইছি তখন সাথে সাথে গুলি। গুলি আর গুলি—"

মানুষটা আবার কাঁদতে লাগল। সবাই তাকে ঘিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কী করবে বুঝতে পারছিল না। একসময় মানুষটা কান্না একটু থামিয়ে বলল, "আমি ভাবছিলাম আমার গুলি লাগছে, আমি বুঝি মরেই গেছি। যখন জ্ঞান হইছে দেখি আমি মরি নাই। আমার উপরে লাশ নিচে লাশ পাশে লাশ। কোনোভাবে লাশের ভেতর থেকে বের হইয়া দৌড়াচ্ছি আর দৌড়াচ্ছি। রাত নাই দিন নাই খালি হাঁটতে হাঁটতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এইখানে আসছি।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যাবেন কোনখানে।"

"কৈলাসপুর। আমার বাড়ি কৈলাসপুর।"

"সেটা তো মেলা দূরে। আপনি বিশ্রাম নেন। খান, তারপর কাল সকালে যাবেন।"

মানুষটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না না, আমার এখনই যেতে হবে। এখনই বাড়ি যেতে হবে।" কথা শেষ না করে আবার কাঁদতে লাগল।

সবাই মিলে মানুষটাকে জোর করে খাইয়ে দিল। খাওয়ার পর পরই মানুষটা সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল। একজন বলল, "মাথাটা আউলে গেছে। পুরাপুরি আউলে গেছে।"

আমি মাথা আউলে যাওয়া মানুষটার পিছু পিছু অনেক দূর হেঁটে গেলাম, গ্রাম শেষ হবার পর যখন ধানক্ষেত শুরু হয়ে গেছে তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম মানুষটা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাড়িতে তার কে আছে কে জানে। বাড়িতে গিয়ে সে কাকে কী বলবে, সেইটাই বা কে জানে।

পরের দিন ভোরবেলা ঢাকা থেকে আরো দুইজন লোক এল। ঘণ্টা খানেক পর আরো কয়েকজন। তারপর একসাথে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ হাজির হলো। সেখানে ছেলে-বুড়ো আর মহিলাও আছে। হঠাৎ করে ভটভট শব্দ করে একটা লঞ্চ এসে কালী গাংয়ের ঘাটে থামল, সেখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে অনেক মানুষ নামল। তারপর হঠাৎ করে সড়ক ধরে শত শত মানুষ আসতে লাগল, আমি জীবনেও একসাথে এত মানুষ দেখি নাই।

মানুষগুলো একেবারে বিধ্বস্ত, তাদের হেঁটে অভ্যাস নাই তাই পাগুলো একেবারে কেটে কুটে ফুলে আছে। চোখের নিচে কালি, ঠোঁটগুলো শুকনো, মহিলারা ছোট ছোট বাচ্চাদের বুকে চেপে রেখেছে। বাচ্চাগুলো চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এখন আর কাঁদতেই পারছে না। অনেক মানুষের জামাকাপড় রক্তমাখা— কেউ কেউ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কেউ কেউ অন্যের ঘাড় ধরে হাঁটছে। মানুষগুলো গত এক-দুই দিন মনে হয় কিছু খায়নি, চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। সবগুলো মানুষের চেহারার মাঝে একটা মিল আছে, সেটা হচ্ছে ভয় আর আতঙ্কের ছাপ। ভয়ের চিহ্নটি এতই স্পষ্ট যে দেখলেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়। সব সময়েই এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় হঠাৎ করে কেউ বুঝি তাদের ওপর লাফ দিয়ে পড়বে।

গ্রামের মানুষজন নিজেদের সাথে কথা বলে এই মানুষগুলোর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করল। আমাদের গ্রামের মানুষগুলো মোটামুটি সহজ-সরল। একটু লোভী, একটু কিপটে, একটু স্বার্থপর কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম এই শত শত মানুষকে দেখে হঠাৎ তাদের ভেতরকার সব খারাপ বিষয়গুলো যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই মিলে এই মানুষগুলোকে সাহায্য করতে শুরু করল। মাসুদ ভাই মনে হলো একটা মনের মতো কাজ পেল, সবার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিল। যাদের সাথে ছোট বাচ্চাকাচ্চা আছে তাদেরকে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে লাগল। আমিও দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা আর তাদের কমবয়সী বাবা-মাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম নানি দেখে না আবার রেগে ওঠে কিন্তু নানি একটুও রাগল না। বউটার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে জলচৌকিতে বসিয়ে বলল, "মা, তুমি যত দিন খুশি আমার বাড়িতে থাকো। তোমার কোনো চিন্তা নাই।"

নানির কথা শুনে বউটা কেঁদে ফেলল, আর মা'কে কাঁদতে দেখে ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা অবাক হয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবাটা কেমন যেন বেখাপ্পাভাবে উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না। চেহারা দেখে বোঝা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় এরা শহরের বড়লোক মানুষ— এখন এই গাঁওগেরামে এসে অন্যের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। আমি নানিকে বললাম, "নানি আমি যাই।"

অন্য দিন হলে নানি জিজ্ঞেস করত, 'কই যাস? কখন আসবি?' আজকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না, বলল, "যা।"

আমি বললাম, "নানি, অনেক মানুষ আছে স্কুলে তাদের জন্য সবাই ভাত রেন্ধে দিচ্ছে। তুমিও রেন্ধে দিয়ো।"

নানি বলল, "ঠিক আছে।" তারপর বলল, "তুই যাবার আগে মাচার ওপর থেকে বড় ডেগ দুইটা নামায়া দে।"

আমি মাচার ওপর থেকে বড় দুইটা ডেকচি নামিয়ে দিলাম, অনেক মানুষের জন্য রাঁধতে হলে বড় ডেকচি লাগতেই পারে।

স্কুলে সব মানুষের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। অল্প কিছু থালা-বাসন আছে বাকি সবাই কলাপাতায়। মানুষগুলো হাভাতের মতো খায়, দেখে মনে হয় এরা বুঝি জন্মেও খেতে পায়নি। চেহারা দেখে বোঝা যায় এদের মাঝে অনেকেই বড়লোক, বাসায় নিশ্চয়ই পোলাও-কোরমা খায়। এখানে তারা শুধু ডাল আর ভাত এত তৃপ্তি করে খাচ্ছে যে দেখে আমারই খেতে লোভ হচ্ছে।

মানুষগুলো খাওয়ার পর একটু একটু করে মুখ খুলতে শুরু করে, সেগুলো শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। তারা বলল, রাজারবাগে পুলিশের সাথে আর পিলখানায় ইপিআরের সাথে যুদ্ধ হয়েছে। পিলখানায় ইপিআরের কাছে অস্ত্র ছিল না, পাকিস্তান মিলিটারি আগেই তাদের নিরস্ত্র করে রেখেছে, তাই যুদ্ধ হয়েছে একতরফা। রাজারবাগে পুলিশের কাছে অস্ত্র ছিল, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, সেইটা দিয়েই ভয়ংকর যুদ্ধ করে মিলিটারিদের ঠেকিয়ে দিয়েছে। মিলিটারি তখন ভারী অস্ত্র এনে রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির হলগুলোকে মিলিটারি আক্রমণ করেছে। যত ছাত্র ছিল সবাইকে মেরে ফেলেছে। সবচেয়ে বেশি মেরেছে ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলে। শাঁখারীপট্টি পুরোটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, বস্তিগুলোও জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগুন থেকে বাঁচার জন্য যখন মানুষগুলো বের হয়েছে, তখন সবাইকে পাখির মতো গুলি করে মেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ঢাকা শহরের কিছু চিনি না, কিন্তু মানুষগুলোর মুখে মুখে যুদ্ধের বর্ণনা শুনে আমার মনে হতে লাগল আমি বুঝি ঢাকা শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

খেয়ে-দেয়ে মানুষগুলো যে যেখানে জায়গা পেয়েছে, সেখানেই শুয়ে পড়ল, দেখতে দেখতে তারা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে মানুষগুলোকে দেখতে লাগলাম। কয়েক দিন আগেও তাদের ঘরবাড়ি সবকিছু ছিল, এখন তারা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে কোনখানে যাবে কিছু জানে না। কে কী খাবে কোথায় ঘুমাবে, সেটাও জানে না, কী আশ্চর্য!

হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের শেষ মাথায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। বারান্দায় একজন মহিলা সোজা হয়ে বসে আছে, তার পাশে আরেকজন একটা প্লেটে একটু ভাত আর ডাল নিয়ে তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। মহিলাটি খাচ্ছেন না কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখলে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। এ রকম শূন্য দৃষ্টি আমি কখনো দেখিনি। শুধুমাত্র মানুষ মরে গেলেই বুঝি এ রকম দৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

পাশে দাঁড়ানো মানুষটি বলল, "আপা, একটু খাও। একটু—"

মহিলাটি কোনো কথা না বলে সেই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি আগে কখনো এ রকম দীর্ঘশ্বাস শুনিনি, মনে হয় বুকের ভেতর থেকে একটা হাহাকার বের হয়ে এল।

কী হয়েছে জানার জন্য আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম ঠিক তখন আমার পিঠে কে যেন হাত রাখল, তাকিয়ে দেখি মাসুদ ভাই। মাসুদ ভাই পিঠে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে আমাকে সরিয়ে নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মাসুদ ভাই, কী হয়েছে?"

মাসুদ ভাই বলল, "ওনাকে একটু একা থাকতে দাও।"

"কেন মাসুদ ভাই? ওনার কী হয়েছে?"

মাসুদ ভাই একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, "ঢাকা শহরে কারফিউ তোলার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সারা দিন হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যেবেলা এক জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন আবার হঠাৎ সেখানে মিলিটারি হামলা করল। সবাই তখন পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই একটু থামল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তখন কী হয়েছে?"

"ছোট মেয়েটার হাত ধরে ছুটছেন, তখন হাত থেকে মেয়েটা ছুটে গেল। আবার ধরে ফেলল, তারপর ছুটতে লাগলেন— অনেক দূর ছুটে গিয়ে দেখেন—"

"কী দেখেন?"

মাসুদ ভাই আবার নিঃশ্বাস ফেলল, "দেখেন অন্য একটা ছোট বাচ্চার হাত ধরে ছুটছেন! সেই বাচ্চাটা বেঁচে গেছে নিজের মেয়ে হারিয়ে গেছে— আর খুঁজে পাননি।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। মাসুদ ভাই বলল, "বুঝলে রঞ্জু, এটা হচ্ছে যুদ্ধ। পৃথিবীতে যুদ্ধ থেকে ভয়ংকর আর কিছু নেই। কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

পরের এক সপ্তাহ শুধু মানুষ আসতে লাগল, একটু বিশ্রাম নিয়ে, কিংবা এক রাত থেকে তারা আবার চলে যেতে লাগল। কাঁকনডুবি গ্রামের সব মানুষ মিলে এই মানুষগুলোর থাকা-খাওয়া আর বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করতে লাগল। এই কাজগুলো মাসুদ ভাই খুব ভালো পারে, তাঁর সাথে কাঁকনডুবি গ্রামের অনেক কমবয়সী মানুষ আছে, আমরাও আছি। প্রথম প্রথম সবাই আমাদের তাড়িয়ে দিত, বলত, "যাও যাও! ছোট পোলাপান ঝামেলা করো না।" আমরা তবু আশপাশে থাকতাম, কাজে সাহায্য করতাম, পানি এনে দিতাম, কলাপাতা ছিঁড়ে দিতাম, খাওয়ার পর কলাপাতা টুকিয়ে ফেলে আসতাম। কুকুরগুলোকে তাড়াতাম— আস্তে আস্তে বড়রা আমাদের মেনে নিল, নিজে থেকে আমাদের ছোটখাটো ফাই-ফরমাশ দিতে লাগল। আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে সেগুলো করতে লাগলাম।

মানুষজন যখন চলে যেত তখন আমরা তাদের বড় সড়কে তুলে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে সেটা দেখিয়ে দিতাম। তাদের কারো কাছে জিনিসপত্র বেশি কিছু থাকত না— যেটুকু থাকত সেটাই আমরা ঘাড়ে করে খানিক দূর নিয়ে দিতাম।

একজন মাঝবয়সী মানুষ তার বউ আর ষোল-সতেরো বছরের মেয়েকে আমরা বড় সড়কে তুলে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছি তখন মানুষটি দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত রেখে বলল, "খোকা, তোমার নাম কী?"

আমি বললাম, "রঞ্জু। ভালো নাম—"

মানুষটি বলল, "ভালো নাম লাগবে না। রঞ্জু দিয়েই হবে। বুঝেছ রঞ্জু, একদিন এই যুদ্ধ শেষ হবে। হবে না?"

আমি বললাম, "হবে। জয় বাংলা হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। জয় বাংলা হবে। তখন তুমি আমার বাসায় আসবে। আমার অনেক বড় বাসা, বাসার সামনে মাঠ। সেখানে শীতকালে আমরা কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলব। ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

মানুষটা বলল, "আমার বাসায় একটা লাইব্রেরি আছে সেখানে অনেক বই। তুমি বই পড় তো?"

আমি বই পড়ি না কিন্তু সেটা তো বলা যায় না, তাই বললাম, "হ্যাঁ। পড়ি।"

"গুড, তাহলে আমরা লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ব। তখন আমার রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা এলপি লাগিয়ে দেব। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়— তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনো তো?"

আলাউদ্দিন চাচা ছাড়া আর কারও গান আমি শুনি নাই কিন্তু আমি মাথা নেড়ে বললাম যে শুনি। মানুষটা তখন বলল, "তখন আমরা সবাই বসে গান শুনতে শুনতে গল্পের বই পড়ব। ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

তারপর মানুষটা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তার স্ত্রী আর ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটাকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে জয় বাংলা হবে তখন এই মানুষটাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব, মানুষটা বলে গেল না। আমিও মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলাম না। কিন্তু মানুষের কথাগুলো আমার মাথার মাঝে ঘুরঘুর করতে লাগল, আমি কল্পনা করতে লাগলাম একটা সুন্দর বাসার ভেতরে একটা বড় ঘর, দেয়ালে সারি সারি বই সেখানে হেলান দিয়ে বই পড়ছি, বই পড়তে পড়তে গান শুনছি। যতবার চিন্তা করি ততবার কেমন যেন ভেতরে একটা শান্তি শান্তি লাগে। কী আশ্চর্য।

আজকাল আমি রাত করে বাড়ি ফিরে আসি, নানি কিছু বলে না। আমার দিকে কেমন করে জানি তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা স্কুলে সবার সাথে কলাপাতা বিছিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ি এসে নানিকে বলি, "নানি আজকে খেতে হবে না। স্কুল থেকে খায়া আসছি।"

নানি জিজ্ঞেস করে "কী খাইছিস?"

আমি বলি, "ভাত আর ডাল।"

"আর কিছু না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নাহ্।"

"ডিমের সালুন রাঁধছি। খাবি আরেকটু?"

আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই। কী কারণ জানি না আজকাল খেতে খুবই ভালো লাগে, খালি খেতে ইচ্ছে করে, দিন-রাত রাক্ষসের মতো খাই। আমি একা না অন্যদেরও দেখি এই অবস্থা। সবাই শুধু খায়। নানি আমাকে ভাত বেড়ে দিল, আমি আবার রাক্ষসের মতো খেলাম, কে বলবে আমি একটু আগে খেয়ে এসেছি। খাওয়ার সময় নানি সব সময় আমার পাশে বসে সুবাইকে গালমন্দ করে, আজকে দেখি কিছু করল না, আমার পাশে বসে বসে আমাকে খেতে দেখল। মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে যুদ্ধ শুরু হবার পর হঠাৎ করে খিদে এত বেড়ে গেল কেন!

ভোরবেলা স্কুলে যাচ্ছি তখন ফালতু মতির সাথে দেখা হলো। মতি জানে আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, তার পরও জিজ্ঞেস করল, "কই যাস?"

"স্কুলে।" ঢাকা শহর থেকে প্রত্যেক দিন শত শত মানুষ আসছে, কাঁকনডুবি গ্রামের সবাই মিলে তাদেরকে স্কুলে খেতে দিচ্ছে, শুতে দিচ্ছে কিন্তু এর মাঝে মতিকে কোনো দিন দেখি নাই। তাই আমি জানি আমি স্কুলে যাচ্ছি শুনেই মতি নিশ্চয়ই তার ঠোঁটটা বাঁকা করে টিটকারি দিয়ে একটা বাজে কথা বলবে। আমি সেটা শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকলাম কিন্তু কী আশ্চর্য মতি টিটকারি দিয়ে কিছু বলল না। বরং গম্ভীর মুখে বলল, "গেরামের মানুষ খুবই ভালো একটা কাজ করতেছে। বিপদে পড়া মানুষদের সাহায্য করছে। খুবই সওয়াবের কাজ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যাবা মতি ভাই?"

মতি মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্। সব তো মালাউন, মালাউনদের খেদমত করে কী হবে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মালাউন?"

"হ্যাঁ। মালাউনরা কপালের সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা খুলে যাচ্ছে যেন বোঝা না যায়। মালাউনদের পিছলা বুদ্ধি!"

মতির কথা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম, হিন্দুরা কেন কপালের সিঁদুর মুছে ফেলবে? হাতের শাঁখা খুলবে? আমি কথা না বাড়িয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিলাম, তখন পেছন থেকে মতি বলল, "তা ছাড়া মালাউনদের সাহায্য করলে কোনো সওয়াব নাই। মুসলমানদের সাহায্য করলে সওয়াব আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনো কথা না বলে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। স্কুলে অনেক ভিড়। যারা গত রাতে এসেছে তাদের অনেকে আজকে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমরা তাদেরকে বড় সড়কে তুলে দিই। আমরা কাজে লেগে গেলাম। আমি দেখলাম, মতি আসলে ভুল কথা বলে নাই। বেশ কয়েকজন মহিলার কথা শুনে বোঝা যায় তারা হিন্দু কিন্তু তারা কপালের সিঁদুর মুছে ফেলেছে। হাতে শাঁখা নাই। কী আশ্চর্য। কারণটা কী, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মাসুদ ভাই খুবই ব্যস্ত, তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, তাই বিকালবেলা বলাই কাকুর চায়ের স্টলে বলাই কাকুকে জিজ্ঞেস করলাম। বলাই কাকু প্রশ্নটা শুনে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, "ইয়াহিয়া খান বলছে এই সব হচ্ছে ইন্ডিয়ার কারসাজি। মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার জন্য হিন্দুদের ষড়যন্ত্র।"

"তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। সেই জন্য মিলিটারির সবচেয়ে বেশি রাগ হিন্দুদের ওপর। হিন্দুদের ওপর আর আওয়ামী লীগের ওপর। পাকিস্তান মিলিটারি যেখানে আওয়ামী লীগ পাচ্ছে আর হিন্দু পাচ্ছে, সবাইকে মেরে ফেলছে। এই জন্য যারা হিন্দু তাদের কেউ কেউ নিজের পরিচয় গোপন রাখছে।"

"কিন্তু এইখানে তো পাকিস্তান মিলিটারি নাই, এইখানে ভয় কী?"

"এইখানে কোনো ভয় নাই। কিন্তু রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তাঘাটে কত রকম মানুষ আছে, তাদের কেউ যদি—"

আমি বললাম, "কিন্তু, কিন্তু—"

কিন্তু কী সেটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, "বলাই কাকু, বঙ্গবন্ধু সবাইকে ঠিকমতো অর্ডার দেয় না কেন?"

বলাই কাকু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বঙ্গবন্ধুকে মিলিটারিরা তো অ্যারেস্ট করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে।"

আমি চিৎকার করে বললাম, "না! নেয় নাই। আমি নিজে শুনেছি—"

বলাই কাকু মাথা নিচু করে তার ছোট ছোট চায়ের গ্লাসগুলো ধুতে ধুতে বলল, "সব পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। বিবিসি থেকে বলেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আবার বললাম, "কিন্তু, কিন্তু—" আমি আবার কিন্তু কী, সেটা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। হঠাৎ করে আমার মনটা এত খারাপ হলো যে বলার না। আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বলাই কাকুর মায়া হলো। তাই বলাই কাকু আমাকে বেশি করে দুধ-চিনি দিয়ে চা বানিয়ে দিল। সাথে একটা কুকি বিস্কুট। আজকাল খেতে আমার এত ভালো লাগে, যা কিছু পাই গপগপ করে খেয়ে ফেলি, তার পরও কুকি বিস্কুটটা চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে অনেকক্ষণ লেগে গেল।

লতিফা বুবুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, বাংলাঘরের পাশে লতিফা বুবু দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল, "এই, রঞ্জু!"

আমি এগিয়ে গেলাম। লতিফা বুবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর মুখ এত শুকনা কেন? কী হইছে?"

"বঙ্গবন্ধুরে পাঞ্জাবিরা অ্যারেস্ট করেছে।"

লতিফা বুবু কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। মনে হয় খবরটা লতিফা বুবু আগেই শুনেছে। আমি বললাম, "আমি ভাবছিলাম ঢাকা দখল হবে। এখন তো মনে হয় হবে না।"

লতিফা বুবু বলল, "দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কাজীবাড়ির বড় ছেলেটা অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তারে মেরে ফেলেছে।"

আমি মাত্র সেইদিন কাজীবাড়ি থেকে ফুল চুরি করেছি, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। খবর আসছে।"

কাজীবাড়ি আমাদের কাঁকনডুবি গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত পরিবার। এই বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই শিক্ষিত। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই বাড়ির যে বিড়ালটা আছে সেটাও মনে হয় অ আ ক খ পড়তে পারে। সবাই শিক্ষিত হওয়ার কারণে একটা সমস্যা, বাড়িতে কেউ থাকে না। দুই বুড়াবুড়ি বাবা-মা, দূর সম্পর্কের আত্মীয় একজন কাজের মানুষ, ঘরবাড়ি দেখার জন্য দুইজন বয়স্ক মহিলা ছাড়া আর কেউ নাই। সবাই ঢাকা-চিটাগাং-খুলনা থাকে। ছোট ছেলেটা নাকি জার্মানি চলে যাবে। মাঝে মাঝে কোনো ঈদে কাজীবাড়ির ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়িতে আসে। সবাই শিক্ষিত বড়লোক, তাদের ছেলেমেয়েরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিসটাস— তাই আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে না। নিজেরা নিজেরা থাকে আমরা দূর থেকে তাদের দেখি।

কাজীবাড়ির ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার কথা আমার খুব ভালো মনে আছে, ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো ফর্সা, মাথায় টাক, কালো চশমা, খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তার দুটি মেয়ে, ছোট মেয়েটা আমাদের বয়সী, বড়জন লতিফা বুবুর বয়সী। কিন্তু তারা খুবই অহংকারী। আমাদের সাথে কোনো দিন কথা হয় নাই। মিলিটারি এখন এই দুইজন অহংকারী মেয়ের বাবাকে মেরে ফেলেছে। তাদের এখন কী হবে? কোথায় থাকবে, কী করবে?

লতিফা বুবুও জানে না কী হবে। লতিফা বুবুর মা কাজীবাড়িতে গিয়েছিল, বুড়িমা নাকি একটু পরে পরে ফিট হচ্ছে। ছেলেকে মেরে ফেলার পর দুই মেয়ে নিয়ে ছেলের বউ কোথায় আছে কেউ জানে না।

লতিফা বুবু দেশের আরও কিছু খবর দিল, তাদের বাড়িতেও একটা রেডিও আছে, সেই রেডিওতে খবর শুনে জেনেছে। যশোর-কুষ্টিয়া-বগুড়া-খুলনা এইসব জেলায় পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে বাঙালিদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছে। প্রথমে মিলিটারিরা হেরে গিয়েছিল, তারপর পাকিস্তানিরা প্লেন দিয়ে বোমা ফেলেছে তখন বাঙালিরা আর টিকতে পারে নাই। এখন আস্তে আস্তে সারা দেশই মিলিটারি দখল করে ফেলছে।

শুনে আমার খুবই মন খারাপ হলো। একদিনে তিনটা খারাপ খবর, প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করার খবর, তারপর কাজী বাড়ির ইঞ্জিনিয়ার ছেলেকে মেরে ফেলার খবর, এখন সারা দেশ মিলিটারি দখল করে ফেলছে সেই খবর।

আমি খুবই মন খারাপ করে বাড়ি এলাম। কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রত্যেক দিন বাড়ি এসে আমি নানিকে সব খবর দিই। আজকেও দিলাম, কাজীবাড়ির বড় ছেলের খবরটা নানি আগেই পেয়ে গিয়েছিল— এই গ্রামের যেকোনো খবর নানি কীভাবে কীভাবে জানি সবার আগে পেয়ে যায়। তবে বঙ্গবন্ধুর অ্যারেস্টের খবর আর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি মিলিটারি সারা দেশ দখল করে ফেলার খবরটা নানি পায় নাই। খবরটা শুনেও নানির খুব একটা দুশ্চিন্তা হলো বলে মনে হলো না। আমি বললাম, "নানি, এটা খুবই দুশ্চিন্তার খবর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানি বলল, "যাদের দুশ্চিন্তা করার দরকার তারা দুশ্চিন্তা করুক। আমাগো এত দুশ্চিন্তার কী আছে?"

"পাকিস্তানি মিলিটারি যদি আসে তখন কী হবে?"

"পাকিস্তানি মিলিটারির আর কাম নাই তারা এই গেরামে আসবে! এইখানে এসে তারা কী করবে? কী আছে এই গেরামে?"

কথাটা সত্যি। আসলেই এই গ্রামে কিছুই নাই। কয়টা মানুষ, কয়টা গরু-ছাগল আর কী আছে?

নানি আমাকে ভাত বেড়ে দিল। বেগুন ভাজি, মাগুর মাছ আর ডাল। শেষে দুধ-ভাত। আমি খুবই তৃপ্তি করে খেলাম, নানি পাশে বসে বসে আমার খাওয়া দেখল, যেদিন থেকে আমার খিদে বেড়ে গেছে সেদিন থেকে নানি খুবই মনোযোগ দিয়ে আমার খাওয়া লক্ষ্য করে।

খেতে খেতে আমি নানিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা নানি তুমি একটা কথা বলতে পারবা?"

"কী কথা?"

"ধর্মের কথা।"

নানি বলল, "আমি কি ধর্মের কথা জানি? ধর্মের কথা জানে মুন্সি-মাওলানারা। তবু শুনি তোর কথা।"

আমি বললাম, "মতি বলে বিপদের সময় হিন্দু মানুষদের সাহায্য করলে কোনো সওয়াব হয় না। শুধুমাত্র মুসলমানদের সাহায্য করলে সওয়াব হয়। এই কথা কি সত্যি?"

নানি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই মইত্যা হারামজাদা হচ্ছে বেকুবের বেকুব! এইটা একটা কথা হলো? বিপদের কি হিন্দু-মুসলমান আছে? বিপদের সময় একটা কুত্তা-বিলাইকে সাহায্য করলেও আল্লাহপাক খুশি হন। আর হিন্দুরা হচ্ছে মানুষ।"

আমি বললাম, "আমিও তাই বলি।"

নানি বলল, "কেমন করে এই রকম কথা বলল মইত্যা হারামজাদা!" তারপর নানি মতিকে গালাগাল করতে লাগল। কী অসাধারণ সেই গালাগাল। শুনতেই ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.

এইবারে খুবই গরম পড়েছে। বৈশাখ মাস গরম পড়তেই পারে কিন্তু এই গরমটা কেমন জানি অন্য রকম। একটু বেলা না হতেই সূর্যটা চড় চড় করে মাথার ওপর উঠে কেমন যেন আগুন ছড়াতে থাকে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই, সারা গ্রাম কেমন যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে। গরু-ছাগলগুলো ছায়ার মাঝে নির্জীবের মতো বসে থাকে। আমাদের ছনের ঘর তার ভেতরেই আগুনের গরম, গ্রামের মাঝে যারা বড়লোক, টিনের ঘরে থাকে, তাদের কী অবস্থা কে জানে।

দুপুরের পরে যখন গরমটা একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন একদিন নানি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ইয়া মাবুদ।"

আমিও আকাশের দিকে তাকালাম, এক কোনায় এক চিলতে মেঘ। এটা দেখে ভয় পাওয়ার কী আছে? আর মেঘ থেকে যদি বৃষ্টি হয় সেটা তো খারাপ না, গরমটা একটু কমবে। আমি নানিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হইছে নানি?"

"ঈষান কোণে মেঘ। নিশানা ভালো না। ঝড় আসতাছে। কালবৈশাখী।"

শুনে আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল। আমাদের বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, বড় ঝড় হলে বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করতে লাগলাম যেন মেঘটা কেটে যায়। কিন্তু মেঘটা কেটে গেল না, দেখতে দেখতে সেটা একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কুচকুচে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, একটু আগেই যেখানে তীব্র রোদে চারদিক ঝলসে যাচ্ছিল সবকিছু এখন অন্ধকারে ঢেকে যেতে থাকে, মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানি উঠানে মরিচ শুকাতে দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো তুলে ফেলল। উঠানে দড়ির মাঝে কাপড় শুকাতে দিয়েছিল সেগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। মোরগ-মুরগিগুলো ভয় পাওয়া গলায় কঁক কঁক করে ডাকতে ডাকতে তাদের খোঁপের ভেতর ঢুকে যেতে লাগল। আমি বাইরে গরু-ছাগলের ডাক শুনতে পেলাম, মানুষ ছোটাছুটি করছে চিৎকার করে একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে।

আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে একটু পরে পরে বিজলি চমকাচ্ছে কিন্তু কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। মনে হচ্ছে সবকিছু বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভয়ংকর কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

প্রথমে একটু দমকা হাওয়ার মতো এল, শুকনো পাতা ধূলিবালি উড়িয়ে নিতে লাগল, তারপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বৃষ্টির ফোঁটা বাড়তে থাকে, তার সাথে সাথে প্রচণ্ড বাতাসে সবকিছু উড়িয়ে নেবার মতো অবস্থা হয়ে যায়। নানি চিৎকার করে বলল, "রঞ্জু, ঘরের ভেতরে আয়।"

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম, বাতাস আর বৃষ্টিতে তখন চারপাশ প্রায় লণ্ডভণ্ড হতে শুরু করেছে। গাছগুলো বাতাসের দমকে প্রায় নুয়ে পড়তে শুরু করেছে, গাছের ডালপালা আছড়ে পড়ছে। দেখে মনে হয় গাছগুলো বুঝি জীবন্ত প্রাণী, হাত-পা নেড়ে অনুনয়-বিনয় করে ঝড়ের হাত থেকে মুক্তি চাইছে।

আমাদের ছনের ঘর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, মনে হলো যেকোনো মুহূর্তে বুঝি বাতাসে উড়ে যাবে। আমরা মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম, অনেকে আজান দিতে শুরু করেছে। খোলা দরজা দিয়ে পানির ঝাপটা এসে আমাদের ভিজিয়ে দিতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে পড়তে লাগল। কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে টিনের ছাদ উড়ে গেল, আমরা তার বিকট শব্দ শুনতে পেলাম।

ঝড় বাড়তেই লাগল, আমার মনে হতে লাগল আমাদের বাড়িটা বুঝি উড়িয়েই নেবে, কিংবা চারপাশে বড় বড় গাছ, তার কোনো একটা হয়তো আমাদের বাড়ির ওপর ভেঙে পড়বে।

কতক্ষণ ঝড় হচ্ছিল জানি না, মনে হচ্ছিল কখনো বুঝি আর এই ঝড় থামবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড় কমে এল। এতক্ষণ ক্রমাগত বিজলি চমকে গেছে কিন্তু মেঘের ডাক শুনতে পাইনি। এখন হঠাৎ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকট শব্দে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে লাগলাম। নানি চিৎকার করে কিছু একটা বলল, মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের শব্দে নানির কথা শুনতে পারলাম না। আমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, "কী বলতেছ, নানি?"

নানি চিৎকার করে বলল, "আর ভয় নাই। মেঘ ডাকতাছে।"

"মেঘ ডাকলে কী হয়?"

"ঝড় কমে যায়।"

সত্যি সত্যি ঝড় কমে এল, কিন্তু বৃষ্টি থামল না। ঝরঝর করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হতেই লাগল। ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য আমি বৃষ্টির মাঝেই বের হয়ে গেলাম।

চারদিকে গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে। মাস্টারবাড়ির টিনের ছাদ উড়ে একটা বড় তেঁতুলগাছে ঝুলে আছে। বাড়ির লোকজন চিৎকার করে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমি হেঁটে হেঁটে হিন্দুপাড়ার দিকে এলাম, এখানে কয়েকটা বাড়ি পড়ে গেছে, একজন মহিলা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। আমি যখন চলে আসছিলাম তখন নীলিমাকে দেখলাম, ভিজে চুপসে হয়ে সে একটা বাছুরের গলা ধরে টেনে আনছে। আমাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। এমনিতে কখনো আমার সাথে কথা বলে না কিন্তু আজকে কথা বলল, "রঞ্জু।"

"হ্যাঁ।"

"তুমি এইখানে?"

"হ্যাঁ। ঝড়ে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দেখতে বের হয়েছি।"

"আমাদের গোয়ালঘরটা পড়ে গেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। ঐ দেখ—" নীলিমা হাত তুলে দেখাল। সত্যি একটা ছনের ঘর উবু হয়ে পড়ে আছে।

"গরুগুলি ঠিক আছে?"

নীলিমা মাথা নাড়ল, বলল, "বাবা সময়মতো গরুর দড়ি কেটে গরু ছেড়ে দিয়েছে।"

বড় ঝড় হলে গোয়ালঘরের গরু ছেড়ে দিতে হয়, তা না হলে ঘরে চাপা পড়ে গরু মরে যায়। মুসলমান বাড়িতে গরু মারা গেলে শুধু ক্ষতি হয়। হিন্দুবাড়িতে গরু মারা গেলে শুধু ক্ষতি হয় না, অনেক পাপ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন চলে আসছি তখন নীলিমা বলল, "রঞ্জু, আমি একটা কথা বলি, তুমি কাউরে বলবা না।"

আমি একটু অবাক হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী কথা?"

"আগে বলো কাউরে বলবা না। ভগবানের কিরা।"

"ঠিক আছে বলব না। কী কথা?"

নীলিমা নিচু গলায় বলল, "আমরা ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছি।"

"ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। এই দেশে হিন্দুরা আর থাকতে পারবে না।"

আগে হলে আমি বলতাম কেন থাকতে পারবে না? এখন আর বলি না, বলাই কাকু আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এই দেশে কেন হিন্দুরা থাকতে পারবে না। আমি কিছুক্ষণ নীলিমার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কেন জানি আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কবে যাবা?"

"এই তো কয়েক দিনের মাঝেই। বাবা সবকিছু বিক্রি করার চেষ্টা করছে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, "যখন জয় বাংলা হবে তখন আবার চলে আসবে না?"

"জয় বাংলা হবে?"

আমি বললাম, "একশ বার হবে।"

"তত দিনে মিলিটারি সবাইরে মেরে শেষ করে দেবে। আমার কাকু শহরে থাকে, তারে মেরে ফেলেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কাকুর মেয়ে, ষোল-সতেরো বছর বয়স তাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কে ধরে নিয়ে গেছে?"

"মিলিটারি।"

"কেন?"

নীলিমা কোনো কথা না বলে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন আমি একটা গাধা!

আমি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তখন নীলিমা বলল, "ঐ যে তুলসীগাছ দেখছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়লাম। নীলিমা বলল, "আমি যদি আর কোনো দিন না আসি তাহলে তুমি ঐ গাছের তলাটা খুঁড়বা।"

"কেন?"

"খুঁড়লেই বুঝতে পারবা।"

নীলিমা হাত দিয়ে তার চোখ মুছল, বৃষ্টির পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে, সেই বৃষ্টির পানি মুছল নাকি চোখের পানি মুছল, আমি বুঝতে পারলাম না।

সপ্তাহ খানেক পরে কোনো একদিন নীলিমা তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল। খবরটা পেলাম ফালতু মতির কাছে। লতিফা বুবুর বাসার সামনে তার সাথে দেখা হলো, মতি আমাকে থামাল, থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই, তোদের সাথে একটা মালাউনের বেটি পড়ে না?"

স্কুলের সাথে বহুদিন কোনো সম্পর্ক নাই, মতির কথাটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। যখন বুঝতে পারলাম তখন বললাম, "নীলিমা?"

মতি হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "নীলিমা ধলিমা জানি না। আছে না একজন?"

"হ্যাঁ। আছে।"

খুবই মজার একটা কাণ্ড ঘটেছে এ রকম একটা ভঙ্গি করে মতি বলল, "পুরা ফ্যামিলি ইন্ডিয়া ভেগে গেছে।"

আমি জানতাম নীলিমারা চলে যাবে, তাই ফালতু মতির কথা শুনে খুব অবাক হলাম না। আমি চুপ করে রইলাম। মতি বলল, "সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। এই গেরামে কোনো সমস্যা ছিল? ভেগে গেল কেন?"

আমি তখনও কিছু বললাম না। মতি বলল, "রাস্তাঘাটে কত বিপদ-আপদ, তার মাঝে পুরা ফ্যামিলি নিয়া ভেগে গেল, বিষয়টা কী?"

এবারে আমি উত্তর দিলাম, বললাম, "হিন্দুদের এখন খুব বিপদ। মিলিটারি আওয়ামী লীগ আর হিন্দু পেলেই মেরে ফেলে।"

"এইখানে মিলিটারি কই? আছে?"

"যদি আসে? তখন তো আর পালাতে পারবে না। এই জন্য মনে হয় আগেই চলে গেছে।"

ফালতু মতি তার পকেট থেকে একটা বক সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেখান থেকে একটা অর্ধেক সিগারেট বের করে সেটাতে আগুন দিয়ে লম্বা টান দিয়ে বলল, "আসল ব্যাপারটা কী জানস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম জানি না। ফালতু মতি বলল, "এই মালাউন হচ্ছে নিমকহারামের মতো। এই দেশে থাকে খায়-দায়-ঘুমায় কিন্তু তার আসল দেশ ইন্ডিয়া।" বলে হিন্দুদের একটা কুৎসিত গালি দিল।

আমি কোনো কথা বললাম না। ফালতু মতির সাথে কথা বলার কোনো অর্থ নেই। এই রকম ফালতু মানুষের কথা শুনলেই গা ঘিন ঘিন করে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে চলে আসছিলাম, মতি আমাকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "তোদের চ্যাংড়া মাস্টারের খবর কী?"

চ্যাংড়া মাস্টার মানে হচ্ছে মাসুদ ভাই। ফালতু মতি মাসুদ ভাইকে দেখতে পারে না তাই আমি বললাম, "ভালো।"

"চ্যাংড়া মাস্টার নাকি থানা লুট করছে?"

ফালতু মতির কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, বলে কী মতি! থানা লুট?

"গেরামের লোকজন নিয়া নাকি থানার সব রাইফেল লুট করে নিছে! হে নাকি মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করব?"

আমি এসব কিছুই জানি না, শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি?"

মতি তার অর্ধেক সিগারেটে যত্ন করে একটা টান দিয়ে বলল, "সত্যি-মিথ্যা জানি না। খবর পাইছি।" আমি তখন আর দেরি করলাম না, পাকা খবর নেওয়ার জন্য তখন তখনই বলাই কাকুর চায়ের স্টলের দিকে ছুটলাম। শুধু বলাই কাকুই আমাকে পাকা খবর দিতে পারবে। আমি অবশ্যি বেশি দূর যেতে পারলাম না, তার আগেই শুনতে পেলাম কে যেন চিকন গলায় ডাকছে, "রঞ্জু, এই রঞ্জু।"

তাকিয়ে দেখি লতিফা বুবু। আমি ঘুরে লতিফা বুবুর কাছে গেলাম, লতিফা বুবু বলল, "কী ব্যাপার রঞ্জু তোকে আজকাল দেখি না।"

"দেখবে না কেন, লতিফাবু? এই তো আমি।"

"গেরামের খবর কী?"

"ভালো না। আমাদের ক্লাসে পড়ত নীলিমা, মনে আছে?"

লতিফা বুবু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মনে আছে। শ্যামলা মতন ছোটখাটো মেয়েটা।"

"পুরা ফ্যামিলি ইন্ডিয়া চলে গেছে।"

লতিফা বুবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আহারে। নিজের দেশ বাড়িঘর ছেড়ে কে যেতে চায়? না জানি এখন কোথায় আছে, কেমন আছে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিছু বললাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। লতিফা বুবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষের কত কষ্ট। কাজীবাড়ির ছেলেটারে কীভাবে মেরে ফেলল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বউ-বাচ্চারা এখন কোথায় আছে জানো লতিফাবু?"

"না। কেউ জানে না। কোনো খোঁজখবর নাই। চাচাজি খোঁজ নিতে গেছেন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "চাচাজি এত বুড়া মানুষ কেমন করে খোঁজ নেবেন।"

লতিফা বুবু মাথা নাড়ল, বলল "জানি না। কিন্তু আর কে যাবে, জোয়ান মানুষ এখন রাস্তাঘাটে বের হয় না। জোয়ান মানুষ দেখলেই মিলিটারি গুল্লি করে দেয়। তাই শুধু বুড়ারা রাস্তাঘাটে বের হয়।"

কথাটা মনে হয় সত্যি। জোয়ান মানুষেরা থানা লুট করে সব রাইফেল নিয়ে যায় যুদ্ধ করার জন্য— তাদেরকে মিলিটারিরা তো ভয় পেতেই পারে। আমি মাসুদ ভাইয়ের কথা ভাবছিলাম আর ঠিক তখন লতিফা বুবু বলল, "তোদের স্যারের কাছ থেকে আমারে একটা বই এনে দিছিলি, বইটা শেষ হইছে। ফিরত নিয়া যাস।"

আমি বললাম, "পরে নেব লতিফা বুবু। এখন নিয়া লাভ নাই।"

"কেন লাভ নাই?"

"মাসুদ ভাই এখন অনেক ব্যস্ত। থানা লুট করে সব রাইফেল নিয়ে গেছে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করার জন্য।"

আমি ভেবেছিলাম খবরটা শুনে লতিফা বুবু বুঝি চমকে উঠবে, কিন্তু লতিফা বুবু মোটেও চমকাল না, বরং কেমন যেন খুশি হয়ে উঠল, বলল, "তোদের স্যার মুক্তিবাহিনী?"

মুক্তিবাহিনী কথাটা আগে শুনি নাই। এই প্রথম শুনলাম। মিলিটারির সাথে যারা যুদ্ধ করে তারা মুক্তিবাহিনী? লতিফা বুবু খুশি খুশি গলায় বলল, "রেডিওতে খবর দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকার তৈরি হইছে। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট। তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী। দেশ মুক্ত করার যুদ্ধ সেই জন্যে এই যুদ্ধের নাম মুক্তিযুদ্ধ। যারা যুদ্ধ করে তারা মুক্তিবাহিনী।"

"তুমি এত কিছু কেমন করে জানো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের বাড়িতে রেডিও আছে না। রাত্রিবেলা বিবিসি শুনি। সেইখানে সব খবর দেয়।"

"তুমি প্রত্যেক দিন খবর শোনো?"

"হ্যাঁ। তুই শুনবি? শুনলে চলে আসবি। বিবিসির খবর পাকা খবর।"

লতিফা বুবুর বাসা থেকে আমি বলাই কাকুর চায়ের স্টলে গেলাম। সেখানে অনেক মানুষজন, সবাই খুব উত্তেজিত। উত্তেজনার কারণ মাসুদ ভাইয়ের থানা লুট। মানুষজন দুই ভাগে ভাগ হয়ে তর্ক করছে। এক ভাগের ধারণা কাজটা 'সঠিক' হয়েছে, অন্য ভাগের ধারণা কাজটা ভুল হয়েছে। যারা মনে করছে কাজটা 'সঠিক' হয়েছে তাদের একজন বলল, "মাসুদ পোলাটা হচ্ছে বাঘের বাচ্চা। দেশে যুদ্ধ শুরু হইছে এখন কি বইসা বইসা আঙুল চুষব? থানা লুট কইরা অস্ত্রপাতি লইয়া গেছে। উচিত কাজ করছে।"

যারা মনে করে কাজটা সঠিক হয়েছে তারা সবাই মাথা নাড়ল। যারা মনে করে কাজটা 'বেঠিক' হয়েছে তাদের একজন বলল, "যুদ্ধ কি গোল্লাছুট খেলা? যুদ্ধ করার জন্য ট্রেনিং লাগে না? এই পোলাপানের ট্রেনিং আছে?"

"ট্রেনিং নাই তো ট্রেনিং করব। সমিস্যা কী?"

"থানাওয়ালাদের অস্ত্রপাতির হিসাব রাখতি হয়— একজন আইসা সেই অস্ত্রপাতি লুট করে নিতে পারে? থানাওয়ালা এখন কার কাছে কী হিসাব দেবে?"

টেবিলে থাবা দিয়ে একজন বলল, "দেশের নূতন সরকার হইছে সেই সরকারের কাছে হিসাব দেবে।"

ঠিক-বেঠিক এই দুই দলের মাঝামাঝি একজন বলল, "কিন্তু এখন এই অস্ত্র দিয়া করবটা কী?"

"বড় সড়ক দিয়া মিলিটারি আনাগোনা করে তাদের আক্রমণ করব শুনছি।"

"কামটা কি সহজ?"

"এখন কি সহজ আর কঠিন দেখার সময় আছে? নাই। যুদ্ধ শুরু হইছে এখন যুদ্ধ করতে হবে। বাঁচনের আর কুনো উপায় নাই।"

তর্ক যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ আমি বহুদূর থেকে ভেসে আসা গুম গুম একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম— মেঘের ডাকের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজ কিন্তু আকাশে কোনো মেঘ নাই। অন্য কেউ তখনো কিছু শুনতে পায় নাই, সবাই তর্ক করে যাচ্ছে। আমি ছুটে বাইরে এলাম, তখন আরো স্পষ্ট শব্দটা শুনতে পেলাম গুমগুম আওয়াজের সাথে সাথে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাকে ছুটে বের হতে দেখে আরো কয়েকজন চায়ের স্টল থেকে বের হয়ে এল এবং সবাই তখন বহুদূর থেকে ভেসে আসা গুম গুম শব্দ তার সাথে সাথে গুলির শব্দ শুনতে পেল।

একজন বলল, "ইয়া মাবুদ। যুদ্ধ শুরু হইছে মনে লয়।"

কেউ কোনো কথা বলল না, সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা বহুদূর থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসতে শুনতে লাগলাম। মাঝে মাঝে গুম গুম শব্দ হয় তারপর টানা গুলির শব্দ হতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য শব্দ কমে আসে তারপর আবার গুলির শব্দ হতে থাকে।

একটু পর আমরা দেখলাম বহুদূর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া আকাশে উঠছে। কোথায় আগুন লেগেছে কে জানে।

ঠিক কোথায় কী হয়েছে কেউ জানে না, তাই সারা দিন ধরে হাজারো রকমের গুজব ভেসে আসতে থাকল। সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য গুজবটা এ রকম, বড় সড়কটা দিয়ে মিলিটারিরা আনাগোনা করে। মাসুদ ভাইয়েরা থানা লুট করে রাইফেল নিয়ে সেই সড়কের দুই পাশে অপেক্ষা করছিল। মিলিটারির কয়েকটা গাড়ি যখন সেই সড়ক ধরে যাচ্ছে তখন মাসুদ ভাইয়ের দল তাদের আক্রমণ করেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে— দুই পক্ষের কতজন মারা গেছে কেউ জানে না। কেউ কেউ বলছে শত শত মিলিটারি মারা গেছে, মাসুদ ভাই তার দল নিয়ে সরে গেছে। কেউ কেউ বলছে মিলিটারির পাল্টা আক্রমণে মাসুদ ভাইয়ের দলের সবাই মরে গেছে। মিলিটারি তখন সড়কের দুই ধারে সব গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আমার পেটের ভেতরে কেমন যেন পাক দিতে লাগল। আমি বিড়বিড় করে বলতে লাগলাম, "হেই খোদা। তোমার কসম লাগে, তুমি মাসুদ ভাইরে বাঁচায়ে রাখো। মাসুদ ভাইয়ের দলের সবাইরে বাঁচায়ে রাখো। হেই খোদা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.

দুই-তিন দিন পরে আমরা খবর পেলাম মাসুদ ভাই বেঁচে আছে, তবে তার দলের দুইজন ছেলে মারা গেছে। ছেলে দুইজন আমাদের গ্রামের না, তাই আমরা তাদের চিনতে পারলাম না। একজনের নাম আলতাফ, আরেকজন জসীম। একজন কলেজে পড়ে, আরেকজন মানুষের বাড়ি কামলা খাটে। কলেজের ছাত্র আলতাফ গুলি খেয়েছিল তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জসীম গুলি খেয়েছে। খবরগুলো সবই লোকজনের মুখে শোনা— সত্য-মিথ্যা জানি না।

সপ্তাহ খানেক পরে আমাদের সাথে প্রথমবার মাসুদ ভাইয়ের দেখা হলো। এই দেখাটা হলো একেবারে অন্য রকম। বিকালবেলা আমি আর মামুন কালী গাংয়ের তীর ধরে হাঁটছি তখন হঠাৎ দেখলাম দূর থেকে অনেকগুলো মানুষ লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। তাদের সবার হাতে বন্দুক, মানুষগুলোর কোনো পোশাক নেই, বেশির ভাগই লুঙি-গেঞ্জি পরে আছে। বেশির ভাগ খালি পা, একজন-দুইজন মাথায় গামছা বেঁধে রেখেছে। আমরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম আর তখন দেখলাম এই দলটার মাঝে মাসুদ ভাইও আছে। মাসুদ ভাইয়ের হাতেও একটা রাইফেল।

আমি আর মামুন দৌড়ে গিয়ে মাসুদ ভাইয়ের হাত ধরে ফেললাম, চিৎকার করে বললাম, "মাসুদ ভাই।"

মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে একটু হাসার চেষ্টা করল, হাসিটা কেমন যেন অন্য রকম মনে হলো, এই হাসিতে কোনো আনন্দ নাই। মাসুদ ভাই এই কয় দিনে অনেক শুকিয়ে গেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখগুলো কেমন যেন গর্তে ঢুকে গেছে কিন্তু সেই গর্তের ভেতর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন যেন ধিকধিক করে জ্বলছে। মাসুদ ভাইয়ের কাপড়-জামা নোংরা, চুলগুলো উশকু-খুশকো।

আমি বললাম, "মাসুদ ভাই আপনি কেমন আছেন?"

মাসুদ ভাই হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ভালো।"

"আপনি মুক্তিবাহিনী?"

মাসুদ ভাই বলল, "আমরা সবাই মুক্তিবাহিনী।"

আমি অন্যদের দিকে তাকালাম, বেশির ভাগকেই চিনি না। আমাদের গ্রামের দুই-তিনজন আছে। আবু বকর চাচা তার মাঝে একজন। আবু বকর চাচা শান্তশিষ্ট মানুষ, শহরে তার একটা মনোহারী দোকান আছে। সেই আবু বকর চাচা হাতে একটা রাইফেল নিয়ে হাঁটছেন— দেখতে কী অবাক লাগছে!

আমি মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "কই যান এখন?"

মাসুদ ভাই বলল, "এই তো এই দিকে।" উত্তরটা শুনে বুঝতে পারলাম মাসুদ ভাই কোথায় যাচ্ছে, বলতে চাচ্ছে না।

আমি তাই আর জানতে চাইলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "মাসুদ ভাই, আপনারা মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে যুদ্ধ করেছেন মাসুদ ভাই।"

মাসুদ ভাই অন্যমনস্কভাবে বলল, "এই তো", তার মানে এইটাও বলতে চাইছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মাসুদ ভাই, আপনার দলে দুইজন নাকি মারা গেছে? সত্যি?"

মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। আমি একটু অবাক হয়ে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাসুদ ভাই কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। আগে একজন হাসিখুশি মানুষ ছিল, কত কথা বলত। এখন গম্ভীর, কথা বলতেই চায় না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বলাই কাকুর চায়ের স্টলের সামনে চলে এসেছি তখন স্টলের ভেতর থেকে অনেকে বের হয়ে এল। আশপাশের থেকেও মানুষেরা ভিড় করে এল। এমনকি বেড়ার ফাঁক দিয়েও অনেক মহিলা উঁকি দিয়ে তাকিয়ে রইল।

বলাই কাকু বললেন, "মাসুদ ভাই। আসেন। একটু চা খান, কী হচ্ছে বলে যান।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই বলল, "না বলাই দা। সময় নাই। আমাদের যেতে হবে।"

"কোথায় যাবেন?"

আমার সাথে যেভাবে বলেছিল, ঠিক সেভাবে মাসুদ ভাই বলল, "এই তো এদিকে।"

"একটু বসে যান। এক কাপ চা খেতে আর কতক্ষণ লাগবে।"

মাসুদ ভাই বলল, "সময়টা ভালো না বলাই দা। সময়টা খুব খারাপ। আমাদের চা খাওয়ালে আপনার বিপদ হতে পারে।"

বলাই দা অবাক হয়ে বললেন, "কিসের বিপদ?"

"সব জায়গায় মিলিটারি আসবে। মিলিটারির কাছে খবর দেওয়ার লোক সব জায়গাতে আছে। এখন ঘাপটি মেরে আছে, এরা বের হবে।"

"এটা আপনি কী বলেন?"

"আমি ভুল বলি নাই। সাবধান থাকা ভালো।"

বলাই কাকু বলল, "ঠিক আছে আপনি চা না খেতে চান খাবেন না। কিন্তু একটু বসেন, একটু কথা বলি।"

মাসুদ ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "এখন না। এখন কথা বলার সময় না।"

"যুদ্ধটা কেমন হলো একটু শুনি। কয়টা পাঞ্জাবিরে মারছেন?"

মাসুদ ভাইয়ের মুখটা কেমন জানি শক্ত হয়ে গেল। বলল, "না বলাই দা। মানুষ মারার গল্প করতে চাই না। এই গল্প ভালো না।"

মাসুদ ভাইয়ের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যার জন্য কেউ আর কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই তার রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। তার পিছু পিছু অন্য সবাই। সবাই লাইন ধরে সড়কটা ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, কী অদ্ভুত লাগছে দেখতে। আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, তারপর দৌড়ে মাসুদ ভাইয়ের কাছে গেলাম, বললাম, "মাসুদ ভাই, আমি আপনার সাথে একটু হাঁটি।"

মাসুদ ভাই মাথা নেড়ে নিষেধ করতে গিয়ে থেমে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"এমনি।"

মাসুদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবল, তারপর বলল, "ঠিক আছে একটু হাঁটো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মাসুদ ভাইয়ের পাশাপাশি হাঁটলাম, তারপর বললাম, "মাসুদ ভাই, আপনি লতিফা বুবুকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন মনে আছে?"

মাসুদ ভাই বলল, "হ্যাঁ। মনে আছে। কী হয়েছে সেই বইয়ের?"

"লতিফা বুবুর বই পড়া শেষ হয়েছে। আমাকে বলেছে আপনাকে ফেরত দিতে।"

মাসুদ ভাই হেসে ফেলল, এই প্রথমবার সেই আগের মতো হাসল, হেসে বলল, "তোমার লতিফা বুবুকে বলো বইটা রেখে দিতে। এই বই আমি আর নিতে পারব না।"

"ঠিক আছে।" বলে আমি আরও কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলাম, তারপর বললাম, "মাসুদ ভাই, আমাদের ক্লাসে নীলিমা নামে একটা মেয়ে ছিল মনে আছে?"

"হ্যাঁ। মনে আছে, কী হয়েছে তার?"

"পুরো ফ্যামিলি ইন্ডিয়া চলে গেছে।"

মাসুদ ভাই কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। একটু পরে বলল, "ঠিকই করেছে। এখন ভালোয় ভালোয় বর্ডার পার হতে পারলে হয়।"

AMARBOI.COM

আমি বললাম, "কাজীবাড়ি চিনেন মাসুদ ভাই?"

"না, চিনি না। কী হয়েছে কাজীবাড়ির?"

"কাজীবাড়ির বড় ছেলে বড় ইঞ্জিনিয়ার। চিটাগাং থাকত। পাকিস্তান মিলিটারি তারে মেরে ফেলছে।"

মাসুদ ভাই বলল, "আহা রে!"

"ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বউ আর দুই মেয়ে কোথায় আছে কেউ জানে না!"

মাসুদ ভাই আবার বলল, "আহা রে!"

"ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাবা বুড়া মানুষ কাজী দাদা। তাদের খুঁজতে গিয়েছিল এখন তারও খোঁজ নাই।"

আমি ভাবছিলাম মাসুদ ভাই আবার বলবে, আহা রে। কিন্তু মাসুদ ভাই কিছু বলল না, এবারে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা, কাজী দাদির অবস্থা খুবই খারাপ। শুধু ফিট হয়।"

মাসুদ ভাই বলল, "এই পাকিস্তানিরা মানুষ না। এরা জানোয়ার। পুরা দেশটাকে তছনছ করে দিয়েছে।"

আমি আরও কিছুক্ষণ হাঁটলাম, তারপর যে কথাটা বলার জন্য মাসুদ ভাইয়ের সাথে সাথে এতক্ষণ হাঁটছি সেটা বলার চেষ্টা করলাম। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, "মাসুদ ভাই, আপনারে একটা কথা বলি?"

"কী কথা।"

"আমারে আপনাদের সাথে নিবেন?"

মাসুদ ভাই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল, আমি ভাবলাম মাসুদ ভাই বুঝি শব্দ করে হেসে উঠবে, ছোট বাচ্চাদের অর্থহীন কথা শুনে বড়রা যেভাবে হাসে ঠিক সেভাবে। কিন্তু মাসুদ ভাই হাসল না। বলল, "কেন?"

"আমি মুক্তিবাহিনী হতে চাই।"

"এই দেশে সবাই মুক্তিবাহিনী। তুমিও মুক্তিবাহিনী।"

"আমি আপনাদের মতো মুক্তিবাহিনী হতে চাই।"

"আমাদের মতো?"

"হ্যাঁ। আমারে আপনাদের সাথে নেন। খোদার কসম আমি আপনাদের কোনো সমস্যা করব না। আপনাদের সাহায্য করব। মনে নাই স্কুলে যখন হাজার হাজার মানুষ আসছিল, আমরা সাহায্য করছিলাম? আপনাদের সাথে সাথে থাকব। যখন যুদ্ধ করবেন আমি পেছন থেকে আপনাদের জন্য গুলি এনে দেব। যদি চান রাইফেলটা দিয়ে আমিও গুলি করতে পারি—"

আমি আসলে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। কোনো কথা বলতে হলে উল্টাপাল্টা করে ফেলি। কিন্তু এইবার আমি একটুও উল্টাপাল্টা করলাম না, খুবই গুছিয়ে বললাম, অনেকক্ষণ ধরে বললাম। মাসুদ ভাই পুরো সময়টা আমার কথা শুনল, তারপরে কনুইয়ের কাছে আমার হাতটা ধরল। হাত ধরে সবাইকে বলল, "এই! তোমরা একটু থামো, দুই মিনিট বিশ্রাম নাও। আমি রঞ্জুর সাথে একটু কথা বলি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা একটা ধানক্ষেত পার হয়ে জঙ্গলের কাছে এসেছি। সবাই ধানক্ষেতের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে গেল। মাসুদ ভাই আমার সামনে বসল। বসে, আমার মাথায় হাত রাখল। বলল, "রঞ্জু, যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। কত খারাপ সেইটা আমি আগে বুঝিনি, এখন বুঝেছি। গত সপ্তাহেই আমার বয়স ছিল বাইশ। এখন আমার বয়স কত জান? এখন আমার বয়স একশ বাইশ। এক সপ্তাহে আমার বয়স কেন একশ বছর বেড়েছে জানো?"

আমি কিছু বললাম না। মাসুদ ভাই বলল, "তার কারণ এই সপ্তাহে আমি প্রথম যুদ্ধ করেছি। কিছু তো জানতাম না। ভাবছিলাম যুদ্ধ করা খুব সোজা। রাইফেলে কেমন করে গুলি ভরতে হয়, কেমন করে ট্রিগার টানতে হয়— গুলি করতে হয় ভাবছিলাম এইগুলো জানলেই যুদ্ধ করা যায়। আমি পুরা আহাম্মক ছিলাম। বড় রাস্তায় আমি ছেলেপিলেদের নিয়ে রাইফেল হাতে শুয়ে থাকলাম। মিলিটারির একটা জিপ আসছিল, কাছাকাছি আসতেই সবাই মিলে গুলি শুরু করলাম। আমরা ভাবলাম এইটাই যুদ্ধ। আমাদের খুবই কপাল ভালো রাস্তার ঐখানে একটা ব্রিজ ছিল, ড্রাইভারের শরীরে গুলি লেগেছে, ড্রাইভার কন্ট্রোল করতে না পেরে সবাইকে নিয়ে ব্রিজ থেকে নিচে খালের মাঝে পড়ে গেছে। আমরা ভাবলাম যুদ্ধে জিতে গেছি— জয় বাংলা জয় বাংলা চিৎকার করতে করতে যাচ্ছি। তখন—"

মাসুদ ভাই থামল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তখন?"

"তখন প্রথমে জিপ থেকে কয়টা মিলিটারি বের হয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে শুরু করল। মেশিনগান কী জানো?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি না।"

"রাইফেলে ট্রিগার টানলে একটা গুলি বের হয়। মেশিনগানে ট্রিগার টানলে বৃষ্টির মতো গুলি বের হতে থাকে। আমি ভেবেছিলাম গুলি করে আমাদের সবাইকে ফেলে দিয়েছে। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়েছি— আর মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি যাচ্ছে। অনেক কষ্টে পিছিয়ে আসছি, দেখলাম আমাদের সাথে আলতাফ নাই। আলতাফ মাঠের মাঝখানে পড়ে কাতরাচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাইয়ের গলা ভেঙে এল, শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছল। আশপাশে বসে সবাই মাসুদ ভাইয়ের কথা শুনছিল, সবাই তখন মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। মাসুদ ভাই একটু পরে বলল, "আমরা ভাবছিলাম আলতাফকে ঐখানে রেখেই আমাদের চলে যেতে হবে। তখন জসীম বলল সে গিয়ে আলতাফকে টেনে নিয়ে আসবে। আমরা যেন খালি তার ওপর দিয়ে গুলি করতে থাকি। আমরা তা-ই করতে থাকলাম, জসীম গিয়ে আলতাফকে ধরে টেনে আনতে থাকে। যখন একেবারে আমাদের কাছে চলে এসেছে তখন— তখন—"

মাসুদ ভাই আবার থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তখন জসীম গুলি খেল। আমরা তখন একজনের জায়গায় দুজনের লাশ টেনে নিয়া এসেছি। একটা ধানক্ষেতের পাশে জানাজা পড়িয়ে কবর দিয়েছি। মিলিটারি তখন সড়কের পাশে দুই গ্রামে আগুন দিয়েছে— যারে পেয়েছে তারে মেরেছে। বুঝেছ রঞ্জু?"

আমি গল্পটা শুনলাম কিন্তু বুঝতে হবে সেটা বুঝিনি, তাই মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাসুদ ভাই বলল, "আমার কথা শুনে যুদ্ধ করতে গিয়ে দুইজন মারা গেছে। আমি নিজের হাতে তাদের কবর দিয়েছি। বুঝেছ?"

AMARBOI.COM

আমি মাথা নাড়লাম। মাসুদ ভাই বলল, "আমি কি কোনো দিন এই জন্য নিজেরে ক্ষমা করতে পারব? পারব না। আমার জন্য দুইজন মারা গেছে। দুইজন।"

ক্ষেতের পাশে পা দুলিয়ে যারা বসেছিল তাদের একজন বলল, "কী বলেন মাসুদ ভাই আপনার জন্য কেন মারা যাবে? সবাই গেছে নিজের মতো। হায়াত শেষ হয়েছে আল্লাহ নিয়ে গেছে।"

মাসুদ ভাই তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথাটা বলছ, আমি জানি। যাই হোক— রঞ্জু তুমি বাচ্চা মানুষ তোমাকে কেন আমি এই সব বলছি, জানি না। তোমাকে খালি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে যুদ্ধটা খুবই ভয়ংকর একটা জিনিস! তোমার উপরে চাপায়ে দিলে তোমার সেটা করতে হয় কিন্তু কোনো দিন নিজের থেকে সেটা শুরু করতে হয় না। বুঝেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সবকিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝলাম মাসুদ ভাই আমাকে মুক্তিবাহিনীতে নেবে না। আমার চোখে কেন জানি পানি চলে আসল।

মাসুদ ভাই আমার চোখের পানিটা দেখল কি না, বুঝতে পারলাম না। আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "যাও বাড়ি যাও। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তোমার বাবা-মা চিন্তা করবেন।"

আমি নিচু গলায় বললাম, "আমার বাবা-মা নাই। খালি একজন নানি আছেন।"

"তাহলে তোমার নানি চিন্তা করবেন। যাও, বাড়ি যাও।"

আমি যখন বাড়ি ফিরে এসেছি তখন অনেক রাত হয়েছে। নানি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে দেখে বুকে চেপে ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিল, তারপরে বলল, "ভাইডি তুই আসছস?"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ, নানি আসছি?"

"আমার মনে হচ্ছিল—"

"কী মনে হচ্ছিল?"

"মনে হচ্ছিল তুই বুঝি মুক্তিবাহিনীর সাথে চলে গেছস।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "তুমি যে কী বলো নানি। আমি তোমাকে একলা রেখে মুক্তিবাহিনীর সাথে চলে যাব? আর মুক্তিবাহিনী আমারে নেবে?"

নানি মাথা নাড়ল, বলল, "এখন আর কোনো কিছুর ঠিক নাই। সবকিছু ওল্টাপাল্টা হয়া গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০.

দুপুরবেলা খেতে বসেছি তখন মামুন এসে আমাকে খবর দিল, কাজীবাড়ির ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বউ আর দুই মেয়েকে নিয়ে তার বাবা বুড়ো কাজী দাদা এই মাত্র বাড়ি পৌঁছেছেন।

ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি তখন তখনই যেতে চাচ্ছিলাম, নানি তখন আমাকে জোর করে বসিয়ে থালার সব ভাত শেষ করাল। আমি তখন হাত ধুয়ে মামুনকে নিয়ে কাজীবাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বাড়ির বাইরে গ্রামের কয়েকজন মুরব্বি ধরনের মানুষ বসে আছে, পুরুষ মানুষ বলে ভেতরে যেতে পারছে না। আমি আর মামুন সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেলাম। উঠানে একটা জলচৌকিতে একজন মহিলা বসে আছেন, নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী। গ্রাম সম্পর্কে— আমাদের চাচি। তাঁকে ঘিরে গ্রামের অনেক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা, কাজী দাদি ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাবা কাজী দাদা কীভাবে তাঁর ছেলের বউ-বাচ্চাদের উদ্ধার করে এনেছেন সেটা সবাইকে বলছেন, সবাই সেটা খুব মন দিয়ে শুনছে।

আমি এদিক-সেদিক তাকিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দুই মেয়েকে খুঁজলাম। আগের বার দেখেছিলাম খুবই অহংকারী ছিল, আমাদের সাথে কথাই বলত না। এখন তারা কি আমাদের সাথে কথা বলবে? যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের তো এখানেই থাকতে হবে। যুদ্ধ শেষ হবার পরও তারা কোথায় যাবে? মেয়ে দুটিকে দেখতে পেলাম না, মনে হয় ভেতরে আছে।

একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই সাহেবরে পাঞ্জাবিরা কেমন করে মারল?"

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী, যিনি গ্রাম সম্পর্কে আমাদের চাচি শক্ত গলায় বললেন, "আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কয়েকজন তখন মাথা নেড়ে বলল, "না না, এই সব নিয়ে কেন কথা বলবে? এই সব নিয়ে কথা বলতে কি ভালো লাগে?"

তখন আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "লাশকে কি দাফন-কাফন করা গেছে?"

চাচি এবারেও বললেন, "আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

আবার কয়েকজন তখন মাথা নেড়ে বলল, "কেন বলবে? এইটা কি বলার মতো কথা?"

আমাদের গ্রামের পুরুষ মানুষদের যে রকম বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশি না, গ্রামের মহিলাদেরও একই অবস্থা। তাদেরও বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। আরেকজন মহিলা জিজ্ঞেস করে বসল, "সাহেবকে তো মেরে ফেলেছে, এখন সংসার চলবে কেমন করে?"

চাচি এবার বেশ জোরে বললেন, "আমি বলেছি এখন আমি এসব নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

যেসব মহিলা ছিল তারা এবারে গুনগুন করে নিজেরা নিজেরা কথা বলতে লাগল, তারপর একজন-দুইজন করে সরতে লাগল। আমি শুনলাম যাওয়ার সময় একজন কুটনি বুড়ি ধরনের মহিলা আরেকজন কুটনি বুড়ি ধরনের মহিলাকে নিচু গলায় বলছে, "এত তেজ ভালো না। মাইয়া লোকের তেজ আল্লাহ্‌র গজব টেনে আনে।"

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মা এতক্ষণ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিলেন, এবারে কান্না থামিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বউমা অনেক কষ্ট করে এসেছে, দুই দিন ধরে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বউমারে আপনারা বিশ্রাম করতে দেন।"

কথার অর্থ খুবই পরিষ্কার, তোমরা সবাই বিদায় হও। কাজেই আমরাও বিদায় হলাম, মামুন তার বাড়িতে চলে গেল। আমি বলাই কাকুর চায়ের স্টলের দিকে রওনা দিলাম। নূতন কী কী খবর আছে, সেটা বলাই কাকুর চায়ের স্টলে সবচেয়ে আগে পাওয়া যায়।

বিকেলে যখন ফিরে আসছি তখন কাজীবাড়ির সামনে আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম। বাড়ির সামনে যে ফুলের বাগান আছে, একুশে ফেব্রুয়ারির সময় যেখান থেকে আমি ফুল চুরি করার চেষ্টা করছিলাম, সেখানে মেয়েটা হাঁটছে। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে ফুলগাছের ভেতর কিছু একটা দেখছে। অপরিচিত মেয়েদের সাথে আমরা কথা বলি না, কেমন করে কথা বলতে হয় সেটাও জানি না। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের কোনা দিয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে আমি হেঁটে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে যেতে আমি থমকে দাঁড়ালাম, স্পষ্ট দেখতে পেলাম মেয়েটার পায়ের গোড়ালির আধ হাত উপরে একটা জোঁক ধরেছে। নিশ্চয়ই বেশ খানিকক্ষণ আগেই ধরেছে কারণ রক্ত খেয়ে জোঁকটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। জোঁকের থেকে ধুরন্ধর আর কিছু নাই; যখন কাউকে কামড়ে ধরে সে টের পর্যন্ত পায় না। কোনো রকম ব্যথা না দিয়ে এক পেট রক্ত খেয়ে চলে যায়।

আমি দাঁড়ালাম, মেয়েটাকে বলা দরকার যে তাকে একটা জোঁকে ধরেছে, কিন্তু লতিফা বুবু জোঁককে যে রকম ভয় পায়, এই মেয়েটাও যদি সে রকম ভয় পায় তাহলে বিপদ আছে। জোঁক ধরেছে বলামাত্রই সে এমন লাফঝাঁপ চিৎকার দিতে থাকবে যে তখন জোঁকটা টেনে ছোটানোই অসম্ভব হয়ে যাবে। শহরের মেয়ে নিশ্চয়ই জীবনেও জোঁক দেখে নাই, এখন যদি জানে তার শরীরে একটা জোঁক নিশ্চিন্তে রক্ত খেয়ে যাচ্ছে তাহলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার তাই আমি থেমে গিয়ে মেয়েটাকে ডাকলাম, "এই যে। শোনো।"

মেয়েটা ঘুরে আমার দিকে তাকাল, বলল, "আমাকে বলছ?"

"হ্যাঁ।"

অহংকারী মেয়েরা যেভাবে ভুরু কুঁচকায়, মেয়েটা সেভাবে ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"আমাদের গ্রাম দেশে গাছপালায় অনেক জোঁক থাকে।"

মেয়েটা একটা ফুলগাছের কাছে ছিল সেখান থেকে ছিটকে সরে এল, মুখের মাঝে জোঁকের প্রতি ভয় আর ঘৃণার ভাবটা ফুটে উঠল, সে কারণে অহংকারের ভাবটা কমে গেল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে জোঁককে ভয় পায়, এখন যদি বলি তাকে জোঁকে ধরেছে তাহলে কেলেংকারি ঘটতে পারে। একটু কায়দা করে বলতে হবে।

আমি বললাম, "জোঁককে ভয়ের কিছু নাই। একটু লবণ না হলে তামাকের পানি দিলেই জোঁক শেষ। বারোটা বেজে যায়।"

মেয়েটা কিছু বলল না। আমি বললাম, "তুমি কি জোঁককে ভয় পাও?"

"না। জোঁককে ভয় পাওয়ার কী আছে?"

"তাহলে ভালো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে ভালো মানে কী?"

আমি বললাম, "আমি জোঁককে একটুও ভয় পাই না। কাউকে জোঁকে ধরলে আমি টেনে ছুটিয়ে দিই।"

মেয়েটা একটু অন্যভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, মনে হয় টের পেয়েছে আমি কী বলতে যাচ্ছি। নিজের পায়ের দিকে তাকাল কিন্তু জোঁকটা পায়ের পেছনে ধরেছে তাই দেখতে পেল না।

আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমি বললাম, "তুমি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ ঠিক সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকো! এক সেকেন্ড।"

মেয়েটা একটা চিৎকার করল, "কেন? কী হয়েছে?"

"কিছু হয় নাই।" বলে আমি লাফ দিয়ে তার পেছনে গেলাম, এক হাতে শক্ত করে পায়ের গোড়ালিটা ধরে অন্য হাত দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে জোঁকটাকে টেনে ছোটানোর চেষ্টা করলাম। প্রথমবার পিছলে ছুটে গেল, দ্বিতীয়বারে সেটা ছুটে এল। মেয়েটা তখন চিলের মতো চিৎকার করছে, মনে হচ্ছে তাকে বুঝি কেউ খুন করে ফেলেছে। আমি জোঁকটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললাম, অনেকখানি রক্ত খেয়েছে জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেল! মেয়েটার চিৎকার শুনে প্রথমে বাড়ির কুকুর, তারপর বড় বোন, তারপর অন্যরা ছুটে এল। এদের মাঝে বাড়ির কুকুরটা সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে এসেই বুঝে ফেলল কী হয়েছে, থেতলে পিষে যাওয়া জোঁকটা শুঁকে মুখ তুলে অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করল, ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু অন্যরা চিৎকার করতে লাগল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

আমি বললাম , "কিছু না। জোঁক ধরেছিল। ছুটিয়ে দিয়েছি।"

সবাই এমনভাবে চিৎকার করতে লাগল যে মনে হতে লাগল মেয়েটাকে জোঁক না, একটা আস্ত বাঘ ধরে ফেলেছিল।

মেয়েটা নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় প্রায় বমি করে দিচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হলো পারলে সে তার পুরো পাটা কেটে ফেলে দেবে। জোঁক ধরলে সেই জায়গায় রক্ত সহজে বন্ধ হয় না, তাই মেয়েটার পা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বের হতে লাগল।

মেয়েটার মা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "ডাক্তার। একজন ডাক্তার পাওয়া যাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনে আমার হাসি পেল, কিন্তু আমি হাসলাম না, বললাম "ডাক্তার লাগবে না। ভালো করে ধুয়ে একটু তেনা পুড়িয়ে লাগিয়ে দেন।"

মেয়েটা বলল, "তেনা পুড়িয়ে? তেনা পুড়িয়ে কেন?"

বড় মেয়েটা বলল, "ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য।"

ছোট মেয়েটা বলল, "না, আমি তেনা পোড়া লাগাব না।"

আমি বললাম, "তাহলে কিছুই করতে হবে না, একটু পরে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

মেয়েটা বলল, "তুমি কেমন করে জানো? তুমি কি ডাক্তার নাকি?"

আমি দাঁত বের করে হাসলাম, বললাম, "না, আমি ডাক্তার না। কিন্তু আমারে অনেকবার অনেক জোঁক ধরেছে, আমি জানি।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে মেয়েটা মুখ বিকৃত করে কেমন জানি শিউরে উঠল। বাড়ির সবাই মিলে তখন মেয়েটাকে ভেতরে নিয়ে যেতে থাকে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হতে থাকে সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে— এ রকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নাই, ভবিষ্যতেও ঘটবে না। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বাড়ি চলে এলাম, নানিকে বলতে হবে, নানি নিশ্চয়ই শুনে হাসতে হাসতে মারা যাবে।

পরের দিন আবার আমার মেয়েটার সাথে দেখা হলো। কাজীবাড়ির বাংলাঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কেমন যেন দুঃখী দুঃখী চেহারা। দেখে মনে হয় কিছু একটা ভাবছে। আমার মনে হলো মেয়েটার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার, সড়কে দাঁড়িয়ে বললাম, "তোমার পায়ের কী অবস্থা?"

মেয়েটা আমাকে দেখে চিনতে পারল, বলল, "এসে দেখে যাও। খুবই ঘেন্নার অবস্থা— কালকে অনেকক্ষণ রক্ত পড়েছে।"

আমি বাংলাঘরের বারান্দায় উঠে গিয়ে তার পাটা পরীক্ষা করলাম। কালকে যেখানে জোঁক ধরেছিল, আজকে সেখানে ছোট লাল একটা দাগ— এর মাঝে ঘেন্নার কী আছে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটা বলল, "তুমি এই গ্রামে থাকো।"

আমি মাথা নাড়লাম। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা কী করেন?"

আমি বললাম, "বাবা নাই। মরে গেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা মনে হলো একটু ধাক্কা খেল, তারপর বলল, "তোমার মা?"

"মাও নাই। দুইজনে একসাথে পানিতে ডুবে মরে গেছেন।"

এইবারে মেয়েটার মুখে দুঃখের ছাপ পড়ল, বলল, "ও।"

"আমি খুব ছোট ছিলাম বাপ-মা কাউরে দেখি নাই। কিছু মনে নাই।"

মেয়েটা বলল, "আমার আব্বুকে মিলিটারি মেরে ফেলেছে।"

আমি বললাম, "জানি। আমরা সবাই জানি।"

মেয়েটা হঠাৎ করে কাঁদতে শুরু করল, আমি একেবারে হকচকিয়ে গেলাম, কী করব বুঝতে পারলাম না।

মেয়েটা ঠোঁট কামড়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কান্না থামাতে পারে না। অনেকক্ষণ পর কান্না থামিয়ে বলল, "এত দিন রাস্তাঘাটে ছিলাম, মানুষের বাড়িতে ছিলাম, বিপদের মাঝে ছিলাম তাই আব্বুর জন্য কাঁদতেও পারি নাই। এইখানে এসে সারা দিন আর রাত খালি কাঁদি।"

আমি কী করব কিংবা কী বলব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, তাই চুপচাপ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার বাবার কথা বলতে থাকে। বাবাকে মেরে ফেলার বিষয়টা একেবারেই মেনে নিতে পারছে না, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার মনে হচ্ছিল সান্ত্বনা দিয়ে আমার কিছু বলা দরকার কিন্তু বলার মতো একটা কথাও মাথার মাঝে আনতে পারলাম না। তাই একটা কথাও বলতে পারলাম না, কিন্তু তাতে খুব একটা সমস্যা হলো না, মেয়েটা একাই কথা বলে যেতে লাগল, আমি শুনে যেতে লাগলাম। মনে হয় মেয়েটা কথা বলার জন্য একটা মানুষ খুঁজছিল, আমাকে পেয়ে গেছে। মনে হয় খুব দুঃখের সময় মানুষের কথা বলার জন্য একটা লোকের দরকার হয়।

আমি একটা কথাও না বলে অনেকক্ষণ মেয়েটার কথা শুনেছি বলেই মনে হয় মেয়েটার সাথে আমার খাতির হয়ে গেল। তার নাম ডোরা। ডোরা মানুষের নাম হতে পারে আমি জানতামই না। তার বড় বোনের নাম নোরা। বড় বোন কলেজে পড়ে, সে আমার সাথে পড়ে। তবে ডোরা আমার মতন ফাঁকিবাজ ছাত্র না, সে খুবই ভালো ছাত্রী। ডোরার সাথে প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হতে লাগল, আর প্রত্যেক দিনই সে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে যেত আর আমি শুনে যেতাম। প্রথম প্রথম তার বাবাকে মিলিটারিরা কীভাবে মেরেছে সেটা নিয়ে একেবারেই কথা বলতে চাইত না, শেষে আস্তে আস্তে বলেছে। বাবা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিল, মিলিটারিরা এসে তাকে ডেকে নিয়েছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই চালু করার জন্য। চালু করার পর সবাইকে দাঁড়া করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। পুরো একদিন ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিল্ডিংয়ের দেয়ালের পাশে বাবার লাশটা পড়ে ছিল, তারপর কয়েকজন মিলে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে লাশটা তাদের বাসার সামনে রেখে গেছে। এরপর ডোরা আর কিছু বলতে পারে না, তারপর কী হয়েছে সে নাকি মনেও করতে পারে না। লাশের ওপর কয়টা মাছি ভনভন করছিল, এছাড়া নাকি তার আর কিছু মনে নাই। শুনে আমার খুবই অবাক লাগে কিন্তু আমি সেটা নিয়ে ডোরাকে কিছু বলি না।

একদিন ডোরা বলল, "বুঝেছ রঞ্জু। আমাকে একটা কাজ করতে হবে। করতেই হবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী কাজ?"

"আমাকে নিজের হাতে একটা পাকিস্তানি মিলিটারি মারতে হবে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী মারতে হবে?"

"পাকিস্তানি মিলিটারি।"

"কীভাবে মারবে?"

"মুক্তিবাহিনী হয়ে।"

"মুক্তিবাহিনী?"

ডোরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

আমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ডোরার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ডোরা বলল, "তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন? মেয়েরা মুক্তিবাহিনী হতে পারে না?"

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বললাম, "পারে নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু তুমি তো অনেক ছোট। ছোটদের মুক্তিবাহিনী নেয় না। আমি যেতে চেয়েছিলাম মাসুদ ভাই নেয় নাই।"

ডোরা জিজ্ঞেস করল, "মাসুদ ভাই কে?"

আমি তখন ডোরাকে মাসুদ ভাইয়ের গল্প করলাম। মাসুদ ভাইয়ের যুদ্ধের গল্পটা করলাম খুবই বাড়িয়ে-চাড়িয়ে। শত শত মিলিটারি মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে, হেলিকপ্টারে করে সেই মিলিটারিদের লাশ নিতে হয়েছে, এই ভাবে বর্ণনা দিলাম। মাসুদ ভাইয়ের সাহস নিয়ে আজব-আজব অনেকগুলো গল্প বললাম। শুনে ডোরা খুবই উৎসাহিত হলো, বলল, "চলো, তুমি আর আমি মাসুদ ভাইকে খোঁজ করি। দুইজন মিলে বললে না করতে পারবে না, আমাদের নিয়ে নেবে।"

"নেবে না।" আমি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললাম, "মাসুদ ভাই খালি বলে যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস, যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। যুদ্ধ বড়দের জিনিস ছোটদের যুদ্ধে যাওয়া ঠিক না।"

ডোরা হাল ছাড়ে না, বলে, "আমরা দুইজনে খুঁজে খুঁজে তাদেরকে বের করে হাজির হব, তখন আমাদেরকে আর ফেলে দিতে পারবে না। পারবে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "দশ-বিশ বছর যুদ্ধ হবে। তত দিনে আমরা বড় হয়ে যাব। তখন কেউ না করতে পারবে না।"

ডোরা এত দিন অপেক্ষা করতে রাজি না। সে এখনই মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি মারতে চায়, এখনই— তার দেরি করার কোনো ইচ্ছা নাই।

নানি ছাড়া আমি এর আগে কোনো মেয়েকে কাছ থেকে দেখি নাই। নানি যথেষ্ট ভয়ংকর কিন্তু আমার মনে হতে থাকে ডোরা বুঝি নানি থেকেও ভয়ংকর। কিংবা কে জানে হয়তো সব মেয়েরাই এই রকম ভয়ংকর হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.

আমাদের গ্রামের অনেক মেয়ের সাথেই ডোরার পরিচয় হলো, শহরের একটা মেয়ে যার বাবাকে পাকিস্তানের মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে তার সাথে অনেক মেয়েই বন্ধুত্ব করতে চাইছিল কিন্তু ডোরার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হলো আমার সাথে। তার কারণটা কী কে জানে! আমার কাজ হয়ে গেল সকাল বেলা ডোরাকে নিয়ে বের হয়ে গ্রামের সবকিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রথমে তাকে নিয়ে গেলাম বলাই কাকুর চায়ের স্টলে, ডোরাকে আগেই বলে রেখেছিলাম বলাই কাকুর চায়ের স্টলে মানুষজন কম থাকলে আমাদের হাফ কাপ ফ্রি চা বানিয়ে খাওয়ান। আজকে স্টলে অনেক মানুষ ছিল, তার পরও বলাই কাকু ডোরার খাতিরে আমাদের দুইজনকে ফ্রি চা খাওয়ালেন, সাথে কুকি বিস্কুট। বলাই কাকু আর অন্যরাও ডোরাকে নানান কিছু জিজ্ঞেস করল, ডোরা হুঁ হাঁ করে উত্তর দিল, তার হয়ে কথাবার্তা যা বলার আমিই বললাম।

স্টল থেকে বের হয়ে স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "তোমাকে বলেছিলাম না বলাই কাকুর চা পৃথিবীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ! দেখেছ এখন?"

ডোরা বলল, "সর্বশ্রেষ্ঠ না কচু। এক গাদা চিনি আর দুধ। এটা চা হলো? এটা তো পায়েস!"

ডোরার কথা শুনে আমি রীতিমতো আঘাত পেলাম— কিন্তু বুঝতে পারলাম না পায়েসের মতো চা হলে কেন সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।

স্কুলে গিয়ে সে আমাদের শহীদ মিনারটা দেখেও হি হি করে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল, বলল, "এইটা শহীদ মিনার! এইটা তো বাঁশের খাম্বা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে আমার একটু অপমান হলো কিন্তু কী বলব বুঝতে পারলাম না। তবে স্কুলটা তার পছন্দ হলো, বড় দালান, সামনে বিশাল মাঠ, পাশে পুকুর, পেছনে বড় বড় গাছ। আমি তাকে আমাদের ক্লাস রুমে নিয়ে গেলাম, এখন স্কুলে ক্লাস হচ্ছে না কিন্তু শুনছি কয় দিনের মাঝে ক্লাস শুরু হবে, তখন ডোরাকে মনে হয় এই স্কুলে আমাদের ক্লাসেই ভর্তি হতে হবে।

কালী গাংটাও তার খুব পছন্দ হলো, এখন পানি কম। আমি তাকে বললাম বর্ষা শুরু হলেই নদীটা ফুলে-ফেঁপে বিশাল নদী হয়ে যাবে।

কালী গাংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ডোরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি সাঁতার জানো?"

"জানব না কেন? আমি সাঁতরে এই গাং পার হই।"

ডোরা চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি। খোদার কসম।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি সাঁতার জান?"

ডোরা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

আমি বললাম, "কোনো সমস্যা নাই, আমি তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব।"

ডোরা মনে হয় সেটা শুনে বেশ খুশিই হলো।

বড় সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা গ্রামের একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়ে তাকে বিশাল ধানক্ষেত দেখালাম। দূরের জঙ্গলটা দেখিয়ে বললাম, "ঐ যে দূরের জঙ্গলটা দেখছ, এটার কোনো শেষ নাই।"

"শেষ নাই মানে?"

"শেষ নাই মানে এই জঙ্গলটার অন্য পাশে কী আছে কেউ জানে না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। মাসুদ ভাইয়ের দল যুদ্ধ শেষ করে হেঁটে হেঁটে এই জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ডোরা কিছুক্ষণ রহস্যময় জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই জঙ্গলে কী কী আছে?"

"অনেক ভেতরে নাকি একটা পুরনো রাজবাড়ি আছে, এখন সেখানে কেউ যেতে পারে না। ভেঙেচুরে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোরা আবার চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

"এই জঙ্গলে কি বাঘ আছে?"

আমি কখনো বাঘ বের হতে শুনি নাই কিন্তু অনেক বাঘডাঁশ বের হয়েছে। বাঘ আর বাঘডাঁশে পার্থক্য কী? তাই বললাম, "নিশ্চয়ই আছে। আগে অনেক বেশি ছিল এখন কমে গেছে। বন্যার সময় নদীতে বাঘ ভেসে আসত, সব গরু-ছাগল খেয়ে ফেলত।"

"এখন আসে না?"

আমি কোনো দিন বাঘ আসতে দেখিনি, তার পরেও বললাম, "মাঝে মাঝে আসে।"

ডোরা শুনে যথেষ্ট চমৎকৃত হলো। সড়ক ধরে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে আমি তাকে গাছগাছালি চিনালাম। ধুতরাগাছ মারাত্মক বিষ, এর ফল খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। শুনে সে খুবই অবাক হলো। অনেকক্ষণ সে দেখতে একেবারে নিরীহ ধুতরাগাছ আর ধুতরা ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে চুতরাগাছ আর বানরশলা গাছ চিনিয়ে দিলাম, শরীরে লাগলে সারা শরীর চুলকাতে থাকে, শুনে সে অবাক হয়ে চুতরাগাছ আর বানরশলার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে ভেদাল পাতা দেখালাম, এমনিতে কিছু নেই কিন্তু একটু কচলে দিলেই বিকট দুর্গন্ধ বের হতে দেখে সে খুবই মজা পেল।

আমি গ্রামের ভেতর এসে তাকে হিন্দুপাড়া নিয়ে গেলাম। আমাদের দেখে থুরথুরে বুড়ি একজন জিজ্ঞেস করল, "কেডা?"

"আমি রঞ্জু।"

"রঞ্জু কেডা? সাথে কে?"

"সাথে কাজীবাড়ির নাতনি।"

"যার বাপরে পাঞ্জাবিরা মারছে?"

"হ্যাঁ।"

বুড়ি হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "হায় ভগবান! এইটা তোমার কী বিচার?"

আমি ডোরাকে নিয়ে নীলিমাদের বাড়ির সামনে এলাম, বাড়িতে তালা মারা। গলা নামিয়ে বললাম, "এই বাড়িতে নীলিমারা থাকত।"

"নীলিমা কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের ক্লাসে পড়ত একটা মেয়ে।"

"এখন কোথায়?"

"ইন্ডিয়া চলে গেছে।"

নীলিমারা ইন্ডিয়া চলে গেছে শুনে ডোরা বেশি অবাক হলো না। সব হিন্দুরাই এখন ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। আমি বাড়ির সামনে তুলসীগাছটা দেখিয়ে বললাম, "এইটা হচ্ছে তুলসীগাছ। এইখানে হিন্দুরা পূজা দেয়। একদিন আমায় এই গাছটার নিচে খুঁড়তে হবে।"

"কেন?"

"নীলিমা এইখানে একটা জিনিস পুঁতে রেখেছে। আমাকে বলেছে সে যদি না আসে তাহলে এটা খুঁড়ে বের করতে।"

"নীলিমারা আসবে না?"

"যুদ্ধ শেষ না হলে কেমন করে আসবে? যুদ্ধ শেষ হতে দশ-বারো বছর লাগবে। মাসুদ ভাই বলেছে।"

একদিন ডোরাকে আমার বাড়িতে নিতে হলো। ডোরারা বড়লোকের পরিবার, শহরে থাকে, তারা কত কী দেখে অভ্যস্ত, আমার বাড়িতে ভাঙাচোরা ছনের ঘর, পুরনো কাঁথা-বালিশ, ধানের মটকা এসব দেখে কী মনে করবে সেটা চিন্তা করে আমার লজ্জা লাগছিল। আমি ডোরাকে আনতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু সে আসবেই— আমার নানিকে দেখবেই— তাই তাকে একদিন বাড়িতে আনতে হলো। নানিকে নিয়েও ভয়, ডোরার সামনে ক্যাট ক্যাট করে কাকে গালাগাল শুরু করে দেবে কে জানে! সেটা নিয়েও আমি একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম— কিন্তু দেখা গেল ভয়ের কিছু নাই।

নানি ডোরাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল, তার শুকনো কাঠি কাঠি আঙুল দিয়ে ডোরার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "বোনডি, তুমি এত বড় হইছ? তোমার বাপরে আমি এই এতটুকুন দেখছি, খালি অসুখ হইত! তারপরে কত বড় ইঞ্জিনিয়ার হইল। আমরা সবাই কত খুশি—"

তারপর নানি হঠাৎ করে থেমে গিয়ে ডোরার মাথায় হাত রেখে বলল, "বোনডি, তুমি মন খারাপ কইরো না। কাল রাত্রেই আমি তোমার বাপরে স্বপ্ন দেখছি, কী সুন্দর রাজপুত্রের মতন চেহারা, কী সুন্দর পোশাক, আমারে বলতেছে, চাচি আমার বউ-বাচ্চা আপনাদের গ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। দেইখা রাখবেন। আমি বলছি তুমি কোনো চিন্তা কইরো না বাবা, আমি দেইখা রাখমু। আর আজকেই তুমি আমার সাথে দেখা করতে আসছ।"

ডোরা চোখ মুছে বলল, "আমি কোনো দিন আব্বুকে স্বপ্ন দেখি না।"

"তোমার বাপের বেহেস্ত নসিব হইছে এই জন্য দেখো না। তোমার বাপের যদি অশান্তি থাকত তা হইলে প্রত্যেক রাত্রে তোমাদের সাথে কথা বলতে আসত। বুঝছ?"

ডোরা মাথা নাড়ল। নানি বলল, "হায়াত-মউত আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র কী ইচ্ছা আমরা জানি না, সেই জন্য মনে দুঃখ রাইখো না।"

নানি অনেকক্ষণ ডোরার সাথে কথা বলল, তারপর তাকে উঠানের মাঝখানে একটা জলচৌকিতে বসিয়ে তাকে মুড়ি-গুড় আর গাছের আতাফল খেতে দিল।

ডোরা নানিকে কথা দিল সময় পেলেই সে নানির সাথে কথা বলতে চলে আসবে। নানি তখন ডোরার কাছে আমার সম্পর্কে অনেক রকম নালিশ করে দিল, আমি সময়মতো বাড়িতে আসি না, বাড়িতে থাকি না, লেখাপড়া করি না— এই রকম কথাবার্তা। তখন আমি তাড়াতাড়ি ডোরাকে নিয়ে বের হয়ে চলে এলাম, একবার নানি এটা শুরু করলে সহজে থামবে না।

নানি ছাড়াও ডোরাকে একদিন আমি লতিফা বুবুর কাছে নিয়ে গেলাম। লতিফা বুবু খুব আগ্রহ নিয়ে ডোরাকে দেখল, তার চুল হাত দিয়ে পরীক্ষা করল, জামাটা দেখল, পায়ের জুতো দেখল, তারপর দেশের অবস্থা নিয়ে গল্প করল। লতিফা বুবু প্রত্যেক দিন রাত্রে রেডিওতে খবর শোনে, তাই আমাদেরকে অনেক খবর দিল। বলল, "আগে বিবিসি শুনতে হতো, আকাশবাণী শুনতে হতো এখন আর ওইগুলো শুনতে হয় না।"

"কেন?"

"ওমা! তোরা জানিস না? এখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়েছে। সব খবর পাওয়া যায়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সব ভালো ভালো খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের খবর। যুদ্ধের খবর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

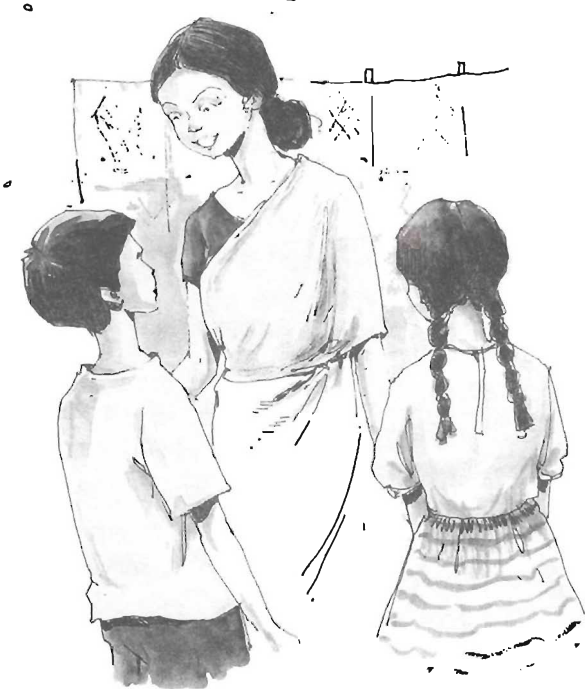

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের মাসুদ ভাইয়ের খবর কি দিয়েছে?"

"না, এখনো দেয় নাই।" লতিফা বুবু ডোরার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঐ দিন তোমার বাবার কথা বলেছে।"

ডোরা জিজ্ঞেস করল, "কী বলেছে?"

লতিফা বুবু ডোরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ঐ তো, কেমন করে মিলিটারিরা তাকে মেরেছে, এই সব।"

ডোরা বলল, "ও।" তারপর চুপ করে গেল।

ডোরার সাথে একদিন মামুনের দেখা করিয়ে দিলাম। মামুন আমাদের মাঝে সবচেয়ে চালু কিন্তু দেখা গেল ডোরার সামনে এসে সে একেবারে চুপ মেরে গেল। সে সোজাসুজি ডোরার দিকে তাকাতেই পারল না, ডানে-বামে তাকাতে লাগল, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তার নাকের মাঝে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমা হতে লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বলল, "তোমাকে জোঁকে ধরেছিল?"

ডোরা বলল, "হ্যাঁ। আমার পায়ে একটা জোঁক ধরেছিল। রঞ্জু টেনে ছুটিয়েছে! ছিঃ। ঘেন্না।"

মামুন বলল, "আমাকেও একদিন জোঁক ধরেছিল।"

ডোরা বলল, "সত্যি? কোথায়?"

মামুন লজ্জায় লাল নীল বেগুনি হয়ে বলল, "এই তো ওইখানে—"

যে জায়গায় জোঁক ধরেছিল সেটা সবার সামনে বলার মতো না, মোটামুটি একটা লজ্জাজনক ঘটনা, তাহলে তুই গাধা এখন এই গল্পটা শুরু করলি কেন?

আমি জানি মামুনের কোনো কাজ নাই কিন্তু হঠাৎ করে সে ভান করল তার অনেক কাজ তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

যে মানুষটার সাথে ডোরার দেখা না হলে কোনো ক্ষতি ছিল না একদিন তার সাথেও দেখা হয়ে গেল, মানুষটা হচ্ছে ফালতু মতি। আমি ডোরাকে নিয়ে লতিফা বুবুর বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, তখন দেখলাম উল্টো দিক দিয়ে মতি আসছে। আমি ডোরাকে বললাম, "ডোরা, দেখছ, সামনে দিয়ে একটা লোক আসতাছে?"

"হ্যাঁ দেখেছি। কী হয়েছে?"

"এই মানুষটা হচ্ছে ফালতু মতি।"

"ফালতু মতি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। দশ গ্রামের মাঝে সবচেয়ে ফালতু মানুষ। তোমার সাথে যদি উল্টাপাল্টা কথা বলে উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নাই।"

"উল্টাপাল্টা কথা কেন বলবে?"

"মানুষটা ফালতু সেই জন্য।"

ততক্ষণে ফালতু মতি আমাদের কাছে চলে এসেছে, এমন ভান করল যেন ডোরাকে দেখেই নাই, শুধু আমাকে দেখেছে! আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "রঞ্জু নাকি, কই যাস?"

"এই তো।" আমিও ফালতু মতির কথার উত্তর দিই তার মতো করে।

"দেশের কোনো খোঁজখবর রাখস?"

"কোন খোঁজখবর?"

"এই তো মালাউনদের খবর?"

"না, রাখি না।"

"সদরে কী হইছে জানস?"

"না, জানি না।"

"মালাউনের পুরা গুষ্টি এখন মুসলমান হইয়া গেছে।" মতি হা হা করে হাসল, তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সেখান থেকে একটা পুরো সিগারেট মুখে দিল। খুব কায়দা করে সেটা ধরিয়ে বলল, "মালাউনদের বড় ব্যবসা গঞ্জে। ইন্ডিয়া ভাগলে তো পুরা ব্যবসা লুট হইয়া যাইব, তাই কোনো ঝামেলায় যায় নাই। গরুর গোশত খাইয়া কলমা পইড়া মুসলমান।" মতি আবার হা হা করে দুলে দুলে হাসতে লাগল, আগে লক্ষ্য করি নাই মতির মাড়ির রং কালো, যখন হাসে তখন মাড়ি বের হয়ে তাকে দেখতে খাটাশের মতো লাগে।

"মালাউনদের ফিচলা বুদ্ধি দেখছস? নিরঞ্জন সাহার নাম এখন আব্দুল জব্বার! মাথার মাঝে টুপি, থুতনির মাঝে ছাগল দাড়ি। বউদের কপালে সিঁন্দুর নাই, হাতে শাঁখা নাই। গুষ্টির পর গুষ্টি এখন মুসলমান! খালি খতনাটা এখনো বাকি আছে।" বলে আবার খাটাশের মতো হাসতে থাকে।

আমি ডোরাকে বললাম, "চল ডোরা আমরা যাই।"

মতি মনে হলো এই প্রথম ডোরাকে দেখতে পেল। সে রকম ভান করে বলল, "এই মাইয়া কার মাইয়া? আগে দেখি নাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একবার ভাবলাম তার কথার উত্তর না দিয়ে হেঁটে চলে যাই কিন্তু শেষে উত্তর দিলাম, বললাম, "কাজীবাড়ির নাতনি।"

"ও! বুঝছি! তোমার বাপরেই গুল্লি করছে না?"

ডোরা কোনো উত্তর না দিয়ে মতির দিকে তাকিয়ে রইল। মতি একটু থতমত খেয়ে জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, "ইশ রে! তোমার বাপ এই গ্রামের বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিল, এইভাবে মারা গেল, খুবই দুঃখের কথা। দাফন-কাফন নাকি ঠিক করে হয় নাই?"

আমি বললাম, "মতি ভাই, এখন যাই।"

তারপর ডোরাকে রীতিমতো হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম। আমার খালি মনে হচ্ছিল ডোরা হঠাৎ বিড়ালের মতো লাফ দিয়ে মতির মুখে খামচি মেরে দেবে।

যখন আমরা চলে আসছি, তখন মতি পেছন থেকে বলল, "তোদের চ্যাংড়া মাস্টার কই গেল? আজকাল দেখি না। সে মালাউনদের সাথে ইন্ডিয়া ভাইগা গেল নাকি?"

আমি কিছু বললাম না। মতি বলল, "এখন ভাইগা থাকাই নিরাপদ। দিনকাল ভালো না।" একটু থেমে বলল, "কাঁকনডুবি মনে হয় আর আগের কাঁকনডুবি থাকব না।"

মতি এই কথাটা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে সেটা এক সপ্তাহের ভেতরে আমরা টের পেলাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.

অনেক দিন থেকে নানি ঘ্যান ঘ্যান করছে যে বাদলা শুরু হওয়ার আগে আমি যেন কিছু লাকড়ি কুড়িয়ে আনি। বাড়ির পেছনে বিশাল জংলা জায়গা, সেখানে হাজার রকম গাছ, লতাপাতা। একদিন সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করলেই অনেক শুকনো কাঠ হয়ে যায়। আমি সেখান থেকে টেনে টেনে অনেকগুলো শুকনো গাছ উঠানে এনেছি, এখন কুড়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করলেই নানি তার বাদলা দিন পার করে ফেলতে পারবে।

আমি মাত্র টুকরো করতে শুরু করেছি তখন মামুন ছুটতে ছুটতে হাজির হলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মিলিটারি আসতেছে।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "মিলিটারি?"

মামুন মাথা নাড়ল। তার মুখ ফ্যাকাসে, চোখে আতঙ্ক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কোনখানে আছে?"

"বড় সড়কে।"

"কই যাইব?"

"জানি না, মনে হয় এই দিকেই আসতেছে।"

আমি কুড়ালটা রেখে নানিকে বললাম, "নানি, আমি গেলাম।"

"কই গেলি?"

"মিলিটারি দেখতে। মিলিটারি আসতেছে।"

নানি চোখ কপালে তুলে বলল, "মিলিটারি আসতেছে আর তুই তাদের দেখতে যাইতাছস? মিলিটারি কি একটা দেখনের জিনিস? খবরদার—"

নানি চিৎকার করতে লাগল আর আমি তার মাঝে মামুনকে নিয়ে বের হয়ে গেলাম। গ্রামের সড়কটা ধরে ছুটতে ছুটতে গ্রামের কিনারায় ধানক্ষেতের কাছে দাঁড়ালাম। বহু দূরে বড় সড়কটা গঞ্জের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে। সেই সড়কে আবছা আবছা একটা মিলিটারির দলকে দেখা গেল। তারা এদিকে আসছে। পেছনে কয়েকটা বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, সেখানে মনে হয় আগুন দিয়েছে।

আরো অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, শুকনো মুখে দূরে তাকিয়ে আছে। একজন জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে যায়?"

আরেকজন উত্তর দিল, "মনে তো হয় এদিকেই আসতেছে।"

"এদিকে কেন? আমাগো গেরামে কী আছে?"

"যেখানে আওয়ামী লীগ, যেখানে হিন্দু, যেখানে মুক্তিবাহিনী, সেখানেই মিলিটারি।"

"আওয়ামী লীগ কি শরীলে লেখা থাকে? ভোটের সময় তো সবাই শেখ সাহেবের নৌকায় ভোট দিল। তাহলে তো পুরা দেশই আওয়ামী লীগ।"

আমরা লক্ষ্য করি নাই, কখন জানি ফালতু মতি এসে দাঁড়িয়েছে, সে বলল, "বিপদ ডেকে আনলে এই রকমই হয়।"

"কিসের বিপদ?"

"আরে এই চ্যাংড়া মাস্টার দুই-চারটা ফুটুসফাটুস করল মনে নাই? চ্যাংড়া মাস্টার এই গেরামে থাকতেছে না?"

"তারে ধরতে আসতেছে?"

"কবে কেডা? খবর কী আর যায় নাই?"

ঠিক তখন দূরে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। পরপর বেশ কয়েকটা গুলি হলো। বয়স্ক একজন হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "ইয়া মাবুদ! কারে জানি মারল!"

মতি বলল, "গেরামটারে রক্ষা করা দরকার।"

"কেমনে রক্ষা করবা?"

"দেখি বাপজানরে জিজ্ঞেস করি।" তখন আমার মনে পড়ল ফালতু মতির বাবা লতিফুর রহমান মুসলিম লীগ করে। আগে চেয়ারম্যান ছিল, তাই গ্রামের মানুষ তাকে লতিফ চেয়ারম্যান ডাকে। মতির অবশ্যি তার বাবার কাছে যাওয়ার দরকার হলো না, দেখলাম লতিফ চেয়ারম্যান নিজেই আসছে। এই গরমের মাঝে একটা কালো আচকান পরেছে, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ। তার সাথে আরো কয়েকজন মুরব্বি, তারাও সেজেগুজে আছে, মাথায় টুপি, চোখে সুরমা। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো তাদের একজনের হাতে লম্বা বাঁশ, সেই বাঁশের আগায় পাকিস্তানের পতাকা। কয়দিন আগে সারা দেশে যত পাকিস্তানের পতাকা ছিল দেশের মানুষ সব পা দিয়ে মাড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছে, লতিফ চেয়ারম্যান যে তার পাকিস্তানের পতাকাটা বাঁচিয়ে রেখেছে কে জানত।

আমরা অবাক হয়ে এই দলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারা ধান ক্ষেতের পাশে আমাদের কাছে দাঁড়াল। আমাদের দিকে এক নজর দেখে লতিফ চেয়ারম্যান গম্ভীর গলায় বলল, "পোলাপান এইখানে কী করো? এইটা রং তামাশা দেখার বিষয় না। সবাই বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে আল্লাহর নাম নাও।"

আমরা একটু সরে দাঁড়ালাম কিন্তু চলে গেলাম না।

লতিফ চেয়ারম্যান উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের যাঁদের মাথায় টুপি নাই তাঁরা বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে মেয়ে-ছেলেদের সাবধান করেন। ভুলেও যেন ঘর থেকে বের না হয়।"

এবারে ভয় পেয়ে বেশ কয়েকজন সরে যেতে শুরু করল। লতিফ চেয়ারম্যান এবারে তার ছেলে মতির দিকে তাকিয়ে বলল, "মইত্যা? তুই এইখানে কী করস? বাড়ি যা।"

মতি বলল, "আমি থাকি বাপজান।"

"না, বাড়ি যা।"

"তোমার সাথে থাকলে আমারে কিছু করব না বাবা।"

"মিলিটারির মেজাজ-মর্জির কুনো ঠিক নাই।"

"তা ছাড়া গফুর ভাই আমারে চিনে—"

লতিফ চেয়ারম্যান ঠাণ্ডা চোখে তার ছেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তাহলে থাক।"

মিলিটারির দলটাকে এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদি কোথাও না থামে তাহলে কিছুক্ষণের মাঝে এখানে হাজির হবে। আমার বুকটা কেমন জানি ধক ধক করতে থাকে। লতিফ চেয়ারম্যান আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই পোলাপান, যা, সবাই বাড়ি যা।"

অন্যেরাও আমাদের হাত নেড়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তখন টুপি মাথায় অল্প কয়জন মানুষ ছাড়া অন্য সবাই সরে যেতে শুরু করল। আমরাও সরে এলাম কিন্তু একেবারে চলে গেলাম না। একটু দূরে গিয়ে একটা কাঁঠালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লতিফ চেয়ারম্যান তখন ঢাউস পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা হাতে নিয়ে ডানে-বামে নাড়তে লাগল, তারপর জোরে জোরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চিৎকার করতে লাগল। দেখলাম মতিও চিৎকারে যোগ দিয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই মিলিটারির দলটা হাজির হলো। খাকি পোশাক, মাথায় হেলমেট, পায়ে কালো বুট। সবার হাতে ভয়ংকর দেখতে অস্ত্র। বুকের মাঝে গুলির বেল্ট। মিলিটারির দলের সাথে দুই-একজন বাঙালি আছে। একজনের মাথায় টুপি, আরেকজন টুপি ছাড়া তবে গালে চাপ দাড়ি।

মিলিটারির দলটা লতিফ চেয়ারম্যানের দলটার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। লতিফ চেয়ারম্যান তখন হাত কচলে কাঁচুমাচু করে মাথা নিচু করে কিছু একটা বলল, এত দূর থেকে কী বলল শুনতে পেলাম না। শুনলেও নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম না, নিশ্চয়ই উর্দুতে কিছু একটা বলেছে।

মিলিটারিটা কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, দূর থেকে শুধু "ইন্দু" শব্দটা শুনতে পেলাম, মিলিটারিরা হিন্দুকে ইন্দু বলে। লতিফ চেয়ারম্যান হাত দিয়ে হিন্দুপাড়ার দিকে দেখাল, তখন মতিও কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, আর হঠাৎ করে একটা মিলিটারি জানি কেমন খেপে উঠে খপ করে মতির চুল ধরে কাছে টেনে নিয়ে হুংকার দিয়ে বলল, "তু ইন্দু?"

মিলিটারির গলার স্বর মোটা, আমরা এত দূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। হঠাৎ করে আরেকটা মিলিটারি তার রাইফেলটা মতির গলায় ধরে কী যেন বলল, আমার মনে হলো এক্ষুনি গুলি করে দেবে আর মতির মাথাটা আলগা হয়ে উড়ে যাবে।

মতি দুই হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে, আমরা আবছা আবছা শুনলাম, মতি বলছে, "হাম মুসলমান। হাম সাচ্চা মুসলমান। হাম পাকিস্তানি আল্লাহর কসম লাগতা হায়।"

মিলিটারিগুলো মতির কথা বিশ্বাস করল না। তারপর যা একটা কাজ করল, সেটা বলার মতো না। টান দিয়ে ফালতু মতির লুঙিটা খুলে তাকে ন্যাংটা করে ফেলল। আমরা বুঝতে পারলাম তার খতনা হয়েছে কি না দেখছে। মতি মুসলমান তার প্রমাণ পাবার পর তার গালে একটা চড় দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "ভাগো হিয়াঁসে। বুরবাক।"

মতি তখন তার লুঙিটা কোনো মতে কোমরে প্যাঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের সামনে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। আমরা মাথা নিচু করে বসেছিলাম বলে আমাদের দেখতে পেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারিগুলো কিছুক্ষণ অন্যদের সাথে কথা বলে আবার হাঁটতে থাকে, কোথায় যাচ্ছে আমরা জানি না। যেদিকে হাঁটছে সেদিকে আমাদের স্কুল, আমাদের স্কুলে নিশ্চয়ই যাচ্ছে না। আমি আর মামুন ফিসফিস করে কথা বলে ঠিক করলাম আমরা মিলিটারিগুলোর পেছন পেছন গিয়ে দেখব ওরা কোথায় যায়, কী করে। যখন খুব সাবধানে উঠে দাঁড়ালাম হঠাৎ কর্কশ গুলির শব্দে পুরো এলাকাটা কেঁপে উঠল, সাথে সাথে মানুষের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। মিলিটারিগুলোও বিজাতীয় ভাষায় কী যেন চিৎকার করতে লাগল।

ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মামুন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "সর্বনাশ! এখন কী হবে? কী হবে?"

আমি বললাম, "আয় আমরা পালাই। মিলিটারি গুলি করে কাকে যেন মেরে ফেলেছে।"

আমরা খুব সাবধানে গ্রামের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে বাড়ির দিকে যেতে লাগলাম। গ্রামের বাড়িগুলোতে কোনো শব্দ নেই, সবাই নিঃশব্দে ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। মনে হয় গরু-ছাগল, কুকুর-বেড়ালও বুঝতে পারছে এখন খুব বিপদ, তাই সেগুলোও কোনো শব্দ করছে না। আমাদেরকে দেখে একটা বাড়ি থেকে কয়েকজন মানুষ বের হয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, "কী হইছে? কারে গুলি করছে?

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "জানি না।"

"মেরে ফেলছে?"

"মনে হয়। অনেক জোরে চিৎকার শুনলাম।" আমার সারা শরীর কাঁপছে, কথা বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। মামুনের গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না, সে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

বুড়ো মতন একজন মানুষ বলল, "তোমাদের যাওয়া ঠিক হয় নাই। বাড়ি যাও। আল্লাহ মেহেরবান।"

আমি আর মামুন আবার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। শুধু মনে হচ্ছিল আমাদের পেছন দিয়ে মিলিটারি বুঝি ছুটতে ছুটতে আসছে গুলি করার জন্য।

অন্য যেকোনো সময় হলে নানি আমার ওপর খুব রাগ করত, মনে হয় কানে ধরে পিঠে দুইটা চড়-চাপড় দিত কিন্তু আজকে কিছুই করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নানি তার শুকনো আঙুল দিয়ে আমাকে ধরে রাখল, আর ফিসফিস করে বলতে লাগল, "খোদা তুমি মেহেরবান। খোদা মেহেরবান।"

মিলিটারিগুলো দুপুরবেলা আবার সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে গেল। তারা কেন এসেছিল আর কেন ফিরে গেল, আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। মিলিটারিগুলো চলে গেছে সেটা নিশ্চিত হবার পর সবাই বাড়ি থেকে বের হয়েছে। ততক্ষণে সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেছে মাস্টারবাড়ির সাদাসিধে কামলা বগাকে মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলেছে। সাদাসিধে মানুষ, সড়কের ধারে গরুটা বেঁধে রাখতে গিয়েছিল, মিলিটারি দেখে ভয়ে দৌড় দিয়েছে, মিলিটারি সাথে সাথে গুলি করে তাকে মেরে ফেলেছে।

আমরা সবাই বগাকে দেখতে গেলাম, সড়কের পাশে উবু হয়ে পড়ে আছে ময়লা গেঞ্জিটা রক্তে ভিজে কালচে লাল হয়ে আছে। চোখগুলো খোলা, মনে হয় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টি কী ভয়ংকর! মনে হয় যেন এক্ষুনি মাথা ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাবে। বগাকে আমরা কতবার গ্রামের সড়ক দিয়ে গরু আনতে-নিতে দেখেছি, কখনো তাকে দেখে আমরা ভয় পাই নাই। কিন্তু এই সড়কের পাশে তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে কেমন জানি ভয় লাগতে লাগল। গ্রামের মানুষ যখন ধরাধরি করে বগার শরীরটা তুলে আনছে তখন আমি বাড়ি চলে এলাম।

রাতে আমি ভালো করে খেতে পারলাম না। সারা রাত ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠতে লাগলাম।

দুই দিন পর বলাই কাকুর স্টলে মতির সাথে দেখা হলো। মতি খুব তৃপ্তি করে চা খেতে খেতে অন্যদের সাথে কথা বলছে, "মিলিটারির কী খান্দানি চেহারা। গায়ের রং একেবারে আপেলের মতো।"

একজন বলল, "আপেল তো দেখি নাই কুনো দিন।"

মতি বলল, "আপেল হইল গোলাপি রঙের। মিলিটারির যে খালি রংটা গোলাপি সেটা সত্যি না, লম্বায় আপনার-আমার থেকে কমপক্ষে দেড় গুণ। ভারী ভারী অস্ত্রপাতি এমনভাবে ধরে যেন পাটশলা ধরে রাখছে। গায়ে মইষের মতন জোর।" মিলিটারির গুনগান করার সময় মতির চেহারা থেকে যেন আলো বের হতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন জিজ্ঞেস করল, "মিলিটারি দেখে তোমার ভয় করে নাই!"

মতি হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আরে ভয় করবে কেন? এক দেশের মিলিটারি, তারাও মুসলমান আমরাও মুসলমান। মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। ভাই ভাইরে ভয় পায় নাকি?"

আমি অবাক হয়ে মতির দিকে তাকালাম, সেদিন মিলিটারি যে তাকে ন্যাংটা করে দেখেছে তারপর চড় মেরে বিদায় করেছে সেই কথাটা মনে হয় কাউকে বলে নাই। এখন আমি যদি সবাইকে বলে দিই?

একজন জিজ্ঞেস করল, "সেই দিন মিলিটারি আসল কী জন্য। আবার গেল কী জন্য? মাঝখান থেকে আমাগো বগার জীবনটা শেষ।"

মতি বলল, "মিলিটারি কী জন্য আসছে এখনো বুঝেন নাই?"

"না।"

"দেশটা যে বাংলাদেশ হয় নাই, এখনো পাকিস্তান আছে সেইটা বুঝছেন?"

চায়ের স্টলের মানুষেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। মতি উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না, বলল, "দেশটা যে পাকিস্তান আছে সেইটা সবাইরে বোঝানোর দরকার আছে। সেই জন্য মিলিটারি সারা দেশের চিপায় চিপায় একবার ঘুরান দিয়া আসতেছে।"

"কিন্তু বগারে মারল কেন? বগা কী দোষ করছে?"

"বগা দৌড় দিল কেন? দৌড় না দিলে কি গুল্লি করে?"

"আবার কি আসব মিলিটারি?"

"আসবে তো বটেই। দেশটারে একটা শৃঙ্খলার মাঝে আনতে হবে না। শেখ সাহেব দেশটার কী সর্বনাশ করছে মনে আছে।" মতির কথা শুনে কেউ কোনো কথা বলল না।

"তোমার লগে কি মিলিটারির কথা হইছে?"

"বাপজানের সাথে বেশি কথা হইছে। আমার সাথে একটা-দুইটা কথা। ক্যায়সা হায় আচ্ছি হায় এই রকম ভদ্রতার কথা।"

"তোমার বাপজানরে কী বলছে মিলিটারি?"

"বলছে কোনো ভয় নাই। পুরা দেশ এখন তাগো দখলে। হিন্দুস্থানিদের মতলব হাসিল হয় নাই। বলছে মুক্তিবাহিনীর দেখা পাইলে খবর দিতে। অবশ্যি মুক্তিবাহিনী বলে নাই।" বলছে 'মিসকিরেন্ট', মিসকিরেন্ট মানে দুষ্কৃতিকারী।"

"ও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ধৈর্য ধরে ফালতু মতির কথা শুনলাম। চা শেষ করে চায়ের দাম দিয়ে মতি যখন বের হলো তখন আমিও তার পেছন পেছন বের হলাম। একটু সামনে গিয়ে তাকে ডাকলাম, "মতি ভাই।"

মতি পেছনে ঘুরে আমাকে দেখে বলল, "কে রঞ্জু?"

"হ্যাঁ।"

"খবর কী তোর? কাজীবাড়ির মাইয়ার কী খবর?"

"ভালো।" আমি মতির কাছে গিয়ে বললাম, "মতি ভাই তোমারে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"কী কথা?"

"মিলিটারি যে তোমারে ন্যাংটা কইরা—"

আমি কথা শেষ করার আগেই মতি খপ করে আমার চুল ধরে ফেলল, বলল, "হারামজাদা, তুই যদি মুখ খুলস, আমি তোরে জবাই করে ফেলমু।"

আমি অবাক হয়ে মতির দিকে তাকালাম। এত দিন এই মানুষটা ছিল পুরোপুরি অপদার্থ ফালতু একজন মানুষ। হঠাৎ করে মানুষটা অন্য রকম হয়ে গেছে, চোখ দেখলেই ভয় করে।

মতি আমার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমারে তুই চিনস না? আগের দিন আর নাই? এখন নূতন দিন আসতাছে। ক্ষমতা এখন আমাগো হাতে? বুঝছস?"

আমি চুলের যন্ত্রণা সহ্য করে বললাম, "বুঝছি।"

"তোর মুখ থেকে যদি একটা কথা বের হয় আমি তোর বাড়িতে আগুন দিমু, মনে থাকবে?"

"থাকবে।"

মতি আমার চুল ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, "যা হারামজাদা। মনে থাকে যেন।"

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, মতি হেঁটে চলে গেল। রাগে-অপমানে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল।

পরের দিন খবর পেলাম মিলিটারি আমাদের স্কুলে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কিছু একটা দেখে চলে গেছে। যাওয়ার আগে আমাদের শহীদ মিনারটা ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে! বাঁশ দিয়ে তৈরি আমাদের এই শহীদ মিনারের ওপর মিলিটারির এত রাগ কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩.

কাঁকনডুবিতে মিলিটারি আসার ঠিক এক সপ্তাহ পর আমি আর ডোরা গ্রামের শেষে যে ধানক্ষেত আছে, সেখানে বেড়াতে গেছি। ডোরা আসার আগে আমি জানতাম না যে ধানক্ষেত বেড়ানোর জায়গা আর ধানক্ষেতের আল ধরে হাঁটা একটা মজার খেলা। শহরে থাকত বলে গ্রামের খুব সাধারণ জিনিসগুলোই ডোরা দেখেনি। যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে যন্ত্রণার মতো ডোরার কাছে সেটাই খুবই উত্তেজনার একটা বিষয়। সময়ে-অসময়ে ডোরা আমাকে নিয়ে কাঁকনডুবি গ্রামের আজব আজব জায়গায় চলে যেত— আমার ধারণা ছিল তার মা, বড় বোন কিংবা অন্যেরা খুবই বিরক্ত হবে, গ্রামের মানুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম, যখন দেখলাম তার মা কিংবা বোন বিরক্ত তো হচ্ছেই না, বরং কেমন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ডোরার বড় বোন নোরা কারণটা আমাকে একদিন বলেছে, বাবাকে মিলিটারি মেরে ফেলার পর ডোরা নাকি পুরোপুরি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে খেত না, ঘুমাত না, চোখ বড় বড় করে বসে থাকত, বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলত। এই কাঁকনডুবিতে এসে ডোরা প্রথম একটু স্বাভাবিক হয়েছে। বড় বোন আর তার মা দুজনেই আমাকে বলেছে ডোরাকে একটু দেখে রাখতে। তাই আমি তাকে দেখে রাখছি— প্রচণ্ড দুপুরের রোদে আমি ডোরাকে নিয়ে ধানক্ষেতের ভেতরে আলের ওপর দিয়ে হাঁটছি। ডোরা তার পায়ের স্যান্ডেলগুলো খুলে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে লাগল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো? জুতা খুলছ কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস করি।"

"কেন?"

"যখন মুক্তিবাহিনী হব তখন খালি পায়ে হাঁটতে হবে না?"

ডোরার বেশির ভাগ কথাবার্তা হয় মুক্তিবাহিনী নিয়ে, যখন সে মুক্তিবাহিনী হবে তখন কী করবে তার কথাবার্তায় সে সময়ের নানা রকম বর্ণনা থাকে। এই যে দুপুরের রোদে বের হয়ে এসেছে মনে হয় এইটাও তার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং।

আমি খানিকক্ষণ তার খালি পায়ে হাঁটা দেখলাম, অভ্যাস নাই বলে তার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। তার পরও সে হেঁটে যাচ্ছে। আমি বললাম, "তোমার কি ব্যথা লাগছে?"

"একটু একটু। সমস্যা নাই। তুমি যদি পারো আমি কেন পারব না? তোমার সাথে আমার কী পার্থক্য?"

আমি দাঁত বের করে হেসে ফেললাম, "আমি জন্মে কোনো দিন জুতা পরি নাই আর তুমি জন্মে কোনো দিন খালি পায়ে হাঁট নাই! এইটা হচ্ছে পার্থক্য।"

ডোরা আমার কথার উত্তর না দিয়ে আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আষাঢ় মাস শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আকাশে এতটুকু মেঘ নাই। ডোরা জিজ্ঞেস করল, "আকাশে কী দেখ?"

"মেঘ আছে কি না দেখি। নাই, কোনো মেঘ নাই। আষাঢ় মাস শুরু হয়ে গেছে এখনো কোনো মেঘ নাই।"

ডোরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছে সেই রকম ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। বলল, "যখন বর্ষাকাল শুরু হবে তখন পাকিস্তানি মিলিটারিদের বারোটা বেজে যাবে। তাই না?"

বর্ষাকালের সাথে পাকিস্তানি মিলিটারির বারোটা বেজে যাওয়ার কী সম্পর্ক আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমি ডোরার কথা নিয়ে কোনো আপত্তি করলাম না। ডোরাকে খুবই আনন্দিত দেখা গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, "পাকিস্তান তো মরুভূমি, কোনো পানি নাই। নদী নাই। তাই ওই বদমাইশগুলো সাঁতার জানে না। পানিকে খুব ভয় পায়।"

আমি আবার মাথা নাড়লাম। ডোরা বলল, "যখন বর্ষাকাল শুরু হবে তখন মুক্তিবাহিনীর খুবই সুবিধা হবে। হবে না?"

আমি বললাম, "হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মুক্তিবাহিনীর সবাই তো সাঁতার জানে। জানে না?"

"জানে।"

"মুক্তিবাহিনী নৌকা করে আসবে, এসে যুদ্ধ করবে। আর মিলিটারিরা বসে বসে মার খাবে। খাবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম, "খাবে।"

ডোরা বলল, "একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"প্রথমে আমি আর তুমি মুক্তিবাহিনী হব। তারপর—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। দুইজনে কি একটা বাহিনী হয়? বাহিনী বানাতে অনেক মানুষ লাগে।"

ডোরা একটু বিরক্ত হলো, বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে আমরা দুইজন মুক্তিযোদ্ধা হব আর আমাদের বাহিনী হবে দুইজন মুক্তিযোদ্ধার একটা বাহিনী। তোমার সমস্যাটা কী?"

"না না, কোনো সমস্যা নাই।"

"ঠিক আছে। আমাদের কাছে রাইফেল থাকবে, স্টেনগান থাকবে, গ্রেনেড থাকবে।"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে আমরা অনেক কিছু শিখে গেছি। আগে সবকিছুকে বলতাম বন্দুক এখন বলি রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান। আগে গ্রেনেডের নামও শুনি নাই এখন আমরা গ্রেনেড কী জানি। মর্টার কী জানি। ব্রাশফায়ার মানে কী জানি। অ্যামবুশ মানে কী জানি।

ডোরা বলল, "আমরা কী করব জানো?"

"কী?"

"আমরা আমাদের রাইফেল নিয়ে কালী গাংয়ের পাড়ে শুয়ে থাকব। আমাদেরকে দেখে যেন চিনতে না পারে সেই জন্য আমরা আমাদের মাথার ওপরে কয়েকটা গাছের ডাল-পাতা— এই গুলি দিয়ে রাখব। দূর থেকে মনে হবে একটা ঝোপ।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

"তারপর যখন মিলিটারি নৌকা করে আমাদের সামনে দিয়ে যাবে তখন কী করব বুঝেছ?"

"কী করব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নৌকার মাঝে একটা গুলি। বেশি না, মাত্র একটা গুলি।"

"তখন কী হবে?"

"তখন নৌকার মাঝে ফুটা হয়ে যাবে, নৌকার মাঝে পানি ঢুকবে, নৌকা ডুবে যাবে আর সবগুলো মিলিটারি ডুবে মরবে। ওরা সাঁতার জানে না তো তাই কেউ বাঁচবে না। সব শেষ! একটা বুলেট দিয়ে আমরা একশ মিলিটারি মেরে ফেলব।"

ডোরার মুখ আনন্দে ঝলমল করতে থাকে। তাকে দেখে মনে হতে থাকে সে আসলেই বুঝি একশ মিলিটারি মেরে ফেলেছে। একটা নৌকাতে আসলেই একশ মিলিটারি উঠবে কি না আর ছোট একটা ফুটো দিয়ে পানি ঢুকতে থাকলে সেটা কোনো কিছু দিয়ে বন্ধ করা যায় কি না কিংবা সেঁচতে থাকা যায় কি না— এ রকম একশটা জিনিস নিয়ে তর্ক করা যায় কিন্তু আমি মোটেও তার চেষ্টা করলাম না। আমিও যোগ দিলাম, বললাম, "আমরা চুতরা পাতা আর বানরশলা ডিব্বার ভেতরে ভরে রাখব, এরা যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন এই ডিব্বা ছুড়ে দেব, এদের শরীরে যখন চুতরা পাতা আর বানরশলা লাগবে, তখন সারা শরীর চুলকাতে থাকবে, তখন আমরা অ্যামবুশ করব!"

ঠিক জায়গামতো অ্যামবুশ শব্দটা বলতে পেরে আমার খুবই আনন্দ হলো।

AMARBOI.COM

আমার কথা শুনে ডোরাও হি হি করে হাসতে থাকে। তারপর সে আরেকটা বুদ্ধি বের করে। রাস্তা কেটে রেখে তার ওপর একটা পাতলা ঢাকনা দিয়ে মিলিটারির জিপ ফেলে দেওয়ার বুদ্ধি। তারপর আমি পোষা কবুতর দিয়ে কীভাবে মিলিটারি ক্যাম্পের ওপর পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায় তার একটা বুদ্ধি বের করলাম। তখন ডোরা পোষা কুকুরকে কীভাবে ঠিক মিলিটারির মাঝখানে একটা গ্রেনেড ফেলে দেওয়ার ট্রেনিং দেবে, সেইটা নিয়ে একটা বুদ্ধি বের করল। এইভাবে আমরা একটার পর একটা বুদ্ধি বের করে সেটা নিয়ে গল্প করতে থাকলাম, কথা বলতে থাকলাম। এভাবে কতদূর হেঁটে এসেছি তার ঠিক নেই। ঠিক তখন প্রথমে একটা গুলির শব্দ, তারপর একটা ব্রাশফায়ারের শব্দ শুনলাম। মনে হলো খুব কাছে থেকে। আমরা চমকে উঠে ভয় পেয়ে সাথে সাথে সেখানে মাথা নিচু করে বসে পড়লাম। তারপর যে দৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পেলাম তাতে আমাদের শরীর পাথরের মতো জমে গেল। বড় সড়ক দিয়ে লাইন ধরে খাকি পোশাক পরা মিলিটারি আসছে। আগে যে রকম অল্প কয়জন এসেছিল সে রকম না, দেখে মনে হয় শত শত। সবাই তাদের হাতের অস্ত্র উঁচু করে রেখেছে, দরকার হলেই গুলি করবে সে রকম একটা ভঙ্গি। কয়েকজন সড়কের দুই পাশে উবু হয়ে বসে মেশিনগান তাক করে রাখে, অন্যেরা তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। তখন অন্য আরো দুইজন মেশিনগান নিয়ে উবু হয়ে বসে আর অন্যেরা তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। শুধু যে মিলিটারি তা না। মিলিটারির সাথে অনেক গ্রামের মানুষ। তাদের মাথায় গুলির বাক্স, নানা রকম মালপত্র। মিলিটারিগুলো গ্রামের মানুষগুলোকে ধরে এনেছে তাদের মালপত্র টেনে আনার জন্য। আমরা কী করব বুঝতে পারলাম না, দাঁড়ালেই আমাদের দেখা যাবে, আমাদের দেখলে মিলিটারিগুলো কী করবে কে জানে। যদি গুলি করে দেয়? তাই আমি আর ডোরা একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম, ভয়ে আমাদের বুক ধক্ ধক্ করছে।

ডোরা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "এরা কোথায় যায়?"

আমি বললাম, "জানি না। সাথে অনেক মালপত্র, যেখানেই যাক, মনে হয় সেখানে অনেক দিন থাকবে।"

ডোরা বলল, "সর্বনাশ! এইখানে থাকবে না তো?"

"এইখানে কোথায় থাকবে?"

আমরা ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম, মিলিটারিগুলো হেঁটে হেঁটে আসছে, আমাদের খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গেল। এত কাছ দিয়ে যে আমরা তাদের চেহারাগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলাম। কী ভয়ংকর চেহারা, চোখগুলো কোটরের ভেতর, চোয়ালগুলো উঁচু, পাথরের মতো মুখ। কেউ কথা বলছে না, একজনের পেছনে আরেকজন হেঁটে যাচ্ছে। এদেরকে দেখতে মানুষের মতো লাগলেও আসলে এরা সবাই এক-একটা রাক্ষস। এই সব রাক্ষস কোথাও না কোথাও কোনো মানুষকে মেরেছে। কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

গ্রামের যে মানুষগুলোকে ধরে এনেছে তাদের মাঝে একেবারে কমবয়সী থেকে বুড়ো মানুষ পর্যন্ত আছে। সবার মাথায় নানা ধরনের মালপত্র, গুলির বোঝা। কতদূর থেকে তারা আসছে কে জানে, দেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যায় ক্লান্তিতে তাদের দম বেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই ধুঁকে ধুঁকে যাচ্ছে, পরিশ্রমে তাদের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

মিলিটারিগুলো সড়ক ধরে আমাদের স্কুলের দিকে হেঁটে গেল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম, যখন সবাই চলে যাবে তখন বের হয়ে দৌড়ে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ব। এতক্ষণে নিশ্চয়ই গ্রামের সবাই খবর পেয়ে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। আজকে নানির কাছ থেকে মনে হয় শুধু বকুনি না, একটু মারধরও খেতে হবে।

ঠিক তখন আমরা একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমরা দেখলাম দুইটা মিলিটারি বলাই কাকুকে ধরে আনছে। বলাই কাকু এমনভাবে হাঁটছে যে মনে হচ্ছে তার চারপাশে কী হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছে না। পেছনে একটা মিলিটারি তার পিঠে রাইফেলটা ধরে রেখেছে। হেঁটে হেঁটে ধানক্ষেতে নামিয়ে আনল, তারপর ঠেলে ঠেলে ঠিক আমাদের দিকে আনতে লাগল। ভয়ে আর আতঙ্কে আমরা তখন পরিষ্কার করে চিন্তাও করতে পারছি না, ডোরা এখনো বুঝতে পারছে না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি বলাই কাকুকে গুলি করার জন্য আনছে।

আমি ডোরাকে ফিসফিস করে বললাম, "ডোরা চোখ বন্ধ করো।"

"কেন?"

"করো বলছি।"

ডোরা চোখ বন্ধ করল, আমিও আর তাকিয়ে থাকতে পারছিলাম না কিন্তু তার পরও কীভাবে জানি তাকিয়ে রইলাম। বলাই কাকুকে একটা আলের ওপর দাঁড়া করাল, তারপর মিলিটারি দুইটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। আমি দেখলাম একটা মিলিটারি কোমরে হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যজন রাইফেল তুলল।

আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম, ভয়ংকর দুইটা গুলির শব্দ হলো। ডোরা নিশ্চয় চিৎকার করেছিল কিন্তু গুলির শব্দের জন্য সেটা আলাদাভাবে শোনা গেল না, আমি জাপটে তার মুখ ধরে ফেললাম, ডোরা তখন থরথর করে কাঁপছে। আমি সাবধানে তাকালাম, যেখানে বলাই কাকু দাঁড়িয়েছিল সেখানে নাই, নিচে পড়ে আছে। মিলিটারি দুইটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো দাঁড়িয়ে আছে। একজন পকেট থেকে সিগারেট বের করে আরেকজনকে একটা দিল, দুজনে সিগারেট ধরাল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। একজন কী একটা বলল, অন্যজন তখন হাসতে হাসতে তাকে একটা ধাক্কা দিল, নিশ্চয়ই মজার কিছু একটা বলেছে।

ডোরা মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপছে, আমি তাকে ধরে রেখেছি। মিলিটারিগুলো একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যাবার পরও আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর ডোরাকে টেনে দাঁড়া করালাম। বললাম, "চল।"

ডোরা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যেতে পারবে?"

ডোরা মাথা নাড়ল। তখন আমি তার হাত ধরে ছুটতে লাগলাম। বলাই কাকুর পাশ দিয়ে যখন ছুটে যাচ্ছি তখন একবার চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বলাই কাকু নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! কী বিচিত্র সেই দৃষ্টি।

হেই খোদা! তুমি এটা কী করলে? কীভাবে করলে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪.

পুরো একদিন বলাই কাকুর লাশটা ধানক্ষেতে পড়ে থাকল। শ্মশানে তার লাশটা পোড়ানোর কেউ সাহস পেল না। কেমন করে পাবে? পাকিস্তানি মিলিটারি এসে আমাদের স্কুলে ক্যাম্প করেছে— এক-দুই দিনের জন্য নয়, পাকাপাকিভাবে। তারা যেই মানুষটাকে মেরেছে তার লাশের একটা গতি করবে, কারো সেই সাহস নাই। পরের দিন দেখা গেল রাত্রে শেয়াল লাশের খানিকটা খেয়ে গেছে।

পরের দিন ফালতু মতির বাবা লতিফ চেয়ারম্যান আমাদের স্কুলে গিয়ে মিলিটারির সাথে কথা বলে গ্রামের মানুষদের বলল, লাশটা পুঁতে ফেললে তারা কিছু বলবে না। তখন গ্রামের কিছু মানুষ যারা এত দিন বলাই কাকুর চায়ের স্টলে চা খেয়েছে, আড্ডা দিয়েছে, রেডিও শুনেছে, তারা এসে লাশের পাশে একটা গর্ত করে লাশটা সেখানে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে দিল। এই পৃথিবীতে বলাই কাকুর কোনো চিহ্ন থাকল না। তার চায়ের স্টলটা প্রথম দুই দিন বন্ধ থাকল, পরের দিন দেখা গেল সুলেমান নামের একজন মানুষ, লতিফ চেয়ারম্যানের দূরসম্পর্কে শালা, বলাই কাকুর চায়ের স্টলটা দখল করে নিয়েছে। সেই চায়ের স্টলে জোরে জোরে রেডিও পাকিস্তান বাজতে লাগল, কোথা থেকে ইয়াহিয়া খানের বাঁধাই করা একটা ছবি টানিয়ে দেয়া হলো কিন্তু খরিদ্দার বলতে গেলে কেউ নাই। সুলেমান বলাই কাকুর মতো ভালো চা বানাতে পারে না, সেটা একটা কারণ হতে পারে, ইয়াহিয়া খানের চেহারা খুবই খারাপ, সেই চেহারার মানুষের বাঁধাই করা ছবি দেখতে কারো ভালো লাগে না, সেটা একটা কারণ হতে পারে, রেডিও পাকিস্তানে উর্দু খবর কেউ শুনতে চায় না, সেটাও একটা কারণ হতে পারে। তবে আসল কারণ হচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই কাকুর চায়ের স্টলটা আমাদের স্কুলের খুব কাছে। মিলিটারির এত কাছে চা খেতে আসার মতো সাহস কারো নাই।

কাঁকনডুবিতে মিলিটারি আসার পর প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা তারা স্কুল থেকে বের হলো না। কাঁকনডুবি গ্রামের কোনো মানুষও তাদের বাড়ি থেকে বের হলো না। আমি অবশ্যি তার মাঝেও এক ফাঁকে বের হয়ে গেলাম, বলাই কাকুর চায়ের স্টল পর্যন্ত গিয়ে আমি স্টলের সামনে দাঁড়ালাম। বলাই কাকু আর কোনো দিন এই স্টলে আসবে না, সেটা এখনো বিশ্বাস হয় না। স্টলে কোনো খরিদ্দার নাই, সুলেমান একা একা বসে বসে কাচের গ্লাসগুলো পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করছে। আমাকে দেখে সুলেমান খুবই খুশি হয়ে গেল, আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "কী মিয়া চা খাইবা? কুকি বিস্কুট? কুনো কাস্টমার নাই, আস বউনি কইরা যাও।"

আমি বললাম, "পয়সা নাই।"

সুলেমানের মুখটা ধপ করে নিভে গেল। একটু পরে বলল, "আস ভেতরে আস। তোমারে এক কাপ ফ্রি চা দিই।"

এই লোকের কাছ থেকে আমার চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই, মনে হলো বলি 'তোমার চা খাই তো পিশাব খাই' কিন্তু সেটা তো বলা যায় না। তাই আমি মাথা নেড়ে বললাম, "লাগবে না।"

তারপর আমি সড়কটা ধরে সাবধানে স্কুলের দিকে আগাতে লাগলাম। খানিকদূর যাবার পর আমি একধরনের খটখট শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো কুড়াল দিয়ে অনেক মানুষ কিছু একটা কাটছে। আমি ভয়ে ভয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলাম, শব্দটা আরো স্পষ্ট হলো। দূর থেকে স্কুলটাকে দেখা যায় কিন্তু এখন সেটাকে খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে। স্কুলের চারপাশে অনেক গাছ ছিল, সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই এলাকার সব মানুষকে ধরে এনে মিলিটারি তাদেরকে দিয়ে গাছ কাটাচ্ছে। সব গাছ কেটে ফেলার জন্য আমাদের স্কুলটাকে কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম স্কুলের ছাদে বালুর বস্তা দিয়ে ঘেরাও করছে, এর ভেতরে নিশ্চয়ই মিলিটারির পাহারা থাকবে। আমার বেশিক্ষণ থাকার সাহস হলো না, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার সময় কাজীবাড়িতে একটু ঢুঁ দিয়ে এলাম। সেদিন আমাদের চোখের সামনে যখন বলাই কাকুকে গুলি করে মেরে ফেলল তখন আমি ডোরার জন্য খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ডোরারও কিছু একটা হয়ে যায় কি না। কিন্তু ডোরা শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখে বাড়ির বেশ কয়েকজন আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন জিজ্ঞেস করল, "মিলিটারির কী খবর?"

ঠিক কী কারণ জানি না, সবারই ধারণা আমি এই গ্রামে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার সবকিছু জানি। আমি একটু আগে স্কুলের কাছাকাছি গিয়ে কী দেখে এসেছি, সেইটা অনেক বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বললাম। বলাই কাকুর পরে আর কাউকে মেরেছে কি না জানতে চাইল, আমি বললাম যে এখনো সে রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

আশপাশে ডোরাকে দেখলাম না, তখন আমি ডোরার বড় বোন নোরাকে জিজ্ঞেস করলাম, "নোরা বুবু, ডোরা কই?"

"ঘরের ভেতরে।"

"কী করে?"

"কিছু করে না। বিছানার ওপর বসে আছে। তুমি যাও দেখি, একটু কথা বলে দেখ মনটা ভালো করতে পারো কি না। এই ডোরার জন্য আমাদের এত চিন্তা হয়।"

AMARBOI.COM

ডোরাকে যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখানে একটা জানালা আছে। মাঝে মাঝে জানালায় টোকা দিয়ে আমি ডোরাকে ডেকে আনি, আজকে সরাসরি ঘরের ভেতরে গেলাম, ডোরা বিছানায় পা তুলে হাঁটুর ওপরে মুখটা রেখে বসে আছে, আমাকে দেখে এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে আগে কোনো দিন দেখেনি। আমি বললাম, "ডোরা, তোমরা শরীর ভালো আছে?"

ডোরা কোনো কথা বলল না, শুধু মাথা নাড়ল। বলাই কাকুর চায়ের দোকান সুলেমান দখল করে নিয়েছে, সেখানে একটা ইয়াহিয়া খানের ছবি টানিয়ে রেখেছে, সেটা বলা মনে হয় ঠিক হবে না। আমাদের স্কুলের সব গাছ কেটে ন্যাড়া করে ফেলেছে, সেটা বলাও ঠিক হবে না। শুনে ডোরার আরো মন খারাপ হয়ে যাবে। তবে এই খবরগুলোই অন্যভাবে দেয়া যায়। আমি চেষ্টা করলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চরমপত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেভাবে খবর দেয় সেই কায়দায় বললাম, "মিলিটারি স্কুলে ক্যাম্প করেছে শুনেছ তো?"

ডোরা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "এত ক্যাম্প এত মিলিটারি কিন্তু ভয়ে মিলিটারির অবস্থা কেরোসিন!"

ডোরা এই প্রথম কথা বলল, "কেন? কেরোসিন কেন?"

"ভয়ে ওদের ঘুম নাই, খাওয়া নাই। কখন মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। ভয়ে ওরা কী করেছে জানো?"

"কী করেছে?"

"স্কুলের সব গাছ কেটে ফেলেছে। বালুর বস্তা দিয়ে বাংকার বানিয়ে সেইখানে চব্বিশ ঘণ্টা মেশিনগান নিয়ে বসে আছে! ভয়ে সবগুলোর ঘুম হারাম।"

ডোরা চোখে-মুখে একটু উৎসাহ দিয়ে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? বেকুবেরা ভেবেছে কয়টা গাছ কেটে ফেললে আর বালুর বস্তা ফেললেই মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে বাঁচবে? কোনো দিন না! এরা মুক্তিবাহিনীকে চিনে না।"

"মুক্তিবাহিনী আসবে?"

"আসবে না মানে? যেকোনো দিন আসবে। আমি মাসুদ ভাইকে খুব ভালো করে চিনি। মাসুদ ভাই আসবেই আসবে।"

"মুক্তিবাহিনী আসলে আমি আর তুমি ওদের সাথে চলে যেতে পারব না?"

আমি চেষ্টা করেছিলাম মাসুদ ভাই আমাকে নেয় নাই, কিন্তু ডোরাকে সেটা আবার বলে লাভ নাই, তাই বললাম, "মনে হয় যেতে পারব। একলা আমাকে নিতে চায় নাই। দুইজন বললে মনে হয় না করতে পারবে না।"

ডোরা জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "দরকার হলে আমি চুল কেটে ছেলেদের মতো হয়ে যাব। শার্ট-প্যান্ট পরে থাকব। কেউ বুঝতে পারবে না আমি মেয়ে।"

সেটা খুবই বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ হবে— এ রকম ভান করে আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ালাম। ডোরা তখন মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে কী কী করবে তার অনেক রকম বর্ণনা দিতে লাগল আর আমি মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণের মাঝেই ডোরার মন ভালো হয়ে গেল— আমি ওঠার আগে বললাম, "তুমি কি শুনেছ বলাই কাকুর চায়ের স্টলে কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে?"

"সুলেমান নামে একটা পাকিস্তানি দালাল স্টলটা দখল করেছে, কিন্তু কী হয়েছে জানো?"

"কী হয়েছে?"

"এই স্টলে একজনও চা খেতে যায় না। কুত্তা-বিলাই পর্যন্ত যায় না।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? আমি গিয়েছিলাম আমার হাত-পা ধরে তেল-মালিশ, আমি যেন চা খাই। পয়সা লাগবে না, ফ্রি।"

"তুমি খেয়েছ?"

"মাথা খারাপ? আমি ওই দালালের দোকানে চা খাব? কী বলেছি, জানো?"

ডোরা চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বলেছ?"

"আমি বলেছি আমি আপনার দোকানের চা খাই তো পিশাব খাই!"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি!" আসলে সত্যি না, কিন্তু এই কথাটা যে বলতে চেয়েছিলাম, সেটা তো একশ বার সত্যি। আর গল্প করার সময় একটু সত্যি-মিথ্যা মিলিয়ে গল্প করতে হয়। তাছাড়া ডোরার বড় বোন আমাকে পাঠিয়েছে ডোরার মন ভালো করার জন্য, আমাকে তো একটু চেষ্টা করতে হবে। আমার কথা শুনে ডোরা হি হি করে এত জোরে হাসতে শুরু করল যে পাশের ঘর থেকে তার আম্মু পর্যন্ত চলে আসলেন ঘটনাটা কী দেখতে।

স্কুলে মিলিটারি ক্যাম্পটা ঠিকভাবে বসিয়ে দুই দিন পর মিলিটারির একটা দল বের হলো গ্রামটা ঘুরে দেখতে। মিলিটারি রাস্তাঘাট চিনে না তাই তাদের রাস্তাঘাট দেখিয়ে নেওয়ার জন্য সাথে থাকল লতিফ চেয়ারম্যান। খবর পেয়ে আমরা দলটার পিছু নিলাম, বেশ পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে তাদের সাথে হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকি মিলিটারি কী করে। খুবই ভয় লাগছিল কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, ভয় পাবার পরও দেখার কৌতূহল হয়।

মিলিটারি যুদ্ধ করে তাই আমার ধারণা ছিল তারা বুঝি গ্রামটা চক্কর দিয়ে দেখবে কীভাবে যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু আমি খুবই অবাক হলাম যখন দেখলাম মিলিটারিগুলো মানুষের গোয়ালঘরের মাঝে থেমে গরুগুলো টিপেটুপে দেখতে লাগল। আমাদের দশ গ্রামে যখন ষাঁড়ের লড়াই হয় তখন মনু চাচার ষাঁড়টাকে কেউ হারাতে পারে না। পর পর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, গতবার পেয়েছে চার ব্যান্ডের রেডিও, এর আগেরবার দেয়ালঘড়ি। মিলিটারির দলটা মনু চাচার বাড়ির সামনে বেঁধে রাখা ষাঁড়টাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সারাক্ষণই তাদের মুখে একটা রাগ রাগ ভাব ছিল কিন্তু মনু চাচার বিশাল ষাঁড়টাকে দেখে তাদের মুখে প্রথমবার হাসি ফুটে উঠল। লতিফ চেয়ারম্যানকে কিছু একটা বলল, লতিফ চেয়ারম্যান হাত কচলে কিছু একটা উত্তর দিল, তখন মিলিটারিগুলো তাকে একটা ধমক দিল।

ধমক খেয়ে লতিফ চেয়ারম্যান মনু চাচাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে পাঠাল। মনু চাচা ভয়ে ভয়ে বের হয়ে মিলিটারিগুলোকে একটা সালাম দিল, মিলিটারিগুলো সালামের কোনো উত্তর না দিয়ে হড়বড় করে মনু চাচাকে কী একটা জানি বলল। মনু চাচা কিছুই বুঝতে পারল না, তখন লতিফ চেয়ারম্যান মনু চাচাকে কথাটা বুঝিয়ে দিল। স্কুলে মিলিটারির ক্যাম্পে তাদের খাওয়ার জন্য একটা গরু দরকার এই গরুটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তাই মনু চাচাকে বলেছে গরুটা স্কুলে পৌঁছে দিতে।

কথাটা শুনে মনু চাচা একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন। আমরা সবাই জানি মনু চাচা এই ষাঁড়টাকে একেবারে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন। এই ষাঁড়টাকে বেছে বেছে খাওয়ান, কালী গাংয়ে নিয়ে নিজের হাতে গোসল করান, ষাঁড়ের লড়াইয়ের সময় তার ধারালো শিংয়ে ফুলের মালা লাগিয়ে নিয়ে যান। সেই ষাঁড়টাকে মিলিটারিরা জবাই করে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে— এটা শুনে তো হাউমাউ করে কাঁদতেই পারেন। মনু চাচার কান্না শুনে মিলিটারিগুলো খুবই বিরক্ত হলো, একজন তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে মনু চাচাকে মারতে গেল তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ে মনু চাচার কান্না থেমে গেল। বিজাতীয় ভাষায় গালাগাল করতে করতে মিলিটারিগুলো লতিফ চেয়ারম্যানকে কী যেন বলল, লতিফ চেয়ারম্যান মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

একটু পরেই দেখলাম কয়েকজন মানুষ মিলে মনু চাচার বিশাল তেজি ষাঁড়টাকে আমাদের স্কুলে মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে, আর মনু চাচা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গরুটার পেছনে পেছনে যাচ্ছেন। দেখে আমার এত কষ্ট লাগল যে সেটা বলার মতো না।

মনু চাচার বাড়ি থেকে বের হয়ে মিলিটারিগুলো লতিফ চেয়ারম্যানকে কিছু একটা জিনিস জিজ্ঞেস করল, আমি শুধু "ইন্দু" শব্দটা বুঝতে পারলাম। তার মানে এখানে হিন্দু কোথায় আছে, সেটা জানতে চাচ্ছে। লতিফ চেয়ারম্যান হাত নেড়ে হিন্দুপাড়ার দিকে দেখাল, মিলিটারিগুলো তখন তাদের সেখানে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল।

কী সর্বনাশ! নীলিমারা চলে গেছে কিন্তু এখনো বেশ কয়েকটা হিন্দু পরিবার রয়ে গেছে। মিলিটারিগুলো দেখলে নিশ্চয়ই সবাইকে মেরে ফেলবে। আমি তখন দেরি করলাম না, একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে সামনে চলে গেলাম। যখন সড়কটা একটু বাঁক নিয়েছে আমাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। একটু সামনে গিয়ে সড়ক থেকে নেমে কারো সবজি ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, কারো উঠানের ওপর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি হিন্দুপাড়ার মাঝে হাজির হলাম। একজন থুরথুরে বুড়ি আমাকে দেখে বলল, "বাবাধন! দৌড়াও কেন? কী হইছে তোমার?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "মিলিটারি আসতেছে! আপনারা বাড়ি থেকে পালান! তাড়াতাড়ি!"

আমার চিৎকার শুনে বাড়ি থেকে আরো অনেকে বের হয়ে এল, আমি আবার চিৎকার করে বললাম, "মিলিটারি আসতেছে আপনাদের মারার জন্য। আপনারা এক্ষুনি পালান!"

মানুষগুলো সাথে সাথে বুঝে গেল। তারা চিৎকার করে নিজেদের ছেলেমেয়ে, বউ-বাচ্চাদের ডাকতে থাকে। দেখতে দেখতে সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আসে। নিশ্চয়ই আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে কোথায় পালাবে, সবাই সেই দিকে ছুটতে থাকে। থুরথুরে বুড়িটাকেও একজন পাঁজাকোলা করে নিয়ে বাড়ির পেছনে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও তখন সরে গেলাম, মিলিটারি এসে যদি আমাকে দেখে, সমস্যা হতে পারে। মাথামোটা মিলিটারি মনে হয় বুঝবে না কিন্তু লতিফ চেয়ারম্যান সাথে সাথে বুঝে যাবে ঘটনা কী।

মিলিটারিগুলো নিশ্চয়ই গ্রামের বাড়িঘর দেখতে দেখতে ধীরে-সুস্থে এসেছে, তাই তারা যখন এসেছে তখন পুরো হিন্দুপাড়া ধূ ধূ ফাঁকা। মিলিটারিগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিন্দুদের খুঁজল, কাউকে না পেয়ে খুবই বিরক্ত হলো। ঘরের ভেতর ঢুকে লাথি দিয়ে জিনিসপত্র ফেলতে লাগল। তারপর বাইরে এসে লতিফ চেয়ারম্যানকে কিছু একটা বলল। লতিফ চেয়ারম্যান তখন এদিক-সেদিক তাকাল। কী হচ্ছে দেখার জন্য কিছু মানুষ আশেপাশে জড়ো হয়েছে, লতিফ চেয়ারম্যান তাদেরকে বলল, "এটা হিন্দুদের বাড়ি। হিন্দুর মাল এখন গণিমতের মাল। তোমাদের যার যা ইচ্ছা এই বাড়ি থেকে নিয়ে যাও।"

যারা কৌতূহলী হয়ে এসেছিল তারা কেউ নড়ল না। হিন্দু-মুসলমান সবাই একসঙ্গে এত দিন এই গ্রামে আছে, এখন হঠাৎ করে তাদের মালপত্র বাড়িঘর সবকিছুকে গণিমতের মাল বললেই তো সেটা লুটপাট করে নেয়া যায় না।

AMARBOI.COM

লতিফ চেয়ারম্যান আবার বলল, "কী হলো? নিচ্ছ না কেন? যাও নেও।"

এবারেও কেউ নড়ল না, বরং দুই-একজন চলে যেতে শুরু করল। সেটা দেখে মিলিটারিগুলো হঠাৎ করে খেপে গেল। জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে হঠাৎ করে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে রাইফেল তাক করে হুংকার দিল। যারা দাঁড়িয়েছিল তারা হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায়, একজন-দুইজন তখন ভয়ে ভয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। বেশির ভাগ মানুষই অবশ্যি বাড়ির ভেতর থেকে ছোটখাটো জিনিস নিয়েই পালিয়ে গেল। কয়েকজনকে দেখা গেল খুব উৎসাহ নিয়ে লুট করতে শুরু করেছে। তাদের মাঝে একজন হচ্ছে মন্তাজ মিয়া— মন্তাজ মিয়া এই গ্রামের চোর, রাত-বিরেতে শরীরে তেল মেখে মানুষের বাড়িতে চুরি করতে যায়। প্রকাশ্য দিনের বেলায় মিলিটারির সামনে এইভাবে লুট করার সুযোগ আর কবে পাবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কাছাকাছি একটা গাছের তলায় বসে বসে পুরো দৃশ্যটুকু দেখলাম। একসময় লতিফ চেয়ারম্যান মিলিটারিদের নিয়ে চলে গেল। আমি তার পরও হিন্দুপাড়ায় বসে রইলাম। তখন একজন-দুইজন করে মানুষগুলো ভয়ে ভয়ে ফিরে আসতে লাগল। তাদের সবার মুখ রক্তশূন্য। কমবয়সীরা নিঃশব্দে কাঁদছে। একজন মহিলা আমাকে দেখে এগিয়ে এল, কাছে এসে বলল, "বাবা, তোমার জন্য আজকে আমরা বেঁচে গেলাম। তুমি নিশ্চয়ই আগের জন্মে আমার বাবা ছিলে। আমায় বাঁচাইতে আসছ। ভগবানের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি।"

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, "কাকিমা, মিলিটারি গ্রামের মানুষদের দিয়ে আপনাদের বাড়ি লুট করিয়ে নিয়েছে।"

মহিলাটি বলল, "নিক বাবা। যার যেটা ইচ্ছা নিয়া যাক। আমরা মানুষ কয়টা বাঁইচা থাকলেই হবে। আর কিছু চাই না।"

মহিলাটি চলে গেল, ছোট একটা বাচ্চা তাকে ধরে কাঁদছে। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত কি এই মানুষগুলো বেঁচে থাকতে পারবে?

আমি কি বেঁচে থাকব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫.

সেই ইলেকশনের সময় আমাদের গ্রামে এক-দুইটা মিটিং হয়েছিল, তারপর আর কোনো মিটিং হয় নাই। কয়েক দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি আমাদের গ্রামে একটা মিটিং হবে। মিটিংয়ের কথাটা বলে বেড়াচ্ছে ফালতু মতি। আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম তখন শুনেছি মতি যাকেই পাচ্ছে, তাকেই মিটিংয়ের কথা বলছে। হয়তো লোকমান গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে তাকে বলল, "এই যে লোকমান ভাই, পরশু দিন বিকালে কিন্তু মিটিং। মনে আছে তো ?"

লোকমান কিছুই জানে না চোখ কপালে তুলে বলে, "মিটিং? কিসের মিটিং।"

"খবর রাখেন না কিছু? হিন্দুস্তান দেশটারে দখল করে নিতে চাচ্ছে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না? শহর থেকে বড় নেতা আসবে। আসবেন কিন্তু।"

লোকমান মাথা নাড়ে। একটু পরে মতি ফজলু চাচাকে বলে, "চাচা, শরীরটা ভালো?"

ফজলু চাচা সন্দেহের চোখে মতির দিকে তাকায়। মতি বলে, "পরশু বিকাল বেলা জুমা ঘরের সামনে আসবেন।"

"কী হবে? শিন্নি?"

মতি মাথা নাড়ে, "না না, শিন্নি না। মিটিং।"

"কিসের মিটিং?"

"শহর থেকে বড় নেতা আসবে। তার মিটিং।"

ফজলু চাচা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। আজকাল কেউ মতির সাথে বেশি সময় কথা বলে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই দিন পর বিকেলবেলা আমি মিটিংটা দেখতে গেলাম। মানুষ খুব বেশি নাই, আমার মতো পোলাপানই বেশি। কী নিয়ে মিটিং, সেটা দেখতে এসেছে। জুমা ঘরের কাছে একটা টেবিল আর তার পেছনে দুইটা চেয়ার। একটা চেয়ারে শার্ট-প্যান্ট পরা একজন কমবয়সী মানুষ। আরেকটা চেয়ার খালি সেখানে কে বসবে বুঝতে পারলাম না। মতি ব্যস্তভাবে এদিক-সেদিক হাঁটছে, লোকজনকে ডেকে আনছে, সড়ক ধরে যারা বাড়িঘরে যাচ্ছিল তাদেরকেও জোর করে ধরে আনল। চেয়ারে যে কমবয়সী মানুষটা বসেছিল এক সময়ে সে অধৈর্য হয়ে বলল, "মতি, মিটিং শুরু করে দেও।"

আমি খুবই অবাক হলাম মতির মতো একজন ফালতু মানুষ একটা মিটিং শুরু করবে? কিন্তু দেখা গেল আসলেই ঘটনা সে রকম, মতি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল। "ভাইসব—" তারপর থেমে গেল, গলা পরিষ্কার করে আবার বলল, "ভাইসব—" তারপর আবার থেমে গেল। মনে হচ্ছে কী বলবে ভুলে গেছে। আবার গলা পরিষ্কার করে বলল, "এ্যাঁ এ্যাঁ আপনারা জানেন এ্যাঁ এ্যাঁ আমাদের প্রিয় দেশ এ্যাঁ এ্যাঁ পাকিস্তান আজ এ্যাঁ এ্যাঁ—" মতি এবারে পুরোপুরি থেমে গেল। তার মুখের রং লাল-নীল হতে লাগল, বোঝাই যাচ্ছে তার মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বের হবে না।

তখন চেয়ারে বসে থাকা মানুষটা দাঁড়িয়ে মতিকে বসে যেতে বলল আর মতি সাথে সাথে ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। মানুষটা তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে থাকে, তার অবস্থা মোটেও মতির মতো না, সে খুবই ভালো বক্তৃতা দিতে পারে। সে শুরু করল এইভাবে, "আপনারা জানেন, আমাদের প্রিয় ওয়াতান পাকিস্তান, পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্রকে হিন্দুস্থান ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে, তারা দুষ্কৃতিকারী পাঠাচ্ছে— কিন্তু আমরা তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেব। আমাদের নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম টিক্কা খানের সাথে দেখা করে তাকে বলেছেন আমরা তাদের পাশে আছি। আমি ইসলামী ছাত্রসংঘের একজন নগণ্য কর্মী আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সারা দেশে আপনাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। আপনারা জেহাদের জন্য প্রস্তুত হন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা অনেকক্ষণ কথা বলল, শেষের দিকে বলল, "আমরা পাকিস্তান মিলিটারিকে বলেছি, আমরা শুধু মুখের কথা বলতে চাই না, আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে চাই। আমাদের অস্ত্র দিন। আপনারা শুনে খুশি হবেন পাকিস্তান আর্মি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নিয়ে একটা সামরিক বাহিনী তৈরি করতে যাচ্ছে। তার নাম হচ্ছে রাজাকার বাহিনী।"

মানুষটা রাজাকার বাহিনী কথাটা অনেক জোরে উচ্চারণ করল, সে আশা করছিল সবাই সেটা শুনে আনন্দে হাততালি দেবে কিন্তু কেউ হাততালি দিল না, শুধু মতি জোরে জোরে হাততালি দিল এবং তার দেখাদেখি আর দুই-একজন একটু হাততালি দেয়ার চেষ্টা করল।

মানুষটা অবশ্যি নিরুৎসাহিত হলো না, বলল, "আপনাদের গ্রামে আমরা রাজাকার বাহিনী তৈরি করব। জওয়ান মানুষেরা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেন। আপনাদের অস্ত্র দেবে, ট্রেনিং দেবে, পোশাক দেবে মাসে মাসে বেতন দেবে। আপনারা দেশের খেদমত করবেন সাথে সাথে বেতন পাবেন। এই দেশে হিন্দুস্থানের কোনো দুষ্কৃতিকারীর জায়গা নাই। আপনারা পাকিস্তান রক্ষার জেহাদে, ইসলাম রক্ষার জেহাদে শরিক হন!"

মতি চেয়ারে বসে বসে জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল।

এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমরা দেখলাম ফালতু মতি একটা পায়জামার ওপর একটা ঢলঢলে খাকি শার্ট পরে ঘাড়ে একটা রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পেছনে পেছনে আমাদের গ্রামের আরেক ফালতু মানুষ জালাল— তাকে অবশ্য কেউই জালাল বলে ডাকে না, সবাই জালাইল্যা বলে ডাকে। সাথে আরো দুইজন আছে কিন্তু আমরা তাদের চিনি না, তারা পাশের গ্রামের মানুষ। এই তিনজনের মাঝে মতি হচ্ছে কমান্ডার।

আমরা কয়েকজন মতির পেছনে পেছনে হাঁটলাম, মতি গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে সড়ক ধরে হাঁটছিল। ফজলু চাচাকে বলল, "চাচাজি, দোয়া করবেন আমার জন্য।"

ফজলু চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের জন্য দোয়া চাও?"

"বুঝতেই পারছেন চাচাজি, দেশকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে নিছি, যুদ্ধ যদি করতে হয় আপনাদের দোয়া লাগবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি বন্দুক দিয়া গুল্লি করতে পারো?"

মতি বলল, "এইটারে বন্দুক বলে না। এইটা হচ্ছে রাইফেল।"

"গুল্লি করবার পারো?"

"কী যে বলেন চাচাজি। পুরা এক সপ্তাহ ট্রেনিং দিচ্ছে— একেবারে খাঁটি পাঞ্জাবি মিলিটারি ট্রেনিং। গুল্লি করা তো সোজা— দরকার হলে এই রাইফেল পুরাটা খুলে আবার জোড়া দিতে পারমু।"

মতি যখন কথা বলছিল তখন তার সাথে অন্য যে তিনজন ছিল তারা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। ফজলু চাচা বললেন, "একটা গুল্লি কর দেখি।"

মতি বলল, "গুল্লি করমু?"

"হ্যাঁ। আকাশের দিকে গুল্লি কর, দেখি কেমন লাগে শুনতে?"

মতি বলল, "আমাদের গুল্লি হিসাব কইরা দিছে চাচাজি। কারণ ছাড়া গুল্লি করা নিষেধ। সব গুল্লির হিসাব দিতে হয়। বুঝতেই পারেন মিলিটারি নিয়ম। তয় যদি দুষ্কৃতিকারী দেখি, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন গুল্লি করার নিয়ম আছে?"

"দুষ্কৃতিকারীটা কারা?"

"ওই তো মুক্তিবাহিনী। ইন্ডিয়ার দালাল।"

ফজলু চাচা মাথা নাড়ল, বলল, "ও।"

"ওদের সাথে যুদ্ধ করার সময় গুল্লি করা ঠিক আছে।"

"তোমরা যুদ্ধ করবা?"

মতি তার সিনা টান করে বলল, "জি চাচাজি।"

"ও।"

"আমরা প্রায় মিলিটারি চাচাজি। আমাগো নাম রাজাকার বাহিনী।"

"ও।" ফজলু চাচা আর কথা বাড়াল না।

কয়েক দিনের ভেতরেই ফালতু মতির নাম হয়ে গেল প্রথমে মতি রাজাকার, সেখান থেকে ধীরে ধীরে হলো মইত্যা রাজাকার। আমরা যারা তাকে আগে মতি ভাই ডাকতাম, এখন সামনাসামনি তাকে মতি রাজাকার আর আড়ালে মইত্যা রাজাকার ডাকি। মতি রাজাকার কিংবা মইত্যা রাজাকারের কাজ একটাই মিলিটারির পেছনে পেছনে থাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি মিলিটারি এই দেশের কিছু চেনে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজাকার বাহিনী তাদেরকে সবকিছু চিনিয়ে দেয়। আশপাশে যত গ্রামে যত হিন্দুবাড়ি আছে তার সবগুলোতে নিয়ে গেল, সেগুলো লুট করিয়ে দিল। কয়েকটাতে আগুন দিল। শুধু হিন্দু বাড়ি না, যারা আওয়ামী লীগ করে তাদের বাড়িতেও আগুন দিয়ে দিল। প্রত্যেক দিনই আমরা দেখতাম দূরে কোনো গ্রাম থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমাদের গ্রামে মাহতাব মিয়ার বাড়িতে যেদিন আগুন দিল, সেটা ছিল ভয়ংকর একটা দিন।

মাহতাব মিয়া খুবই সাদাসিধা মানুষ, বঙ্গবন্ধুর খুব ভক্ত তাই বঙ্গবন্ধুর বড় একটা ছবি নিজের বাংলাঘরে বাঁধিয়ে রেখেছিল। সেটাই হয়েছে তার অপরাধ। মতি রাজাকার মিলিটারিদের বোঝাল মাহতাব মিয়া আওয়ামী লীগ, তাই একদিন মিলিটারি নিয়ে তার বাড়ি ঘেরাও করল। মাহতাব মিয়া আগেই খবর পেয়েছিল তাই বউ-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে সরে গিয়েছিল। প্রথমে তার ঘর লুট করল, বঙ্গবন্ধুর ছবিটা উঠানে রেখে মতি রাজাকার পা দিয়ে মাড়িয়ে সেটা নষ্ট করল। মিলিটারিদের মনে হয় বঙ্গবন্ধুর ওপর খুবই রাগ। একজন মিলিটারি তার রাইফেল দিয়ে তার ছবির ওপরেই কয়েকটা গুলি করে দিল।

বাড়িতে কেমন করে আগুন দেয় সেটা আমি তখন প্রথমবার দেখলাম। প্রথমে কেরোসিন দিয়ে ঘরের চারদিকে ভিজিয়ে দেয়। তারপর খড়ের স্তূপ ঘরের ভেতরে ফেলে সেটাতেও কেরোসিন ঢেলে দেয়। তারপর বাইরে থেকে একটা খড়ের গোছায় আগুন ধরিয়ে ভেতরে ছুড়ে দেয়। দেখতে দেখতে পুরো ঘরে আগুন ধরে যায়।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখলাম কীভাবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। এত বড় আগুন আমি জন্মেও দেখি নাই। ঠাস ঠাস করে শব্দ হতে থাকে, শোঁ শোঁ করে ঝড়ের মতো বাতাস বইতে থাকে। আগুনের এত তাপ হলো যে আমাদের অনেক দূরে সরে যেতে হলো।

মাহতাব মিয়ার বাড়িতে যখন আগুন দেয়া হয় তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে কিন্তু আগুনের জন্য পুরো এলাকাটা দিনের মতো আলো হয়ে গেল। মিলিটারিগুলো রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর মতি রাজাকার তার দলবল নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ' বলে চিৎকার করে লাফাতে লাগল। আগুনের লাল আভার সামনে রাজাকারগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো ছায়া দেখে আমার মনে হলো, জাহান্নাম নিশ্চয়ই এ রকম হয়। জাহান্নামের আগুনের সামনে শয়তান নিশ্চয়ই এভাবে লাফাতে থাকে।

মিলিটারিগুলো আস্তে আস্তে আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজনদের ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল। কালী গাংয়ের তীরে দাঁড়া করিয়ে তাদের গুলি করে পানিতে ফেলে দিত। আমরা যদি কালী গাংয়ের তীরে বসে থাকি তাহলে মাঝে মাঝেই দেখি একটা-দুইটা লাশ ভেসে যাচ্ছে। অনেক কমবয়সী মেয়েমানুষের লাশও ভেসে যায়। রঙিন শাড়ি পরা একজন মেয়ের লাশ যখন ভেসে যায়, তখন সেটা দেখতে এত অদ্ভুত লাগে যে কাউকে বোঝাতে পারব না।

একদিন আমি আর মামুন কালী গাংয়ের পাড়ে বসে আছি তখন দেখলাম একটা মেয়ের লাশ ভাসতে ভাসতে আমাদের তীরে এসে লাগল। মামুন বলল, "মাটি চাচ্ছে। এই লাশটা মাটি চাচ্ছে।"

লাশ মাটি চাইলে কী করতে হয় আমরা জানি না। আমরা তো আর লাশটাকে টেনে তুলে কবর দিতে পারব না। ঠিক তখন কোথা থেকে জানি কয়েকটা কুকর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল, কুকুরগুলো একটা আরেকটার সাথে ঝগড়া করতে করতে লাশটাকে কামড়ে ওপরে তুলে আনতে লাগল। এটা নূতন শুরু হয়েছে, কুকুরগুলো মানুষের লাশ খাওয়া শিখেছে। নদীর পাড়ে এরা ঘোরাঘুরি করে, মানুষের লাশ দেখলে টেনে তীরে এনে খেতে থাকে— কী ভয়ংকর একটা দৃশ্য। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কেউ যদি আমাকে বলত যে কুকুর মানুষের লাশ খেতে থাকবে আর আমরা সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, আমি সেটা কখনোই বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন সেটা প্রত্যেক দিন চোখের সামনে হচ্ছে।

আমি মামুনকে বললাম, "আয় কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিই।"

মামুন সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বলল, "চল।"

আমরা চিৎকার করে ঢিল ছুড়ে কুকুরগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কুকুরগুলো নড়ল না বরং দাঁত বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে লাগল। জীবনেও আমি কোনো কুকুরকে এ রকম করতে দেখি নাই। নিশ্চয়ই মানুষের লাশ খেয়ে খেয়ে এগুলো এখন আর মানুষকে ভয় পায় না। বরং জীবন্ত মানুষকে দেখলে মনে করে এটা কেন লাশ হয়ে যায় না, তাহলে তো এটাকেও খেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তখন খুঁজে খুঁজে একটা লাঠি নিয়ে এসে কুকুরগুলোকে ধাওয়া করলাম। কুকুরগুলো তখন একটু সরে গেল কিন্তু একেবারে চলে গেল না, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দাঁত বের করে গরগর শব্দ করতে লাগল। আমরা লাঠি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাশটাকে নদীর দিকে ঠেলে দিলাম। একটু চেষ্টা করতেই লাশটা নদীর স্রোতে গিয়ে পড়ল, তারপর পানিতে ভেসে যেতে শুরু করল। কুকুরগুলো তীরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। আমি মামুনের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আচ্ছা মামুন, আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"কী কথা?"

"তুই কি কোনো দিন ভেবেছিলি আমাদের সামনে কুকুর মানুষের লাশ খাবে আর আমরা সেটা দেখব?"

"না।"

"তুই কি ভেবেছিলি আমরা একটা মেয়ের লাশ লাঠি দিয়ে পানিতে ঠেলে দেব?"

"না।"

"তুই কি ভেবেছিলি আমাদের কাছে মনে হবে এটা খুবই সাধারণ একটা ঘটনা?"

"না।"

AMARBOI.COM

রাত্রিবেলা যখন আমি ভাত খেতে বসেছি একবার রঙিন শাড়ি পরা মেয়েটির কথা মনে পড়ল। কে জানে সে কি নদীর পানিতে ভেসে যাচ্ছে নাকি আবার কোথাও আটকা পড়েছে আর হিংস্র কুকুর তার লাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে?

নানি আমার থালায় ভাত তুলে দিতে দিতে বলল, "কী ভাবিস?"

আমি বললাম, "কিছু না নানি।" আমি নানিকে সব কথা বলি কিন্তু আজকে এই মেয়েটার কথা বলতে ইচ্ছে করল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬.

ডোরা আমার হাতে একটা কাঁচি দিয়ে বলল, "নে।"

আগে সে আমাকে তুমি তুমি করে বলত, আজকাল তুই করে বলতে শুরু করেছে। একজন তুই বললে আরেকজনকেও তুই বলতে হয়, তাই আমিও ডোরাকে তুই করে বলি। প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হলেও আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি কাঁচিটা নিয়ে বললাম, "কেন?"

"তুই আমার চুল কেটে দিবি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী কেটে দেব?"

"চুল। চ-উকারে চু আর ল, চুল।"

"আমি কোনো দিন কারো চুল কাটি নাই। আর মেয়েদের চুল তো কাটতে হয় না, মেয়েদের চুল বড় রাখতে হয়।"

"আমি মেয়েদের মতো চুল কাটতে বলি নাই। ছেলেদের মতো চুল কাটতে বলছি।"

আমি হাঁ হয়ে বললাম, "কার মতো?"

"ছেলেদের মতো। ছ একারে ছে আর ল একারে লে, ছেলে।"

"তুই তোর চুল ছেলেদের মতো করে কাটবি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"সেটা তুই একটু পরেই দেখবি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "তোর আম্মু আর নোরা বুবু জানে?"

ডোরা বলল, "সবকিছু সবার জানার দরকার নাই।"

"তার মানে জানে না। তুই তাদেরকে না বলে ছেলেদের মতো করে চুল কাটছিস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোরা বলল, "তুই কি মনে করিস আম্মু আর আপুকে বললে তারা আমাকে ছেলেদের মতো করে চুল কাটতে দেবে?"

"তাহলে?"

ডোরা বলল, "তাহলে কী?"

"তোর চুল কেটে দিলে তোর আম্মু আর নোরা বুবু আমার ওপর রাগ হবে না?"

"তার মানে তোর এতটুকু সাহস নাই। এ রকম মুরগির বাচ্চার মতো সাহস নিয়ে তুই মুক্তিযোদ্ধা হবি?" বলে আমার হাত থেকে কেড়ে কাঁচিটা নিয়ে ডোরা ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে নিজের মাথার চুল কাটতে থাকে।

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "করছিস কী? করছিস কী?"

"ঠিকই করছি" বলে সে আবার ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে চুল কাটতে থাকে। দেখতে দেখতে ডোরার মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে কাটা পড়তে থাকে।

আমি তখন ডোরার হাত থেকে কাঁচিটা কেড়ে নিয়ে বললাম, ঠিক আছে, "ঠিক আছে, দে আমাকে দে। আমি কেটে দিই।"

আমি কেটে না দিলে সে নিজেই কেটে ফেলবে, তখন তার ভয়ংকর একটা চেহারা হবে, তাই আমার কাটাই ভালো। আমি তখন ডোরার চুল কাটতে লাগলাম। আমি যে ডোরার থেকে খুব ভালো করে কাটলাম, তা নয় কিন্তু তার পরও মোটামুটিভাবে ছেলেদের মতো চুল কাটা হলো।

ডোরা নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, "ঠিক আছে। এখন তুই বাইরে যা।"

"কোথায় যাব?"

"বাইরে। ঘরের বাইরে।"

আমরা বাংলাঘরে বসে চুল কাটাকাটি করছিলাম। আমাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলছে কেন জানি না। কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো কথা না বলে আমি ঘর থেকে বের হলাম। ডোরা দরজাটা বন্ধ করে দিল তারপর কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে বের হয়ে এল। একটু আগে যে ফ্রকটা পরছিল সেটা খুলে শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরেছে, দেখে সত্যি সত্যি তাকে একটা ছেলের মতো লাগছে। আমি অবাক হয়ে ডোরার দিকে তাকিয়ে রইলাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোরা বলল, "আমাকে চিনতে পারছিস? আমি হচ্ছি খোকন। ডোরা হচ্ছে আমার মামাতো বোন। আমি হচ্ছি ডোরার ফুপাতো ভাই। ডোরার দাদা-দাদি হচ্ছে আমার নানা-নানি। বুঝেছিস?"

আমি আসলে কিছু বুঝি নাই। কিন্তু মাথা নাড়লাম, বললাম, "বুঝেছি।"

"তাহলে চল।"

"কোথায় ?"

"গ্রাম থেকে ঘুরে আসি দেখি গ্রামের লোকজন খোকনকে চিনতে পারে নাকি।" বলে সে খালি পায়ে ঘর থেকে বের হলো। আমিও তার পিছু পিছু বের হলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই শার্ট-প্যান্ট কোথায় পেয়েছিস?"

"জোগাড় করেছি।"

"তোর আম্মু আর আপু দেখলে কী বলবে? তোর দাদা-দাদি?"

"সেটা নিয়ে তোর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আয়।"

কাজেই আমি ডোরাকে নিয়ে বের হলাম। গ্রামে মিলিটারি আসার পর ঘর থেকে মানুষজন একটু কম বের হয়, তার পরও কয়েকজনের সাথে দেখা হলো। বেশির ভাগ মানুষই ডোরাকে লক্ষ্য করল না। শুধু একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কে? আগে গেরামে দেখি নাই।"

আমি বললাম, "এর নাম খোকন। যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারা গেছেন তাঁর বোনের ছেলে।"

"ও।" বলে মানুষটা ডোরাকে জিজ্ঞেস করল, "এই গ্রামে থাকবা কয় দিন?"

ডোরা মাথা নাড়ল, বলল, "জি। আমাদের স্কুল বন্ধ ক্লাস হয় না, তাই আব্বু-আম্মু এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ডোরার গলার স্বরটা শুনেও মানুষটা কিছু সন্দেহ করল না। হেঁটে চলে গেল।

ডোরাকে যে কেউ চিনবে না সেটা একটু পরেই আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারলাম। সড়কে মতি রাজাকারের সাথে দেখা হয়ে গেল। সে তার দুইজন শাগরেদকে দিয়ে জোরে জোরে হেঁটে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম একটা পায়জামার ওপরে খাকি শার্ট পরে থাকত, এখন কোথা থেকে কালো রঙের প্যান্ট জোগাড় করেছে, পায়ে কাপড়ের জুতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেখে তীক্ষ্ণ চোখে একবার আমাকে আরেকবার ডোরাকে দেখল, তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কেডা?"

আমি বললাম, "খোকন।"

"খোকন কেডা?"

ডোরাকে চিনতে পারে নাই, আমি তখন বললাম, "ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরে মিলিটারি মেরে ফেলেছে মনে আছে?"

মতি রাজাকার অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়ল, তার প্রিয় পাকিস্তানের মিলিটারি কাউকে মেরে ফেলেছে এ রকম কথা শুনতে তার ভালো লাগে না।

আমি বললাম, "ইঞ্জিনিয়ার চাচার ছোট বোনের ছেলে। খোকন।"

"ও।" মতি রাজাকার এইবারে মাথা নাড়ল।

"ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেয়ে ডোরাকে দেখেছিলেন না?"

"হ্যাঁ।" মতি রাজাকার আবার মাথা নাড়ল।

"তার ফুপাতো ভাই।"

"ও।" মতি রাজাকার তখন শার্টের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখল, আগে তার হাতে ঘড়ি ছিল না, রাজাকার হওয়ার পর কোনো জায়গা থেকে এই ঘড়ি লুট করেছে। মতি রাজাকারের এখনো ঘড়ি দেখা অভ্যাস হয় নাই, কয়টা বাজে বুঝতে একটু সময় লাগল। বলল, "সর্বনাশ দেরি হয়ে গেছে।"

"কই যান?"

"মিলিটারি ক্যাম্পে।"

আমি বললাম, "ও।"

"ক্যাম্পে নূতন একজন মেজর সাহেব আসছেন, নাম হচ্ছে মেজর ইয়াকুব।"

আমি কোনো কথা বললাম না। মতি রাজাকার বলল, "চেহারাটা একেবারে ফিল্ম স্টারের মতো। দেখলে ট্যারা হয়ে যাবি।"

আমি কিছু বললাম না। মতি রাজাকার বলল, "অন্য মিলিটারির মতো না, কলিজা যে রকম বড়, দিলটাও সেই রকম বড়। পূর্ব পাকিস্তান বলতে পাগল, চারদিক তাকায় আর বলে, কেয়াবাত কেয়াবাত হাউ বিউটিফুল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দুইজন রাজাকার জোরে জোরে মাথা নাড়ল। একজন বলল, "একেবারে আসল খান্দানি।"

"মেজর সাহেবের সাথে আমাগো মিটিং। মেজর সাহেব আমাগো খুবই মায়া করেন।"

আমি এবারেও কোনো কথা বললাম না। মতি রাজাকার তখন তার ঘড়ি আরো একবার দেখল তারপর হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

আমি তখন বললাম, "ডোরা, তুই—"

ডোরা বলল, "ডোরা না। খোকন।"

"ঠিক আছে, খোকন, তুই পরীক্ষায় পাস। তোরে যখন মইত্যা রাজাকার চিনতে পারে নাই, আর কেউ চিনতে পারবে না।"

"আমি জানি।"

আমি তখন ডোরাকে মাহতাব মিয়ার বাড়িতে নিয়ে গেলাম, পুরো বাড়িটা পুড়ে কালো ছাই হয়ে আছে। টিনের একটা চাল একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। বাড়ির আশপাশে বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ ছিল, আগুনের তাপে গাছগুলো ঝলসে গেছে। গাছগুলোর পাতা ঝরেও গেছে, দেখেই বোঝা যায় গাছগুলো মরে গেছে। মানুষের মতো গাছও মরে যায়।

আমরা যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন কাত হয়ে থাকা টিনের চালের নিচ থেকে একটা শেয়াল বের হয়ে পেছনে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। কয়দিন আগেও যেখানে মানুষ থাকত এখন সেখানে শেয়াল থাকে।

ডোরা জিজ্ঞেস করল, "মাহতাব মিয়া এখন কোথায়?"

"জানি না। মনে হয় অন্য কোনো গ্রামে চলে গেছে।"

"সবাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে, তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম আর ঠিক তখন গুড়গুড় করে মেঘের ডাক শুনলাম। আজকাল দূর থেকে যখন গোলাগুলির শব্দ হয় সেটাকে অনেক সময় মেঘের ডাকের মতো শোনায় কিন্তু এই মেঘের ডাকটি একেবারে আসল মেঘের ডাক। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, সত্যি সত্যি আকাশ মেঘে ঢেকে আছে তার মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে।

আমি বললাম, "বৃষ্টি আসছে। চল বাড়ি যাই তাড়াতাড়ি।"

"কেন, তাড়াতাড়ি কেন?"

"বৃষ্টি হলে ভিজে যাবি না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোরা বলল, "আমি তো ভিজতেই চাই। বাড়ি গেলেই তো সবাই আমাকে বকাবকি করবে। একটু দেরি করেই যাই। বকাবকি যখন করবেই তখন ভালোমতোই করুক।"

খুবই আজব যুক্তি, কিন্তু একটা যুক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কিছু বললাম না। তাই আমরা গ্রামের সড়ক দিয়ে হেঁটে হেঁটে একেবারে হিন্দুপাড়া গেলাম। এর মাঝে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, প্রথমে টিপ টিপ করে তারপর ঝিরঝির করে সর্বশেষে ঝমঝম করে। আমি আর ডোরা বৃষ্টির পানিতে ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেলাম। শুকনো মাটি বৃষ্টির পানিতে ভিজে নরম হয়ে গেল, গাছের পাতাগুলো ধুয়ে সবুজ হয়ে গেল। চারদিকে কেমন যেন একটা তাজা তাজা ভাব।

আমি লক্ষ করলাম ডোরা একসময় বৃষ্টির পানিতে ভিজে ঠাণ্ডায় তিরতির করে কাঁপছে। আমি বললাম, "আয় বাড়ি যাই। তুই শীতে কাঁপছিস।"

ডোরা বলল, "কিছু হবে না।"

"তোর অভ্যাস নাই, পরে জ্বর উঠে যাবে।"

"উঠবে না।"

আমি তবু রাজি হলাম না, ডোরাকে নিয়ে তাদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

AMARBOI.COM

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই আমি একটা উত্তেজনা টের পেলাম। বাড়ির সবাই এই বৃষ্টির মাঝে ছাতা মাথায় দিয়ে ছোটাছুটি করছে। আমাদের দেখে ডোরার বড় বোন নোরা বুবু ছুটে এল, খোকন সেজে থাকা ডোরাকে দেখেও দেখল না, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "রঞ্জু, তুমি কি জানো ডোরা কোথায় গেছে? দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি কিছু বলার আগেই নোরা বুবু ডোরার দিকে তাকাল এবং সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, "এই তো ডোরা! তোর এ কী অবস্থা?"

নোরা বুবুর চিৎকার শুনে সবাই দৌড়ে আসে, ডোরা চুল কেটে শার্ট-প্যান্ট পরে ছেলে সেজেছে, তারপর বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে, কারো মুখ থেকে কোনো কথা বের হয় না। ডোরার আম্মু অনেকক্ষণ ডোরার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তোর কী হয়েছে ডোরা? তুই আমারে আর কত কষ্ট দিবি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোরা বলল, "তুই এত সুন্দর চুলগুলো কেমন করে কাটলি ডোরা? শার্ট-প্যান্ট পরে ছেলে সেজেছিস কেন?"

ডোরা বলল, "আমি এখন থেকে আর ডোরা না। আমি হচ্ছি খোকন। আমি আর মেয়ে না, আমি ছেলে।"

সবাই হাঁ করে ডোরার দিকে তাকিয়ে রইল।

ডোরাকে দেখে বাড়িতে যে রকম হইচই চিৎকার হবে বলে ভেবেছিলাম তার কিছুই হলো না। তাকে সবাই যেভাবে বকাবকি করবে ভেবেছিলাম, তাও করল না— তার কারণ বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে সবাই এত চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল যে এখন তাকে পেয়ে সবাই খুশি। ডোরা হিসেবে পেলেও খুশি, খোকন হিসেবে পেলেও খুশি। এই গ্রামে মিলিটারির ক্যাম্প, রাজাকাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাঝে যদি একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে চিন্তা তো করতেই পারে। সেই মেয়েটা ছেলে হয়ে ফিরে এসেছে, না মেয়ে হয়ে ফিরে এসেছে, সেটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাচ্ছে না। একটা খুবই জটিল সমস্যার এ রকম একটা সহজ সমাধান হবে, সেটা কে ভেবেছিল?

আমি ডোরাকে বাড়ির মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম। বৃষ্টিটা একটু কমে এসেছে, আকাশে এখনো কালো মেঘ, মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে আবার হয়তো বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

আমি লতিফা বুবুর বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলাম তার একটু খোঁজ নিয়ে যাই। কিন্তু খোঁজ নেয়ার জন্য ভেতরে যেতে হলো না, লতিফা বুবু নিজেই বের হয়ে এল। লতিফা বুবুর মুখটা কেমন জানি থমথম করছে। আমাকে বলল, "এই রঞ্জু, শোন। আমি তোকে কয়দিন থেকে খুঁজছি। ভালোই হলো, তোকে পেয়ে গেলাম।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে, লতিফা বুবু।"

"তুই আমাকে একটা কাজ করে দিতে পারবি?"

"কী কাজ?"

"আগে বল করে দিবি।" লতিফা বুবুর চোখ কেমন যেন ছলছল করতে থাকে।

আমি বললাম, "একশ বার করে দিব লতিফা বুবু। কী কাজ বলো।"

"বল খোদার কসম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খোদার কসম।"

"আমার গা ছুঁয়ে বল খোদার কসম।"

লতিফা বুবু তার হাতটা বাড়িয়ে দিল, আমি হাতটা ছুঁয়ে বললাম, "খোদার কসম।"

লতিফা বুবু তখন তার হাতে মুঠি করে রাখা দলামোচা এক টাকার একটা নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "তুই আমাকে এটা দিয়ে ইঁদুর মারার বিষ কিনে দিবি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ইঁদুর মারার বিষ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তোর সেটা জানার দরকার নাই। তোকে বলেছি কিনে দিতে, তুই কিনে দিবি।"

আমি লতিফা বুবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "লতিফাবু—"

"কী হয়েছে?"

"তুমি কেন ইঁদুর মারার বিষ কিনতে চাচ্ছ?"

লতিফা বুবু আমার দিকে কেমন করে জানি তাকাল, তারপর বলল, "আমি খাব।"

আমি চমকে উঠলাম। আমাদের গ্রাম দেশে মানুষ তিনভাবে আত্মহত্যা করে, হয় গলায় দড়ি দেয়, না হলে ধানক্ষেতে পোকা মারার বিষ খায়, তা না হলে ইঁদুর মারার বিষ খায়। লতিফা বুবু কেন বিষ খেতে চাচ্ছে?

আমি বললাম, "কী হয়েছে তোমার লতিফা বুবু?"

"তোর জানার দরকার নাই। তোকে বলেছি বিষ কিনে দিতে তুই বিষ কিনে দিবি। তুই কসম কেটেছিস।"

বড় মানুষও মাঝে মাঝে বোকা হয়ে যায়, লতিফা বুবুও মনে হলো সে রকম। লতিফা বুবু কেমন করে ভাবল আমি কসম খেয়েছি বলে তাকে আত্মহত্যা করার জন্য বিষ কিনে দেব? কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করার সময় না— তাই আমি সেটা নিয়ে কোনো কথা বললাম না। আমি লতিফা বুবুর হাত ধরে বললাম, "তোমার কী হয়েছে লতিফা বুবু? বলবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লতিফা বুবুর চোখ দুইটা কেমন যেন জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "হারামজাদা মইত্যা রাজাকার আমারে বিয়া করবার চায়।"

মামুন এই কথাটা আমাকে অনেক দিন আগেই বলেছে, আমি সেটা জানি কিন্তু এমন ভান করলাম যে আমি এই প্রথম শুনলাম। চোখ কপালে তুলে বললাম, "কী বলছ তুমি লতিফা বুবু।"

"হ্যাঁ। এই হারামজাদার কত বড় সাহস সে আমারে বলে তাকে বিয়া করতে। বলে বিয়া না করলে—"

"বিয়া না করলে কী?"

"থাক তোর শোনার দরকার নাই।"

"বলো।"

লতিফা বুবু নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মইত্যা রাজাকার আমারে বলে আমি যদি তারে বিয়া না করি তাহলে সে নাকি আমারে ধইরা মিলিটারি ক্যাম্পে দিয়া আসব। কত বড় সাহস হারামজাদার।"

আমি কিছু বললাম না, বড়রা এ রকম একটা বিষয় নিয়ে আজকাল কথা বলে আমাদের মতো ছোটদের দেখলেই থেমে যায়। চারপাশের কমবয়সী মেয়েরা আরো দূরের গ্রামে চলে যাচ্ছে, যাদের বিয়ে হয় নাই তারা বিয়ে করে ফেলছে।

লতিফা বুবু বলল, "মইত্যা রাজাকার খালি আমারে কয় নাই, বাবারেও কইছে। বাবা অনেক ভয় পাইছে, মনে হয় সত্যি সত্যি আমারে মইত্যা রাজাকারের সাথে বিয়া দিয়া দেব। যদি আসলেই বিয়া দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে আমি বিষ খামু। খোদার কসম।"

লতিফা বুবুর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে লাগল। দেখে বুঝতে পারলাম সত্যি সত্যি দরকার হলে লতিফা বুবু বিষ খেয়ে ফেলবে।

লতিফা বুবু আমার হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "যা, এক্ষুনি যা। ইন্দুর মারার বিষ কিনে দে।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। লতিফা বুবুর টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আমার এত মন খারাপ হলো যে সেটা বলার মতো না। যতই দিন যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। আমাদের গ্রামে এখন কোনো হিন্দু নাই। আওয়ামী লীগ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রকমও কেউ নাই। মতি রাজাকার মিলিটারির দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। মিলিটারি মানুষ মেরে কালী গাংয়ে ফেলে দেয়, বাড়িতে আগুন দেয়। কমবয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। কয়েক দিন পরে তাদের লাশও কালী গাংয়ে ভেসে ওঠে। কী হবে চিন্তা করে কূল-কিনারা পাই না। শুধু মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে গোলাগুলির শব্দ আসে, তখন বুঝতে পারি মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করছে। কখন মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রামে এসে এই ক্যাম্পটা দখল করবে? কখন আমরা শান্তিতে ঘুমাব?

এখন তার সাথে যোগ হয়েছে লতিফা বুবুর ব্যাপারটা, পকেটে তার দলামোচা টাকার নোটটা কেমন যেন গরম কয়লার মতো জ্বলছে। আমি কী করব এখন? আসলেই লতিফা বুবুকে ইঁদুর মারার বিষ কিনে দেব?

আমি তখনও জানতাম না এই সমস্যাটা খুব তাড়াতাড়ি এমনভাবে মিটে যাবে, যেটা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.

মিলিটারিরা মানুষ মারার জন্য কিংবা গ্রাম জ্বালানোর জন্য যেখানেই যাক না কেন তারা অন্ধকার হবার আগে ফিরে আসে। আমি আর মামুন কালী গাংয়ের পাড়ে বসে দেখছিলাম মিলিটারিগুলো কোনো একটা গ্রামে সর্বনাশ করে ফিরে এসে সারি বেঁধে আমাদের স্কুলে ঢুকে গেল। মতি রাজাকার আর তার দলও তাদের লুট করা মালপত্রের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে নিজেদের বাড়িতে রওনা দিল।

তখন একটা খুবই বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ধানক্ষেতের কাদার ওপর দিয়ে ছপাত ছপাত করে হেঁটে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা কিছু মানুষ আসছে। তাদের কাঁধে রাইফেল, বুকের মাঝে গুলির বেল্ট। মাথার মাঝে গামছা বাঁধা। দেখেই বুঝতে পারলাম এরা মুক্তিযোদ্ধা। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম— এরা কি মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করতে আসছে? এখন? এভাবে?

মুক্তিযোদ্ধার দলটা কোনো দিকে তাকাল না, ধান ক্ষেত থেকে সড়কে উঠে আমাদের সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল। তারা হেঁটে হেঁটে একেবারে কালী গাংয়ের তীরে এল। তারপর ডান দিকে ঘুরে বলাই কাকুর চায়ের স্টলের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কালী গাংয়ের তীর ঘেঁষে জংলা জায়গাটার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম আজকে এখানে তাদের যুদ্ধ করার পরিকল্পনা নেই, এরা কোথাও যাচ্ছে। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম কারণ দেখতে পেলাম মুক্তিযোদ্ধারা আসছে তো আসছেই, মনে হচ্ছে তাদের কোনো শেষ নেই। প্রথম প্রথম তাদের কাছে ছিল রাইফেল পরের দিকে যারা আসতে লাগল তাদের কাছে আরো ভারী ভারী অস্ত্র, নানা রকম মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড লঞ্চার— আমরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটল, আমরা মাসুদ ভাইকে দেখলাম। প্রথমে চিনতে পারিনি কারণ চুল লম্বা হয়ে গেছে, মুখে দাড়ি গজিয়ে গেছে। মাসুদ ভাই আলগোছে একটা স্টেনগান ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে। তাঁর ঠিক পেছনে দুইজন, মনে হলো মাসুদ ভাইয়ের বডিগার্ড।

এতক্ষণ কেউ থামে নাই সবাই হেঁটে হেঁটে চলে গেছে কিন্তু মাসুদ ভাই বলাই কাকুর চায়ের স্টলে থামল। একটা চেয়ার বাইরে নিয়ে এসে সেখানে আরাম করে বসল। তার দুইজন বডিগার্ড স্টলের দুই পাশে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাসুদ ভাই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। আমরা সবাই তখন মাসুদ ভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি, মাসুদ ভাই আমাদের সবার দিকে তাকাল কিন্তু কারো সাথে একটা কথাও বলল না। এমন কি আমাদের চিনতে পেরেছে সে রকমও কোনো ভাব দেখাল না। সিগারেট টানতে টানতে প্রথম কথা বলল, সুলেমান নামের যে মানুষটা বলাই কাকুর চায়ের স্টল দখল করেছে তার সাথে। তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম সুলেমান?"

সুলেমানের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কোনো মতে সে মাথা নাড়ল।

"তুমি নাকি মতি রাজাকারের মামু? সত্যি নাকি?"

সুলেমানের হাত তখন কাঁপতে শুরু করেছে, কোনোমতে আবার মাথা নাড়ল।

"এই স্টলটা দখল করার জন্য বলাই কাকুরে মিলিটারি দিয়ে মার্ডার করিয়েছ, নাকি বলাই কাকু মার্ডার হয়েছে বলে এটা দখল করেছ?"

সুলেমান এইবার প্রথম কথা বলল, "আমি দখল করতে চাই নাই, আল্লাহ্‌র কসম। দুলাভাই কইল—"

"দুলাভাইটা কে? লতিফ চেয়ারম্যান?"

"জে। দুলাভাই কইল, বলাইয়ের এত সুন্দর স্টলটা মানুষ লুটেপুটে নেবে, তার থেকে চায়ের স্টলটা তুমি চালাও।"

"ও।" মাসুদ ভাই সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, "চায়ের স্টল চলে? নাকি মিলিটারিদের ফ্রি চা খাওয়াও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাসুদ ভাই স্টলের ভেতরে তাকাল, তখন ফ্রেম করে রাখা ইয়াহিয়া খানের ছবিটা তাঁর চোখে পড়ল। মাসুদ ভাই বলল, "ইয়াহিয়া খানের ছবিটা কে লাগিয়েছে? তুমি?"

সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাসুদ ভাই বলল, "এই মানুষটা দেশের কত মানুষকে মেরেছে তুমি জানো?"

সুলেমান কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই বলল, "তোমারে কেউ কিছু বলে নাই, কোনো জোর করে নাই আর তুমি ইয়াহিয়া খানের মতো একটা মানুষের ছবি বলাই কাকুর চায়ের স্টলে ঝুলিয়ে দিলে। কাজটা ঠিক হলো?"

সুলেমান মাথা নেড়ে জানাল, কাজটা ঠিক হয় নাই। মাসুদ ভাই বলল, "ছবিটা নামাও।"

সুলেমান কাঁপতে কাঁপতে ছবিটা নামাল। মাসুদ ভাই বলল, "আমার সামনে রাখো।"

সুলেমান তাঁর সামনে রাখল। মাসুদ ভাই তখন পা দিয়ে মাড়িয়ে ফ্রেমের কাচটা ভেঙে ফেলল। তারপর লাথি দিয়ে ফ্রেমটা সুলেমানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভেতর থেকে ছবিটা বের কর।"

সুলেমান ছবিটা বের করল। মাসুদ ভাই বলল, "এখন এটা ছিঁড়ে চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও।"

সুলেমান কথাটা বুঝতে পারল না, হাঁ করে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মাসুদ ভাই এবার ধমক দিয়ে বলল, "কথা কানে যায় না? বললাম না ছবিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও। খেয়ে আমাকে বল এর টেস্ট কেমন।"

সুলেমান ধমক শুনে কেঁপে উঠল, তারপর সত্যি সত্যি ছবিটার একটু খানিক ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চিবুতে লাগল। দৃশ্যটা দেখে আমাদের এত হাসি পেল যে বলার নয়, সত্যি সত্যি আমরা হেসে ফেললাম আর আমাদের হাসি শুনে অন্যেরাও হাসতে শুরু করল।

মাসুদ ভাই সত্যি সত্যি সুলেমানকে দিয়ে পুরো ছবিটা খাওয়াত কি না আমরা সেটা দেখতে পেলাম না। কারণ ঠিক তখন দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মতি রাজাকারকে ধরে মাসুদ ভাইয়ের কাছে নিয়ে এল। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "এই রাজাকার লুকিয়ে মিলিটারির ক্যাম্পে যাচ্ছিল খবর দিতে!"

মাসুদ ভাই বলল, "তুমি যেতে দিলে না কেন? তুমি কি মনে করো খবর পেলেও মিলিটারি এখন বের হতো? কখনো না। এরা অন্ধকারে বের হয় না। এদের সব বীরত্ব দিনের বেলা পাবলিকের সাথে!" মাসুদ ভাই মতি রাজাকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রাজাকার সাহেব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার কি মনে হয় আপনার মিলিটারি বাবারা যদি খবর পায় আমরা এখানে বসে আছি তাহলে তারা বের হবে? এই সাহস আছে?"

মতি রাজাকার কোনো কথা বলল না, কী রকম জানি ফ্যাকাসে মুখে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মাসুদ ভাই কিছুক্ষণ মতি রাজাকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, "তুমি মইত্যা রাজাকার না?"

মতি রাজাকার কেমন যেন ভয় পেয়ে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই এবারে স্টেনগানটা কোলের ওপর থেকে হাতে নিল, সাথে সাথে মতি রাজাকার মাথা নাড়তে থাকল।

মাসুদ ভাই বলল, "আজকে কী কী লুট করেছ দেখাবে?"

মতি রাজাকার তার পোঁটলাটা ধরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা টান দিয়ে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে সবকিছু মাটিতে ঢেলে দিল, কয়েকটা ঘড়ি, একটা ট্রানজিস্টর রেডিও, বিছানার চাদর, কয়েকটা শাড়ি, কাঁসার থালাবাসন কিছু খুচরা টাকা বের হলো। মাসুদ ভাই সেগুলো দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়ল, জিজ্ঞেস করল, "এই? কোনো সোনাদানা পাও নাই?"

মতি রাজাকার কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই তখন হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল, হাত দিয়ে তাঁর গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমি আসলে তোমাকে খুঁজছিলাম। খবর পেয়েছি তুমি নাকি গ্রামে গ্রামে খুব উৎপাত করো। কমবয়সী মেয়ে-ছেলেদের দিকে নজর? সত্যি নাকি?"

মতি রাজাকার মাথা নেড়ে জানাল যে এটা সত্যি না। মাসুদ ভাই বলল, "ঠিক আছে তাহলে এখানেই বিচার হয়ে যাক। এই যে সব গ্রামের মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি। তারা যদি বলে তুমি নির্দোষ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি তোমার লুটের মাল নিয়ে বাড়ি যাবা। রাজি?"

মতি রাজাকার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই তখন একটা ধমক দিল, "কী হলো? কথা বলো না কেন?"

মতি রাজাকার ধমক খেয়ে চমকে উঠে বলল, "আপনার পা ধরি আমারে মাফ করে দেন। এই কান ধরে বলছি আর জীবনে কাউরে কিছু করব না। আল্লাহর কসম।" কথা বলতে বলতে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ভুল করে ফেলেছি, আর করব না। আজ থেকে আমি জয় বাংলা হয়ে যামু, খোদার কসম বলছি। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারির লগে থাকমু না গ্রামের মানুষরে কোনো উৎপাত করমুনা, সবার সামনে কথা দিতেছি—"

মাসুদ ভাই হাত তুলে বলল, "থামো। খামোখা কান্দাকাটি করো না। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি আবার রাজাকার হয়ে যাবে, আমি জানি। বলাই কাকুরে তোমরা যেভাবে মেরেছ, তোমাকে সেই ভাবে মারলে তোমার আর রাজাকার হওয়ার উপায় থাকবে না। বুঝেছ?"

মতি রাজাকার হঠাৎ ছুটে এসে মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে সেখানে মাথা ঘষতে ঘষতে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম লাগে আমারে মাফ করে দেন। আর জীবনে বেইমানি করমু না, আজ থেকে আমি জয় বাংলা, পাকিস্তানের মুখে জুতা মারি..."

মাসুদ ভাই পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মতি রাজাকারকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "থামো। কান্নাকাটি করো না, তোমাকে মারতে হলে আমার একটা গুলি খরচ হবে, আমি তোমার জন্য একটা গুলি নষ্ট করতে রাজি না। আমাদের অস্ত্রপাতি অনেক সাবধানে খরচ করতে হয়।"

মতি রাজাকার মাথা তুলে বলল, "তাহলে আমারে মাফ করে দিলেন?"

"না, মাফ করি নাই। কিন্তু তোমারে একটা সুযোগ দিলাম। তুমি যদি আর মানুষের উৎপাত করো, মেয়েদের দিকে নজর দাও তাহলে তোমারে আমি শেষ করে দেব। গুলি যদি একটা নষ্ট করতে হয়, তাও নষ্ট করব। মনে থাকবে?"

মতি রাজাকার মাথা নাড়ল, বলল, "মনে থাকবে।"

"আর তোমাকে আরো একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কী কাজ?"

"তোমার বাবা যে মিলিটারিরা আছে তাদেরকে বলবা আমরা আসতেছি। যদি তারা বাপের বেটা হয় তাহলে যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করে। গ্রামের নিরীহ মানুষজনকে ধরে লাইন করে গুলি করার মাঝে কোনো বীরত্ব নাই। বুঝেছ?"

মতি রাজাকার মাথা নাড়ল। মাসুদ ভাই বলল, "তোমাদের একজন নূতন মেজর আসছে না? কী যেন নাম ইয়াকুব না বিয়াকুব?"

"মেজর ইয়াকুব।"

"তারে আমার নাম বলবা। আমার নাম জানো?"

মতি রাজাকার মাথা নাড়ল, "জানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না জানলে চ্যাংড়া মাস্টারও বলতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। তোমার মেজরকে বলবা আমি আমার বিচ্ছুদেরকে নিয়া আসতেছি। সে যেন প্রস্তুত থাকে। বলবা তো?"

মতি রাজাকার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাসুদ ভাই দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল, বাইরে আবছা অন্ধকার, তার মাঝে এখনো মুক্তিযোদ্ধার দল হেঁটে যাচ্ছে। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তখন হঠাৎ একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল, আমার মনে হলো এই মুক্তিযোদ্ধাটাকে একটু আগে আমি হেঁটে যেতে দেখেছি। এখন আবার যাচ্ছে, কী আশ্চর্য! একজন মানুষ দুইবার যায় কেমন করে?

মাসুদ ভাই মতি রাজাকারকে বলল, "তুমি যাও। বিদায় হও। যাওয়ার আগে তোমার লুটের মাল নিয়ে দাও।" মতি রাজাকার তার পোঁটলাটার ভেতরে লুট করা জিনিসগুলো ভরে মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল। প্রথমে আস্তে আস্তে হাঁটল, তারপর দৌড়াতে লাগল।

আমরা যারা মাসুদ ভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম তাদের দিকে তাকিয়ে মাসুদ ভাই বলল, "আপনারা এখন বাড়ি যান। কেউ আমার সাথে কথা বলবেন না। কথা বললেই সেটা মিলিটারির কানে পৌঁছাবে, আপনাদের বিপদ হবে। আপনারা চিন্তা করবেন না। আগে ভাবতাম দেশ স্বাধীন করতে নয়-দশ বছর যুদ্ধ করতে হবে, এখন আমি জানি ছয় মাসের মাঝে দেশ স্বাধীন হবে। ইনশা আল্লাহ।"

তারপর মাসুদ ভাই তার দুইজন বডিগার্ড নিয়ে অন্যদের সাথে হাঁটতে শুরু করল, আমিও তাঁর পিছু নিলাম। কালী গাংয়ের তীর ঘেঁষে বেশ খানিকটা যাবার পর আমি বললাম, "মাসুদ ভাই।"

"কী ব্যাপার রঞ্জু?"

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"এখন আশপাশে কেউ নাই, জিজ্ঞেস করতে পারো।"

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দুইবার হেঁটে যেতে দেখলাম—"

মাসুদ ভাই হা হা করে হেসে উঠল, সাথে সাথে অন্যরাও হাসতে শুরু করল। হাঁটা থামিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাসেন কেন মাসুদ ভাই?"

মাসুদ ভাই আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, "রঞ্জু, তোমার বুদ্ধি আছে! আর কেউ বুঝতে পারে নাই, খালি তুমি বুঝতে পেরেছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী বুঝতে পেরেছি?"

"আজকে আমরা এসেছি সবাইকে ধোঁকা দিতে।"

"ধোঁকা দিতে?"

"হ্যাঁ। আমরা দেখলাম মিলিটারি রাজাকার মিলে খুব বেশি উৎপাত শুরু করেছে তাই আজকে তাদের একটু ভয় দেখালাম।"

"ভয় দেখালেন?"

"হ্যাঁ। আমরা জঙ্গলের ভিতরে ক্যাম্প করেছি। সেখানে আমাদের প্রায় চল্লিশজনের মতো মুক্তিযোদ্ধা আছে, তারাই এখানে পাক খাচ্ছে। জঙ্গল থেকে বের হয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে অন্য মাথায় ঢুকে যায়। তারপর জঙ্গল দিয়ে আগের জায়গায় এসে আবার রওনা দেয়! এই ভাবে চল্লিশজন এক ঘণ্টা থেকে পাক খাচ্ছে— সবাই ভাবছে শত শত মুক্তিযোদ্ধা! খালি তুমি ধরতে পেরেছ। অন্ধকারের মাঝে তুমি দেখলে কেমন করে?"

"তাহলে আসলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা নাই?"

"আছে আছে। সবাই ট্রেনিং নিচ্ছে, বর্ষার জন্য অপেক্ষা করছিল। বর্ষা শুরু হয়েছে— এখন এক লাখের বেশি মুক্তিযোদ্ধা নামবে। তারা আসছে। অস্ত্র নিয়ে আসছে।"

"অস্ত্র তো আছে আপনাদের! কত অস্ত্র!"

মাসুদ ভাই আবার হা হা করে হাসল, হেসে বলল, "আর এক মাসের মাঝে আরো অস্ত্র এসে যাবে। কিন্তু এক মাস অপেক্ষা করলে এই এলাকার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। মিলিটারি যেন ক্যাম্প থেকে বের না হয় সে জন্য এখনই একটা মহড়া দিলাম। এইগুলো আসল অস্ত্র না। বাঁশ দিয়ে কাঠ দিয়ে বানিয়ে আলকাতরা দিয়ে রং করে দিয়েছি।"

একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে একটা ভারী অস্ত্র হাতে নিতে দিল, হাতে নিয়ে টের পেলাম অস্ত্রটা একেবারেই ভারী না, বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি, ওপরে আলকাতরা। আবছা অন্ধকারে সত্যি না মিথ্যা বোঝার উপায় নাই।

আমার একটু মন খারাপ হলো, আমি ভেবেছিলাম শত শত মুক্তিযোদ্ধা অনেক রকম অস্ত্র। আসলে মাত্র চল্লিশজন মুক্তিযোদ্ধা, অল্প কয়টা অস্ত্র। কিন্তু আমি মন খারাপটা প্রকাশ করলাম না। মাসুদ ভাই বলল, "যাও, বাড়ি যাও। আর তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, তুমি কাউকে বলবে না আজকে কেমন একটা ধোঁকা দিলাম।

"না, বলব না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে আপনাদের সাথে নেবেন?"

"তুমি তো আমাদের সাথেই আছ। তুমি আমাদের মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা তা না হলে আমাদের এত বড় একটা গোপন কথা তোমাকে কেমন করে বললাম।"

"আমি আসল মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই। বিশ্বাস করেন, আমি পারব।"

"আমি জানি, তুমি পারবে।"

"আগে বলেছিলেন নয়-দশ বছর লাগবে, আমি ভেবেছিলাম তত দিনে বড় হয়ে যাব। এখন বলছেন মাত্র ছয় মাস—"

"রঞ্জু, যদি সত্যি সত্যি ছয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়ে যায় তাহলেও তুমি সুযোগ পাবে। তুমি তোমার চোখের সামনে দেখবে। তুমি ইতিহাসের অংশ হবে।"

মাসুদ ভাই এখন অনেক ভালো ভালো কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমাকে আসলে নেবে না, সে জন্য এত ভালো ভালো কথা বলছে! আমার এত মন খারাপ হলো যে চোখে পানি এসে গেল। অন্ধকার বলে মাসুদ ভাই দেখতে পেল না।

আমি একা একা কালী গাংয়ের তীর ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম।

মাসুদ ভাই ঠিকই বলেছিল, মুক্তিবাহিনীর এই মহড়ার পর মিলিটারির খুব দরকার না হলে ক্যাম্প থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাজাকারদের উৎপাতও কমে গেল। মাসুদ ভাই মতি রাজাকারকে এমন ভয় দেখিয়েছিল, যে সে একেবারে সিধে হয়ে গেল। তার রাইফেলটা মুক্তিবাহিনীরা নিয়ে গিয়েছিল বলে মিলিটারিরা তাকে আরেকটা রাইফেল দিয়েছে (তার আগে শুনেছি মিলিটারি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে!) এখন সে খুবই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এতজন মানুষের সামনে মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে মাফ চেয়ে কোনোভাবে জান বাঁচিয়েছে সেটার জন্য তার খুব বেইজ্জতি হয়েছে। লতিফা বুবুকে বিয়ে করার চিন্তা এখন তার মাথায় নাই, মুখ দেখানোর উপায় নাই, বিয়ে করার চিন্তা করে কেমন করে?

আমি লতিফা বুবুকে তার ইঁদুর মারার বিষ কিনে দেয়ার টাকা ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। লতিফা বুবু নেয় নাই, বলেছে, "এটা তোর। তুই জিলাপি কিনে খাস।"

এক টাকার জিলাপি আমি একা খেয়ে শেষ করতে পারব মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.

কয়দিন থেকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। এত বৃষ্টি যে মনে হচ্ছে আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ছে। অন্য সময় এত বৃষ্টি হলে আমার মনে হয় একটু মেজাজ খারাপ হতো, এইবারে তা হচ্ছে না। বৃষ্টি মানেই পাকিস্তান মিলিটারির সমস্যা, বৃষ্টি মানেই মুক্তিবাহিনীদের সুবিধা। মুক্তিবাহিনীদের অস্ত্র নৌকা করে আনে, বর্ষার সময় নদীতে যখন অনেক পানি থাকে তখন অস্ত্র আনা-নেয়ার অনেক সুবিধা।

আমি আর ডোরা মাঝে মাঝেই বৃষ্টির মাঝে বের হই। ডোরাকে অবশ্য এখন ডোরা না ডেকে খোকন ডাকাই ভালো, কারণ সে সত্যি সত্যি চুল ছোট করে শার্ট-প্যান্ট পরে খোকন হয়ে গেছে। বাড়ির কয়েকজন ছাড়া অন্যরা তাকে খোকন বলেই জানে! বের হওয়ায় সময় হাতে একটা ছাতা থাকে। একটু পরেই ছাতা গুটিয়ে আমরা বৃষ্টিতে ভিজি। বৃষ্টিতে ভিজতে অবশ্যি ডোরার আগ্রহই বেশি। শহরে থাকে বলে আগে এ রকম বৃষ্টিতে ভিজে ছপছপ করে কাদার ভেতর দিয়ে কখনো হাঁটেনি। তা ছাড়া এগুলো সব হচ্ছে ডোরার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং! সে এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করে সে মুক্তিবাহিনীতে যাবে।

সেদিন মুক্তিবাহিনীর দল গ্রামের ভেতর দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল তখন সে খবর পায়নি বলে নিজের চোখে দেখতে পায়নি, সেটা নিয়ে তার আফসোসের সীমা নাই। তার সবচেয়ে দুঃখ যে সুলেমান আর মতি রাজাকারকে কীভাবে মাসুদ ভাই একটা উচিত শিক্ষা দিয়েছে, সেটা সে নিজের চোখে দেখতে পারল না। তাই যখনই ডোবার সাথে আমার দেখা হয় আমার পুরো গল্পটা বলতে হয়। আমি গল্পটাতে অনেক রংচং লাগিয়ে বলি আর সেটা শুনে ডোরা হাসতে হাসতে মারা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকেও আবার পুরো গল্পটা বলতে হলো, ডোরা তখন জিজ্ঞেস করল, "সুলেমান কি পুরো ইয়াহিয়া খানের ছবিটা খেয়ে শেষ করেছিল?"

ঠিক তখন মতি রাজাকারকে ধরে এনেছিল বলে কেউ সুলেমানের দিকে নজর দেয়নি তাই কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি কিন্তু আমি সেটা বলে গল্পের মজা নষ্ট করলাম না। আমি বললাম, "শেষ করে নাই মানে! পুরো ছবিটা খেয়ে পেছনের কার্ডবোর্ডটা খেয়েছে, তারপর ছবির ফ্রেমটা চাবাতে শুরু করেছিল।"

"আর মতি রাজাকার? মতি রাজাকার মাসুদ ভাইয়ের পা ধরে কী করল?"

আমি তখন বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বললাম, "পুরো জুতোর তলাটা চেটে চেটে পরিষ্কার করল।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি! মাসুদ ভাই কত কাদা গোবর মাড়িয়ে এসেছে, জুতার নিচে কত ময়লা সব চেটে খেয়ে ফেলল!"

ডোরা বলল, "ইয়াক থু!" তারপর হি হি করে হাসতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজে কাদার ওপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে আমরা কালী গাং পর্যন্ত গেলাম। কালী গাংয়ে অনেক পানি এসেছে, ঘোলা পানিতে অনেক স্রোত, পানি পাক খেতে খেতে যাচ্ছে, দেখলে একটু ভয় ভয় করে। আমার বাবা আর মা মনে হয় এ রকম একটা স্রোতের মাঝে নৌকা ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

আমরা অনেকক্ষণ কালী গাংয়ের তীরে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যখনই একটা নৌকা যাচ্ছিল তখনই আমরা বলছিলাম, এইটা নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীর নৌকা! কিংবা এইটাতে বোঝাই করে নিশ্চয়ই অস্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছে। তারপর কী কী অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর নাম বলতে শুরু করলাম। আমি একটার নাম বললাম তখন ডোরা আরেকটার নাম বলল। এইভাবে দুইজনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান, এসএলআর, গ্রেনেড, মর্টার এই সব শেষ হয়ে গেলে আমি বললাম "কিল!"

ডোরা বলল, "কিল কি আবার অস্ত্র নাকি?"

"একশবার অস্ত্র। একটা মিলিটারিকে ধরে আনলে সবাই কিলিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে।" ডোরা হাসতে হাসতে রাজি হয়ে গেল। তারপর বলল, "ঘুষি।"

আমি বললাম, "চড়।"

ডোরা বলল, "থাপ্পর।"

"খামছি।"

"চিমটি।" এভাবে বলতেই থাকল আর আমরা বোকার মতো হাসতেই থাকলাম।

যখন বৃষ্টিটা কমছে তখন আমি আর ডোরা বাড়ি ফিরে যেতে শুরু করলাম। ডোরা হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই আমাকে একটা কথা দে।"

"কী কথা।"

"আগে বল আমার কথাটা রাখবি।"

"কথাটা আগে শুনি।"

ডোরা মাথা নাড়ল। বলল, "না, আগে কথা দে।"

"ঠিক আছে কথা দিলাম। এখন বল কী কথা।"

ডোরা মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুই আমাকে ছাড়া কখনো একা একা মুক্তিবাহিনীতে যাবি না।"

আমি শব্দ করে হাসলাম, বললাম, "মুক্তিবাহিনী কি আমাকে নেবে? যখনই মাসুদ ভাইকে বলি তখনই মাসুদ ভাই বলে তুমি ছোট, তুমি ছোট।"

ডোরা হাসল না, মুখ শক্ত করে বলল, "আমি সেটা জানি না। কিন্তু তুই কথা দে, আমাকে না নিয়ে তুই একা কখনো মুক্তিবাহিনীতে যাবি না।"

আমি বললাম, "কথা দিলাম।"

"আমাকে ছুয়ে কথা দে।"

আমি ডোরার হাত ছুঁয়ে বললাম, "কথা দিলাম।"

ডোরাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন যাচ্ছি তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সড়ক ধরে মিলিটারি আর রাজাকারের একটা দল আসছে। আমার বুকটা ধক করে উঠল। আমি সড়ক থেকে সরে পাশে এসে দাঁড়ালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি কমেছে বলে অনেকেই কাজকর্ম করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে, সড়কে কিছু লোকজন ছিল তারা সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে সড়ক থেকে সরে রাজাকার আর মিলিটারিদের যাবার জায়গা করে দিল।

কিছু মানুষকে দেখে মিলিটারিগুলো দাঁড়িয়ে গেল, তখন আমি একজনকে আলাদাভাবে লক্ষ্য করলাম। সে নিশ্চয়ই মেজর ইয়াকুব, কারণ অন্যেরা তার থেকে একটু পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। মেজর ইয়াকুব মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস করলে, "কেয়া হাল হায়? আচ্ছে হোনা?"

মানুষগুলো মাথা নাড়ল।

"তোম কেয়া মুক্তি হো? না কেয়া পাকিস্তানি হো?"

আমাদের গ্রামের মানুষেরা উর্দু জানে না কিন্তু প্রশ্নটা ঠিকই বুঝতে পারল। জিজ্ঞেস করছে তারা কি মুক্তিবাহিনীর পক্ষে, নাকি পাকিস্তানের পক্ষে। মানুষগুলো বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, যার অর্থ যা কিছু হতে পারে। মেজর ইয়াকুব তখন বলল, "বোলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

মানুষগুলো অস্পষ্ট স্বরে বলল, "পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

মেজর ইয়াকুব তখন খুব খুশি হয়ে তার দলবল নিয়ে হাঁটতে থাকে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে কোনো পাত্তা না দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু মেজর ইয়াকুব হঠাৎ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেরা বেটা, তোম ক্যায়সা হো।"

আমি কেমন আছি জানতে চাচ্ছে। ছোট হওয়ার একটা সুবিধা আছে, কিছু বুঝি নাই এ রকম ভান করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা যায়। আমি তা-ই করলাম, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

মেজর ইয়াকুব বলল, "কেয়া! তোম মুক্তি হায় না?"

বলা উচিত ছিল তোমরা কয়জন ছাড়া এই দেশের সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু এটা তো আর বলা যায় না। তাই চুপ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মেজর ইয়াকুব তখন বলল, "বেটা, বোলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

এই কথাটা বুঝতে পারি নাই সেটা ভান করে লাভ নাই। যে কেউ এই কথাটা বুঝবে। কিন্তু আমি কেমন করে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলি? বুঝে হোক না বুঝে হোক আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেজর ইয়াকুব কেমন জানি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর নরম গলায় বলল, "বোলো বেটা।"

আমি বললাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বোলো। বোলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

আমার মাথায় কী হলো আমি জানি না, আমি চুপ করে রইলাম, শুধু যে চুপ করে রইলাম তা না, আমি সোজা মেজর ইয়াকুবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি দেখলাম, মেজর ইয়াকুবের চোখ ধক ধক করে জ্বলে উঠল। একটা রাজাকার রাইফেলের বাঁট দিকে দিয়ে আমাকে মারার জন্য এগিয়ে এল। মেজর ইয়াকুব হাত বাড়িয়ে তাকে থামাল, নিচু গলায় বলল, "ছোড় দো। লেট ইট গো।"

তারপর পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে লজেন্সটা নিলাম। মেজর ইয়াকুব একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করল। রাজাকার আর মিলিটারিগুলো আমার সামনে থেকে একটু সরে যেতেই আমি লজেন্সটা সড়কের নিচে ছুড়ে ফেলে দিলাম। পাকিস্তানি মিলিটারির হাতের লজেন্স খাওয়ার আগে আমার মরে যাওয়া ভালো।

পরদিন দুপুরবেলা রাজাকারের একটা দল আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল। নানি কিছুতেই নিতে দেবে না, চিৎকার করে আমাকে শক্ত করে ধরে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু রাজাকাররা ধাক্কা দিয়ে নানিকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে টেনে নিতে লাগল।

আমাকে যখন টেনে সড়ক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন নানি চিৎকার করতে করতে বিলাপ করে আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসছিল, একসময় গ্রামের লোকজন তাকে ধরে সরিয়ে নিয়েছে। গ্রামের অনেক মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি লতিফা বুবুকেও দেখলাম। ডোরা নিশ্চয়ই খবর পায় নাই, তাই তাকে দেখলাম না। গ্রামের একজন মুরব্বি রাজাকারদের থামিয়ে আমাকে ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করল, বলল, "বাবারা, এই মাসুম বাচ্চাটারে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছ?"

"মেজর সাহেবের অর্ডার।"

"গিয়া বল, পোলাটা বাড়িতে নাই। খুঁজে পাও নাই।"

"না না, মিছা কথা বলা যাবে না।"

"বাবা, এই ক্যাম্পে যারা ঢুকে তারা তো কখনো জ্যান্ত বের হয় নাই।"

একজন রাজাকার বলল, "সেইটা আমাদের বিষয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন বলল, "এত চিন্তা করেন কেন? দুই-চাইরটা চড়-থাপ্পর দিয়া তো ছাইড়াও দিতে পারে।"

মুরব্বি বলল, "আল্লাহর কসম লাগে। বাপ-মা মরা এতিম ছাওয়ালটাকে ছাইড়া দেও।"

রাজাকারগুলো মুরব্বিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ঠিক কী কারণ জানা নাই, আমার কেন জানি খুব বেশি ভয় লাগছিল না। আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমি চিন্তা করতে পারছিলাম না, মানুষ যখন ঠিক করে চিন্তা করতে পারে না, তখন মনে হয় ভয় পায় না। আনন্দ কিংবা দুঃখও পায় না।

স্কুলের গেটে বালুর বস্তা দিয়ে ঘেরাও করে মিলিটারিরা পাহারা বসিয়েছে। ওপরে সাইনবোর্ডে বড় করে আমাদের স্কুলের নাম নবকুমার হাই স্কুল লেখা ছিল। আলকাতরা দিয়ে সেটা মুছে সেখানে লেখা হয়েছে গাজালা ইয়াকুব হাই স্কুল। হিন্দু নাম সরিয়ে মুসলমান নাম। গাজালা ইয়াকুব মানুষটা কে? মনে হয় মেজর ইয়াকুবের বাবা কিংবা মা।

স্কুলের ভেতর ঢুকে আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম, এটা যে আমাদের স্কুল ছিল বোঝার কোনো উপায় নাই। স্কুলের ভেতরে কত গাছ ছিল, এখন কোনো গাছ নাই, কেমন জানি ন্যাড়া লাগছে। জায়গায় জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছে। তেরপল টানিয়ে নিচে বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে। পানির ড্রামে মিলিটারিগুলো খালি গায়ে গোসল করছে। এই মাথা ওই মাথা দড়ি টানানো সেইখানে কাপড়ও ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে। স্কুলের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা বাঁশ পুঁতে তার আগায় একটা পাকিস্তানের পতাকা টানিয়ে রেখেছে। পাকিস্তানের পতাকা দেখতে যে এত ভয়ংকর সেটা আমি আগে কখনো বুঝতে পারি নাই।

রাজাকারগুলো হেডমাস্টারের রুমের সামনে দাঁড়াল। মনে হয় এখন এই রুমটা মেজর ইয়াকুবের রুম। দরজার কাছে একটা মিলিটারি পাহারা দিচ্ছিল, রাজাকারগুলোর সাথে আমাকে দেখে সে ভেতরে ঢুকে কিছু একটা বলল, তখন আমি মেজরের গলার স্বর শুনতে পেলাম, "আন্দার লে আও।"

রাজাকারগুলো আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। আমাদের হেডমাস্টারের রুমটা এখন চেনা যায় না। এক পাশে আলমারি ছিল, আলমারিতে বই ছিল, ফুটবল খেলায় জিতে আমরা যে ট্রফি পেয়েছিলাম, সেগুলো ছিল, এখন তার কিছু নাই। বড় টেবিলের পাশে একটা ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিল, সেই টেবিলের ওপর একটা পিস্তল। পাশে একটা বোতল, পাশে কয়েকটা গ্লাস। আমি আগে কখনো মদের বোতল দেখি নাই কিন্তু মনে হলো এইটা নিশ্চয়ই মদের বোতল।

মেজর ইয়াকুব সবাইকে চলে যেতে বলল, তখন একজন একজন করে সবাই বের হয়ে গেল। মেজর ইয়াকুব একটা সিগারেট ধরিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ক্যায়া, ডর লাগতি হুঁ?"

আমি ভয় পেয়েছি কি না জানতে চেয়েছে। আস্তে আস্তে আমার ভয় লাগতে শুরু করেছে। আমি তাই মাথা নেড়ে জানালাম যে আসলেই আমার ভয় লাগছে।

মেজর ইয়াকুব হাসার মতো ভঙ্গি করল, তারপর বাংলা বলার চেষ্টা করল, "বয় নাই। কুনু বয় নাই।"

কী কারণ জানি না, মেজর ইয়াকুবের মুখে এই বাংলা শুনে আমার হঠাৎ এক ধরনের আতঙ্ক হতে থাকে। মেজর ইয়াকুব তার পা দুইটা টেবিলে তুলে দিয়ে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। আধা বাংলা আধা উর্দুতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই স্কুলে পড়ো?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"এই স্কুলে মাসুদ আহমেদ নামে একজন শিক্ষক পড়াত তুমি তাকে চিনো?"

আমি এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম, চিন্তা করে মাথা নেড়ে জানালাম যে চিনি।

"তার সাথে তোমার যোগাযোগ আছে?"

আমার হঠাৎ করে গলা শুকিয়ে গেল, বললাম, "নাই।"

মেজর ইয়াকুবের মুখ শক্ত হয়ে গেল। কঠিন গলায় বলল, "খবরদার মিথ্যা কথা বলবে না। আমরা জানি যেদিন তোমার শিক্ষক মুক্তিবাহিনীর দল নিয়ে এসেছে সেদিন তুমি তার সাথে দেখা করেছ। তুমি তার সাথে কথা বলেছ।"

আমি চমকে উঠলাম। মেজর ইয়াকুব হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "কী নিয়ে কথা বলেছ?"

আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাসুদ ভাই আমাকে বলতে না করেছে আমি কাউকে বলতে পারব না। আমাকে মেরে ফেললেও বলব না।

মেজর ইয়াকুব টেবিল থেকে তার পা নামিয়ে আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বলল, "তার দলে কতজন আছে, কী কী অস্ত্র? কোথায় থাকে তুমি জানো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে আমি জানি না। মেজর ইয়াকুব টেবিলে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল। "কালকে আমি তোমাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বলেছিলাম, তুমি বলো নাই। কেন বলো নাই?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। কী উত্তর দেব? মেজর ইয়াকুব বলল, "আমি বলি, তুমি কেন বলো নাই? তুমি বলো নাই তার কারণ তুমিও আসলে মুক্তিবাহিনী! তোমার মতো বাচ্চা ছেলেদেরও ব্রেন ওয়াশ করা হয়ে গেছে। বুঝেছ?"

আমি কিছু বললাম না।

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বলো।"

আমি বললাম, "আমি কিছু জানি না।"

"তুমি যদি উত্তর না দাও তাহলে তোমার মুখ থেকে আমি জোর করে উত্তর বের করব। তুমি বাচ্চা দেখে আমি ছেড়ে দেব না। এই বাঙালি হচ্ছে জারজ সন্তানের জাতি। এদের বাঁচিয়ে রেখে কোনো লাভ নাই। ছোট-বড় কাউকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নাই।"

আমি ভয় পাওয়া চোখে মেজর ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেজর ইয়াকুব বলল, "ম্যায় ইস মুলককা সেরফ জমিন চাতা হুঁ। লোক নেহি।" আমি এই দেশের খালি মাটি চাই, মানুষ চাই না।

আমার গলা শুকিয়ে গেল, বুক কাঁপতে লাগল। একবার মনে হলো যা জানতে চেয়েছে বলে দিই। তারপরেই মাথা থেকে সেই চিন্তা সরিয়ে দিলাম, আমি মাসুদ ভাইকে কথা দিয়েছি কাউকে বলব না। আমাকে কথা রাখতে হবে। আমি পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না।

মেজর ইয়াকুব উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে বোতলটা নিয়ে গ্লাসে পানির মতো একটা তরল ঢালল, সাথে সাথে ঘরের ভেতর ঝাঁঝাল টক টক একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এক ঢোঁকে গ্লাসের পুরো তরলটা খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে ডাকল, "সরফরাজ।"

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা ভেতরে ঢুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেজর ইয়াকুব বলল, "ইসকে টর্চার সেল মে লে যাও।"

মিলিটারিটা খপ করে আমার ঘাড়টা ধরল, লোহার মতো শক্ত হাত, মনে হলো আমার ঘাড়ের ভেতর তার আঙুলগুলো ঢুকে গেছে। যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছি তখন মেজর ইয়াকুব মিলিটারিটাকে আবার কিছু একটা বলল, কী বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হলো বলেছে আমাকে টর্চার করে আমার ভেতর থেকে কথা বের করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাস নাইন সেকশন 'বি'টা হচ্ছে টর্চার সেল। বাইরে তালা লাগানো। বড় বড় গোঁফওয়ালা একজন তালা খুলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

ঘরের মাঝে কয়েকজন লোক পড়ে আছে, সারা শরীরে রক্ত শুকিয়ে আছে। মানুষগুলো বেঁচে আছে না মরে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন বসে ছিল, আমাকে দেখে বিড়বিড় করে বলল, "হেই খোদা এই বাচ্চাটারে কেন আনছে।"

বড় বড় গোঁফওয়ালা মানুষটা ধমক দিয়ে বলল "খামোশ।"

মানুষটা 'খামোশ' হলো না, বলল, "উসকো ছোড় দাও! আল্লাহর কসম। হামকো মারো। ইয়ে মাসুম বাচ্চা হায়।"

"খামোশ গাদ্দার।" বলে গোঁফওয়ালা মানুষটা তাকে একটা লাথি দিল, মানুষটা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, পারে না। লাথি খেয়ে সে কাত হয়ে নিচে পড়ে গোঙাতে থাকে।

আমাকে বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শুইয়ে বেঞ্চের পায়ার সাথে আমার হাত দুটি বেঁধে ফেলল। তারপর পা দুটি আলাদা করে বেঁধে নেয়। আমার বুকটা ধক ধক করছে। আমি ঠিক করে চিন্তা করতে পারছিলাম না। ভয়ে আতঙ্কে আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ছিল মজনু। মাঝে মাঝেই তাকে স্যারদের হাতে ভয়ংকর মার খেতে হতো। সে আমাদের শিখিয়েছিল যখন বেত মারা হয় তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয় তাহলে নাকি ব্যথা কম লাগে! আমি কি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করব? তাহলে সত্যিই কী ব্যথা কম লাগবে?

আমি টের পেলাম মিলিটারিটা আমার শার্টটা টেনে ওপরে তুলেছে, প্যান্টটা টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে। তারপর দড়ির মতো কিছু একটা হাতে নিয়ে মানুষটা আমাকে মারল, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, আমি চিৎকার থামাতে পারলাম না। আমার সেই চিৎকারে সারা পৃথিবীটা নিশ্চয়ই টুকরা টুকরা হয়ে গেল।

আমি কতক্ষণ চিৎকার করেছি, জানি না। কিছুক্ষণ পর আমার আর কিছু মনে নাই। আমি নিশ্চয়ই মরে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯.

একটু পর পর আমার ঘাড়ে কেউ যেন খোঁচা দিচ্ছে, আমি হাত দিয়ে খোঁচাটা থামাতে গেলাম তখন একটা পাখা ঝটপটানোর শব্দ শুনতে পেলাম। কিছু একটা আমার কাছ থেকে উড়ে গেল। আমি চোখ খুলে তাকানোর চেষ্টা করলাম, মনে হলো বহুদূরে একটা নদী। আমি কোথায়?

আমি চারপাশে দেখার চেষ্টা করতেই শরীরের কোথায় জানি প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল। আমি যন্ত্রণার শব্দ করে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে শুয়ে থাকলাম। তাহলে আমি কি বেঁচে আছি? বেঁচে থাকলে আমি কোথায় আছি? মিলিটারির ক্যাম্পে নাকি অন্য কোথাও?

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম। কয়েকটা কাক একটু দূরে বসে আমাকে লক্ষ্য করছে। এরাই মনে হয় ঘাড়ে ঠোকর দিচ্ছিল। কাঁকনডুবিতে কোনো কাক ছিল না। কাক নাকি শুধু নোংরা জিনিস খায়, মরা জিনিস খায়, তাই কাঁকনডুবিতে তাদের কোনো খাদ্য-খাবার ছিল না। এখন কাঁকনডুবিতে অনেক মরা মানুষ। তাদের অনেক খাবার। আমাকে মরা মনে করে কাকেরা খেতে এসেছিল। একটু পরে মনে হয় কুকুরগুলো আসবে, কাকের মতো এত সহজে সরে যাবে না। আমি বেঁচে থাকলেও তারা ছিঁড়ে-খুঁড়ে আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমার মনে হয় উঠে বসার চেষ্টা করা উচিত। আমি একটু চেষ্টা করতেই শরীরের কোথায় জানি ভয়ংকর ব্যথা করে উঠল। আমি আবার যন্ত্রণার শব্দ করে শুয়ে থাকলাম। আবার আমি অচেতন হয়ে যাচ্ছি। সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো আসলে আর কিছুতে কিছু আসে যায় না। বেঁচে থাকলেই কী আর মরে গেলেই কী। মনে হয় মরে গেলেই ভালো। বাবা আর মায়ের সাথে দেখা হবে— কোনো দিন দেখি নাই। দেখা হলে কি চিনতে পারব? আমি কী বলব তাদেরকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন মনে হলো কেউ একজন বলল, "ইয়া মাবুদ! এইখানে এইটা কে?"

তারপর ধুপ ধুপ পায়ের শব্দ শুনলাম। কেউ একজন আমার কাছে এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, "বেঁচে আছে। মরে নাই। বাচ্চা ছেলে।"

আরেকজন বলল, "এইটা রঞ্জু না? কালকে রাজাকাররা এরে ধরে নিল না?"

মানুষ দুইজন আমাকে ধরাধরি করে তুলে নিল, শরীরের ভেতর আবার কোথায় জানি ভয়ংকর যন্ত্রণা করে উঠল। আমি চিৎকার করার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার আবার যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি। আমার চারপাশে অনেক মানুষ, তারা কথা বলছে, একটা ছোট ছেলে আমার হাত ধরে বসে আছে। ছেলেটা কে? একটু পরে আমি ছেলেটাকে চিনতে পারলাম। ছেলেটা খোকন, চুল কাটা, শার্ট-প্যান্ট পরা ডোরা। আমি চোখ খুলতেই ডোরা চিৎকার করে বলল, "চোখ খুলেছে। চোখ খুলেছে।"

আমার ওপরে অনেকে ঝুঁকে পড়ল, নানির মুখটা দেখতে পেলাম, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইডি! বাঁইচা আছস?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, নানি।"

"বাঁইচা থাকবি? আল্লাহর কসম, তুই বল তুই বাঁইচা থাকবি! বল। বল তুই আমারে ছাইড়া যাবি না।"

আমি বললাম, "আমি তোমারে ছাইড়া কই যামু নানি।"

"তুই বাঁইচা থাকবি?"

"হ্যাঁ, নানি। আমি বাঁইচা থাকমু।"

তখন নানি আমারে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। ডোরা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল, আমি দেখলাম তার চোখ থেকে টপ টপ করে আমার মুখের ওপর পানি পড়ছে। ডোরা কাঁদছে। আহা বেচারি।

ডোরা ফিসফিস করে বলল, "রঞ্জু! তোমার অনেক সাহস।"

আমার সুস্থ হতে অনেক দিন লাগল। পিঠের ঘা শুকালেও সেখানে লম্বা লম্বা কাটা দাগ রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত হাঁটাচলার মতো যখন একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুস্থ হয়েছি তখন একদিন গভীর রাতে নানি আমাকে ডেকে তুলল, ফিসফিস করে বলল, "তোর সাথে একজন দেখা করতে আসছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার সাথে? এত রাত্রে?"

"হ্যাঁ।"

"কে?"

"জানি না।"

"বাতি জ্বালাও নানি, অন্ধকারে তো দেখা যাবে না।"

"বাতি জ্বালাইতে না করছে।"

"কেন বাতি জ্বালাইতে না করছে?"

তখন অন্ধকার থেকে আমি মাসুদ ভাইয়ের গলা শুনতে পেলাম, মাসুদ ভাই বলল, "এত রাতে বাতি জ্বালালে লোকজন সন্দেহ করবে। তোমার বাড়ির দিকে তো রাজাকারের নজর আছে, জানো না?"

"মাসুদ ভাই আপনি আসছেন?"

আবছা অন্ধকারে মাসুদ ভাই এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখল, বলল, "তুমি আমার জন্য খুব কষ্ট করলে রঞ্জু। এরকম ভয়ংকর একটা অত্যাচার হলো তোমার ওপর। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

আমি বললাম, "না, মাসুদ ভাই, আপনার কী দোষ!" একটু থেমে বললাম, "মাসুদ ভাই।"

"বলো।"

"আমাকে এত অত্যাচার করলেও আমি কিন্তু আপনাদের একটা কথাও মিলিটারিকে বলি নাই।"

মাসুদ ভাই অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি জানি। সেই জন্য আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

"সত্যি?" আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, "সত্যি মাসুদ ভাই?"

"হ্যাঁ, তোমার এখানে থাকা নিরাপদ না। মিলিটারিরা তোমাকে মারে নাই, বাঁচিয়ে রেখেছে। তোমাকে দরকার হলে আবার ক্যাম্পে নিবে। অত্যাচার করবে। আমি খবর পেয়েছি।"

আমি মাসুদ ভাইয়ের কথা ভালো করে শুনলামই না। আনন্দে আবার চিৎকার করলাম।

"আমাকে মুক্তিবাহিনীতে নেবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই বলল, "তোমাকে মুক্তিবাহিনীতে নিতে হবে না তুমি এর মাঝে মুক্তিবাহিনীতে আছ! তোমাকে আমাদের ক্যাম্পে নেব।"

আমি আবছা অন্ধকারে নানির দিকে তাকিয়ে বললাম, "নানি, আমি মুক্তিবাহিনীতে যাব।"

নানি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। আমার সাথে কথা বলছে। রাজাকাররা নাকি অপেক্ষা করতেছে একটু সুস্থ হলে তোরে আবার মিলিটারি ক্যাম্পে নেবে। এর থেকে এইটাই ভালো তুই এদের সাথে থাক।" কথা শেষ করতে করতে নানি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি নানিকে ধরে বললাম, "নানি তুমি কাইন্দ না। আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসব।"

মাসুদ ভাই বলল, "একটু পরেই চাঁদ উঠে যাবে—তার আগে আমাদের গ্রাম থেকে বের হয়ে যেতে হবে। চল রঞ্জু।"

"আমার জামাকাপড় নিতে হবে না? বই-খাতা।"

"তাড়াতাড়ি নাও। দেরি করো না। অন্ধকারে যেটুকু পারো ততটুকু।"

আমি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা ব্যাগে সবকিছু ভরে নিলাম, তারপর মাসুদ ভাইয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বের হলাম। নানি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "ফি আমানিল্লাহ। হেই খোদা ছেলেডারে আমি তোমার হাতে দিলাম, তুমি দেইখা রাখিও।" তারপর কাঁদতে লাগল।

বাড়ির বাইরে দুইটা মুক্তিযোদ্ধা পাহারায় ছিল, তারা আমাদের সাথে সাথে হাঁটতে থাকে। আমরা সড়কে পা দিতেই হঠাৎ করে আমার ডোরার কথা মনে পড়ল, আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করল, "কী হলো? দাঁড়ালে কেন?"

"মাসুদ ভাই, আমি একা একা মুক্তিবাহিনীতে যেতে পারব না। আমার আরেকজনকে নিয়ে যেতে হবে।"

মাসুদ ভাই অবাক হয়ে বলল, "আরেকজন? আরেকজন কে?"

"ডোরা।"

"ডোরা? ডোরা কে?"

"এখন তার নাম খোকন।"

মাসুদ ভাই বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না রঞ্জু। তুমি কী বলছ পরিষ্কার করে বলো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাসুদ ভাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, "ডোরা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে মেরে ফেলেছে, তার মেয়ে। ডোরার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার এত শখ যে সে চুল কেটে ফেলেছে, এখন শার্ট-প্যান্ট পরে ছেলের মতো থাকে। তার এখন নূতন নাম খোকন।"

"ঠিক আছে, যখন সুযোগ পাবে ডোরাও নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীতে যাবে।"

"মাসুদ ভাই, আমি তাকে কথা দিয়েছি তাকে না নিয়ে আমি মুক্তিবাহিনীতে যাব না।"

"তাকে কথা দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, মাসুদ ভাই তার গা ছুঁয়ে কথা দিয়েছি। তাকে না নিয়ে আমি যেতে পারব না।"

মাসুদ ভাই আমার কথা শুনে খুব ঝামেলায় পড়ে গেল। সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দেখো রঞ্জু, তোমাকে নিতে আসাটাই খুবই বিপজ্জনক একটা মিশন। এই জন্য অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে আমি নিজে এসেছি। এখন সাথে আরেকজন ছোট মেয়েকে নেয়া তো খুব প্র্যাকটিকেল কথা না।"

আমি খুব অনুনয় করে বললাম, "কিন্তু মাসুদ ভাই আমি যে ডোরার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি। এখন যদি তাকে না নিয়ে যাই তাহলে তো—"

"তাহলে কী?"

"তাহলে তো ডোরা মরে যাবে।"

"মরে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

মাসুদ ভাই খুব বিপদে পড়ে গেল। মাথা চুলকে বলল, "তাহলে এখন কী করা যায়?"

আমি বললাম, "ডোরাকে না বলে আমি যেতে পারব না মাসুদ ভাই।"

"কখন বলবে?"

"এখন।"

মাসুদ ভাই বলল, "এখন? এই গভীর রাতে?"

"হ্যাঁ। এই তো সামনে তাদের বাড়ি। জানালার পাশে ঘুমায়। জানালায় টোকা দিলেই ঘুম থেকে উঠে যাবে। ডোরার ঘুম খুবই পাতলা। আমাকে বলেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে মাসুদ ভাইয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তাই বুঝতে পারছিলাম না মাসুদ ভাই বিরক্ত হচ্ছে কি না। হলেও কিছু করার নেই, আমি ডোরার সামনে বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না। মরে গেলেও না।

মাসুদ ভাই বলল, "ঠিক আছে তাহলে আমরা দাঁড়াই, তুমি ডোরাকে বলে এসো।"

"ঠিক আছে।"

"দেরি করো না। রাজাকারদের বাড়ির সামনে মুক্তিযোদ্ধা পাহারা রেখেছি কিন্তু এই রাতে আমি গোলাগুলি করতে চাই না।"

"ঠিক আছে।" আমি অস্বস্তির সাথে বললাম, "এখন ডোরাকে বোঝাতে পারলে হয়। তার মাথায় একটা জিনিস ঢুকে গেলে সেটা আর বের করা যায় না।"

"দেরি করো না। যাও।"

"কিছুতেই রাজি হবে না। আমাকে খুন করে ফেলবে।"

মাসুদ ভাই তাড়া দিল, "যাও যাও, তাড়াতাড়ি যাও। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি এটা করতে দিচ্ছি।"

ডোরাদের বাড়ির কুকুরটা আমাকে দেখে একটা হালকা ডাক দিল কিন্তু কাছে এসে আমাকে চিনতে পেরে পরিচিত মানুষের মতো লেজ নাড়তে লাগল। আমি ডোরার ঘরের জানালায় গিয়ে টোকা দিলাম, সত্যি সত্যি সাথে সাথে ডোরা ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "কে?"

আমি চাপা গলায় বললাম, "আমি রঞ্জু।"

ডোরা তখনই জানালাটার পর্দা সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কী হয়েছে রঞ্জু? মুক্তিবাহিনী এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"এখন যুদ্ধ করবে? ক্যাম্প আক্রমণ করবে?"

"না।"

"তাহলে?"

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম, "আমাকে নিতে এসেছে।"

"আর আমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোকে— মানে তোকে— তুই তো— মানে—" আমি কথা শেষ করতে পারলাম না।

ডোরা প্রায় হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "বুঝেছি। আমাকে নিবি না। তুই একা যাবি। তুই আমাকে কিন্তু কথা দিয়েছিলি—"

"দেখ ডোরা, মাসুদ ভাই খবর পেয়েছে রাজাকাররা আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। সেইজন্য আমাকে নিতে এসেছে। আমি তো চলেই যেতে পারতাম। কিন্তু তোকে কথা দিয়েছি তাই তোকে না বলে যাই নাই।"

ডোরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় বলল, "ঠিক আছে, তুই যা।"

"তুই রাগ করছিস?"

ডোরা আমার কথার উত্তর দিল না। আমি বললাম, "দেখ ডোরা, আমি তোকে কথা দিচ্ছি আমি তোকে নিতে আসব—"

"তোর আর কথা দিতে হবে না। তুই যা।"

"দেখ ডোরা।"

"তুই যা।" বলে ডোরা জানালার পর্দা টেনে দিল। আমার মনে হলো ডোরা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি খুব মন খারাপ করে মাসুদ ভাইয়ের কাছে এলাম। মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করল, "বলেছ?"

"হ্যাঁ। বলেছি।"

"গুড। এখন তাহলে চল যাই।"

"ডোরা খুব মন খারাপ করেছে।"

মাসুদ ভাই কোনো কথা বলল না, আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগল। আমি আবার বললাম, "ডোরা আমার ওপর মনে হয় খুব রাগ হয়েছে। তার এত মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ার ইচ্ছা।"

মাসুদ ভাই এবারেও কোনো কথা বলল না। আমি বললাম, "ডোরা আমার সাথে ভালো করে কথাই বলল না।"

মাসুদ ভাই বলল, "যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি তোমার পক্ষ থেকে ডোরার কাছে মাফ চেয়ে নেব। ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "ডোরা মাফ করবে না। কোনো দিন মাফ করবে না। ডোরার খুব রাগ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিল তাদের সবাইকে একত্র করে মাসুদ ভাই রওনা দিল। আকাশে মেঘ, মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। এর মাঝে সবাই পা চালিয়ে হাঁটছে। মাসুদ ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাঁটতে পারছ তো?"

"পারছি, মাসুদ ভাই।"

"কষ্ট হলে বলো। তোমাকে ঘাড়ে তুলে নেয়া যাবে।"

"লাগবে না মাসুদ ভাই। আমি ঠিক হয়ে গেছি।"

ঘণ্টা খানেক পর আমরা একটা জলা জায়গা পার হলাম। জায়গাটা পার হবার পর গভীর জঙ্গল, মনে হয় সবাই এই জঙ্গলে ঢুকে যাবে।

হঠাৎ করে মাসুদ ভাই থেমে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "চুপ।"

আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

মাসুদ ভাই ফিসফিস করে বলল, "শোনো।"

আমরা সবাই কান পেতে শুনলাম, একটা ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে। কেউ একজন জলা জায়গাটা পার হচ্ছে।

মাসুদ ভাই বলল, "নিশ্চয়ই রাজাকার। আমাদের ক্যাম্পটা কোথায় জানার জন্য পিছে পিছে আসছে।"

একজন মুক্তিযোদ্ধা ঘাড়ে ঝোলানো স্টেনগানটা হাতে নিয়ে বলল, "শেষ করে দেব?"

"না, গুলি করা যাবে না। ধরে আনতে হবে।"

"আপনি থাকেন, আমরা দুইজন যাই।"

মুক্তিযোদ্ধা দুইজন অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি, তখন হঠাৎ একটা হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মাঝে মুক্তিযোদ্ধা দুইজন একজনকে ধরে নিয়ে এল। মাসুদ ভাই মানুষটার মুখে টর্চের আলো ফেলল, সাথে সাথে আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, "ডোরা!"

ডোরা চোখ পিটপিট করে বলল, "রঞ্জু দেখবি একটু, আমার মনে হচ্ছে আমার পায়ে একটা জোঁক ধরেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পর্ব

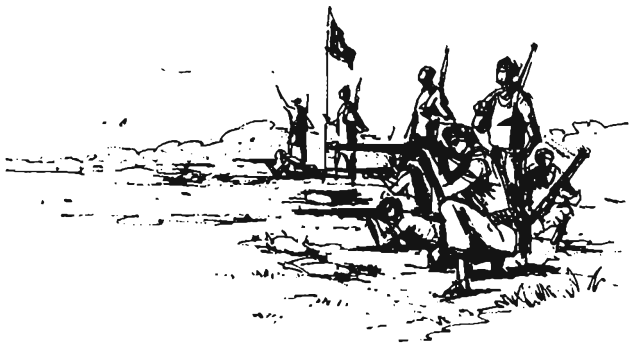

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০.

আমরা প্রায় সারা রাত হেঁটে হেঁটে ভোররাতের দিকে ক্যাম্পে পৌঁছেছি। যেখানে তারা ক্যাম্প বসিয়েছে সেখানে রাজাকার আর মিলিটারি দূরে থাকুক কাকপক্ষীও সেটা খুঁজে পাবে না। যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছেছি তখন একটা গাছের ওপর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, "হলট! হু কামস দেয়ার?"

সেই বিকট চিৎকার শুনে আমি আর ডোরা রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম, মাসুদ ভাই বলল, "হয়েছে হয়েছে পাইকার, এখন গাছ থেকে নাম।"

গাছের ওপর থেকে যে চিৎকার করেছে সে বলল, "কভি নেহি। আমাকে পাসওয়ার্ড না বলা পর্যন্ত যেতে দেব না। বলেন পাসওয়ার্ড"।

মাসুদ ভাই বলল, "পাসওয়ার্ড জানি না।"

"ভেরি গুড। হয়েছে।"

"কেমন করে হলো?

গাছ থেকে পাইকার নামের মানুষটা নামতে নামতে বলল, "তার কারণ আজকের পাসওয়ার্ড হচ্ছে 'জানি না'। কালকের পাসওয়ার্ড ছিল, 'ভুলে গেছি'। আমরা সব সময় খুব বুদ্ধিমানের মতো পাসওয়ার্ড দিই। তাই না কমান্ডার?"

মাসুদ ভাই বলল, "অনেক হয়েছে। এখন তুমি ঘুমাতে যাও। কাসেমকে পাহারায় পাঠাও।"

পাইকার নামের মানুষটা আমাকে আর ডোরাকে দেখে বলল, "ইয়া মাবুদ! মাসুদ ভাই, আপনি কি জানেন আপনার কাঁকনডুবি থেকে একটা ট্যাবলেট আনার কথা ছিল, আপনি দুইটা নিয়া আসছেন?"

"জানি। তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে রঞ্জু। যাকে আনার জন্য গিয়েছিলাম। আর এ হচ্ছে খোকন— রঞ্জুকে আনতে গিয়ে আমরা খোকনকে ফ্রি পেয়ে গেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইকার বলল, "এই রকম আণ্ডা-বাচ্চা আমরা কয় হালি আনব? এদের জন্য আমাদের তো এখন দুধের বোতল কিনতে হবে।"

"সেইটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। এরা খুবই টায়ার্ড, মাকে ঘুম থেকে তোলো। এদের কিছু খেতে দাও, তারপর ঘুমানোর ব্যবস্থা করো।"

"জো হুকুম কমান্ডার—", বলে পাইকার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের অন্ধকারের ভেতর একটা ঘরের মতো জায়গায় নেয়া হলো। সেখানে মাটিতে খড় রেখে তার ওপর একটা কাঁথা বিছিয়ে বিছানা করা হয়েছে। নূতন জায়গায় এসে আমার আর ডোরার দুজনেরই একটু অস্বস্তি লাগছিল। আমাদের জন্য বাটিতে মুড়ি আর কলা আনা হয়েছে, আমরা দুজন প্রায় রাক্ষসের মতো সেগুলো খেয়ে ফেললাম। তারপর আমি বিছানায় শুয়ে কিছু বোঝার আগেই ঘুমিয়ে গেলাম।

ঘুম ভাঙল পরের দিন বেলা হবার পর। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল ডোরা, বলল, "বাইরে আয়। দেখ।"

আমি বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলাম। গভীর জঙ্গলের মাঝখানে অনেক পুরনো একটি দালান, তার বেশির ভাগ মাটির ভেতর গেঁথে আছে। ইটগুলো অনেক চিকন। দালানগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢাকা—তার অনেকটুকু পরিষ্কার করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প তৈরি হয়েছে।

ক্যাম্পের এক পাশে প্রায় পনেরো-বিশজন মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং করছে। আধবুড়ো একজন মানুষ একটা হুংকার দিতেই সবাই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে সামনে এগোতে থাকে, আবার হুংকার দিতেই তারা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আরেকটা হুংকার দিতেই তারা দৌড়াতে থাকে। আধবুড়ো মানুষটার মনে কোনো দয়ামায়া নাই, মুক্তিযোদ্ধাগুলো দরদর করে ঘামছে দেখে মনে হয় আর এক সেকেন্ডও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তার পরও তাদেরকে দৌড়িয়ে নিতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আধবুড়ো মানুষটার মনে হলো একটু দয়া হলো, তখন সবাইকে থামতে বলতেই সবাই মাটির ওপর নেতিয়ে পড়ে মুখ হাঁ করে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিতে থাকে। আধবুড়ো মানুষটা তখন গালাগাল শুরু করল, "হেই ইন্দুরের বাচ্চারা! তোরা কি মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিংয়ের জন্য আসছস, নাকি রাজাকারদের ট্রেনিংয়ের জন্য আসছস? এইটা রাজাকারের ট্রেনিং না যে একটা লাঠি নিয়া দুই কদম লেফট-রাইট করবি। এইটা মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং। নিজের জান কবজ কইরা যুদ্ধ করা লাগব! যুদ্ধ করতে মাথার মাঝে বুদ্ধি থাকতে হয়, বুকের মাঝে সাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে হয় আর শরীলে শক্তি থাকতে হয়। তোদের মাথার মাঝে কোনো ঘিলু নাই, বুকের মাঝে কোনো সাহস নাই, শরীলে জোর নাই। দেখলে মনে হয় কয়টা বুইড়া মানুষ কুঁই কুঁই কইরা হাঁটে। তোগো দেখলে মনে হয় গলায় হাত দিয়া বমি কইরা দিই—এই ইন্দুরের বাচ্চাদের নিয়া আমাগো যুদ্ধ করা লাগব? তোদের দিয়া দেশ স্বাধীন করতে হলে একশ বছর যুদ্ধ করা লাগব।" তারপর হুংকার দিয়ে বলল, "খাড়া হ।"

সবাই তখন এক লাফে উঠে দাঁড়াল। আরেকটা হুংকার দিতেই সবাই ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। আরেকটা হুংকার দিতেই কনুইয়ে ভর দিয়ে সবাই গিরগিটির মতো সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু নিশ্চয়ই এতক্ষণে সবার কনুইয়ের ছাল উঠে গেছে।

ঠিক তখন আমি দেখলাম একটা ফাঁকা জায়গায় মাসুদ ভাই একটা বাক্স খুলে ভেতরে কী যেন দেখছে। আমি আর ডোরা তার কাছে হেঁটে গেলাম। আমাদের দেখে মাসুদ ভাই বলল, "ঘুম হয়েছে রাত্রিবেলা?"

"হয়েছে।"

"গুড।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখছেন?"

"গ্রেনেড। কয়টা আছে গুনছি। কাল-পরশু একটা অপারেশনে যাব তো।"

"কোথায়?"

"কালী গাংয়ের উজানে। আমাদের অনেক বড় একটা অস্ত্রের চালান আসছে। অস্ত্রবোঝাই নৌকাটা যেন ঠিকমতো আসতে পারে সেই জন্য মিলিটারি পাহারাকে একটু ব্যস্ত রাখতে হবে।"

আমি বললাম, "মাসুদ ভাই।"

"কী হলো?"

"আমাদের আপনাদের সাথে নিয়ে যাবেন?"

মাসুদ ভাই চোখ কপালে তুলে বলল, "তোমাদের?"

"হ্যাঁ, আমরা কখনো যুদ্ধ দেখি নাই।"

মাসুদ ভাই হাসল, বলল "যুদ্ধ তো থিয়েটার না যে সবাই বসে বসে দেখবে। যুদ্ধ খুব ভয়ানক ব্যাপার। যুদ্ধে একদল আরেক দলকে মারে! এখানে দেখার কিছু নাই।"

ডোরাও আমার সাথে যোগ দিল, বলল, "আমরা অনেক দূর থেকে দেখব। আপনাদের গুলির বাক্স নিয়ে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই এবার শব্দ করে হেসে আঙুল দিয়ে ট্রেনিং নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দেখিয়ে বলল, "ঐ দেখেছ, মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে ট্রেনিং নিচ্ছে? এই রকম ট্রেনিং না নিয়ে কেউ যুদ্ধে যায় না! তোমরা ঐ ট্রেনিং নিতে পারবে?"

আমি আর ডোরা একসাথে বললাম, "পারব।"

"গুড। তাহলে ট্রেনিংটা নিয়ে নাও।"

আমি আড়চোখে ট্রেনিং নিতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা আর হুংকার দিতে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "মাসুদ ভাই।"

"কী হলো?"

"ঐ লোকটা কে?"

"ই.পি.আরের একজন সুবেদার। কেন?"

"উনি মুক্তিযোদ্ধাদের এত গালাগালি করেন কেন?"

মাসুদ ভাই আবার হাসল, "এইটা হচ্ছে মিলিটারি ট্রেনিংয়ের একটা অংশ।"

ডোরা বলল, "খুবই নিষ্ঠুর মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের কত কষ্ট দিচ্ছেন।"

মাসুদ ভাই বলল, "ট্রেনিংয়ের সময় যত বেশি কষ্ট করবে, যুদ্ধটা হবে তত সহজ।"

আমি বললাম, "এইভাবে কষ্ট দিলে সবাই তো পালিয়ে যাবে।"

"না। পালাবে না। কেউ পালায় নাই। এদের একজনকেও তো আমরা ধরে আনি নাই, এরা নিজেরা এসেছে। কাউকে আমরা এক টাকা বেতনও দিই না। তবু এরা আছে।"

"নাই-নাই-আমি নাই।" কথা শুনে আমরা ঘুরে তাকালাম, গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম মানুষটা পাইকার। কাল রাতে যখন আসছিলাম তখন সে পাহারায় ছিল। গলার স্বর শুনে ভেবেছিলাম বয়স্ক মানুষ, এখন দেখছি কমবয়সী একজন ছেলে।

মাসুদ ভাই আবার তার বাক্সের ভেতর থেকে গুনে গুনে গ্রেনেড বের করতে করতে বলল, "কেন তুমি নাই?"

"গত পরশু শুঁটকি দিয়ে ভাত খেয়েছি, গতকালও ছিল শুঁটকি, আজকেও শুঁটকি। আমি আর নাই। আমি কাঁকনডুবি গিয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেব। মিলিটারি ক্যাম্পে প্রত্যেক দিন গরুর গোশত।"

"খুব ভালো আইডিয়া পাইকার। শুধু খোঁজ নাও রাজাকাররা গরুর গোশতের ভাগ পায়, নাকি তারাও খালি শুঁটকি খায়।"

"তাই নাকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। প্রত্যেক দিন মিলিটারির গা-হাত-পা টিপে দিতে হবে। পারবে তো!"

"ছি! ঐ হারামজাদাদের গা-হাত-পা টিপতে হবে—তাহলে আমি এইখানে আছি। শুঁটকিই সই! দরকার হলে কচু খেয়ে থেকে যাব!"

পাইকার তখন আমাদের দুইজনের দিকে তাকাল, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমাদের আণ্ডা-বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাদের কী খবর?"

ডোরা বলল, "আমরা যদি আণ্ডা-বাচ্চা মুক্তিযোদ্ধা হই তাহলে আপনি কী?"

পাইকার বলল, "তা তো জানি না! মনে হয় বাছুর মুক্তিযোদ্ধা।"

শুনে আমি আর ডোরা দুইজনেই হি হি করে হাসলাম। ডোরা বলল, "আপনার নাম তো পাইকার। তাই না?"

"হ্যাঁ। তাতে কোনো সমস্যা আছে?"

"সমস্যা নাই। কিন্তু এই নামটা আমি আগে কখনো শুনি নাই।"

"কেমন করে শুনবে? পৃথিবীতে মাত্র হাতে গোনা অল্প কয়েকজন পাইকার আছে। পাইকার হচ্ছে অমূল্য ধন।"

"কিন্তু পাইকার ভাই, এই নামটা কেমন করে এসেছে?"

"ও! সেটা তো বিরাট কাহিনি! আমার বাবা-মায়ের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তখন আমার মা বাবাকে বলল, হ্যাঁ গো, আমাদের কোনো ছেলেমেয়ে নাই। ঘরটা খালি খালি লাগে, তুমি বুধবারের হাট থেকে কয়টা ছেলেমেয়ে কিনে আনো না গো।"

ডোরা হি হি করে হেসে বলল "ইশ! কী মিথ্যুক। ছেলেমেয়ে কেউ কোনো দিন হাট থেকে কিনে আনে?"

পাইকার ভাই অবাক হবার ভান করে বলল, "ও মা! হাটবাজার থেকে না কিনলে ছেলেমেয়ে আসে কোথা থেকে?"

ডোরা বলল, "মিথ্যুক! মিথ্যুক!"

পাইকার ভাই খুবই দুঃখ পাবার ভঙ্গি করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে থাক। আমি তাহলে বলবই না।"

আমি আর ডোরা তখন বললাম, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি বলেন।"

"মিথ্যুক বলবে না তো?"

"না, বলব না।"

"ঠিক আছে, তাহলে শোনো। বাবা বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে টিপে টুপে দেখে কিন্তু পছন্দ হয় না। শেষে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানে বাচ্চাগুলো দেখে খুব পছন্দ হলো। বাবা জিজ্ঞেস করল, 'কত করে দাম?' দোকানদার বলল, খুচরা না পাইকারি? বাবা বলল পাইকারি। দোকানদার বলল এক দাম, জোড়া দুইশ টাকা। বাবা তখন পাইকারি দরে পাঁচ জোড়া বাচ্চা কিনে আনল। বাজার থেকে পাইকারি কিনেছে বলে আমাদের নাম পাইকার।"

ডোরা আবার হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "মিথ্যুক। মিথ্যুক!"

পাইকার ভাই চোখ গরম করে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হলো না? ঠিক আছে যুদ্ধ শেষ হলে আমি তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। আমার মাকে জিজ্ঞেস করো আমি সত্যি কথা বলছি, না মিথ্যা বলছি।"

মাসুদ ভাই মুখ টিপে হাসছিল, বলল, "পাইকার! এই রকম গাঁজাখুরি গল্প তোমার স্টকে কয়টা আছে?"

"একটাও নাই। আমার স্টকে যা আছে, সব সত্যি! কোনো ভেজাল নাই!"

ডোরা বলল, "আপনি একজন জোকার। তাই না?"

পাইকার ভাই বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি মোটেও জোকার না।"

তার বলার ভঙ্গি দেখেই আমি আর ডোরা হি হি করে হাসতে লাগলাম। মানুষটাকে আমাদের খুবই পছন্দ হলো।

বিকালবেলা পাইকার ভাই আমাকে আর ডোরাকে নিয়ে পুরো ক্যাম্পটা দেখাতে বের হলেন। পুরনো দালানটা দেখিয়ে বলল, "এইটা কিসের দালান কেউ জানে না। ভাসা ভাসাভাবে শুনেছিলাম মোগল আমলে এইখানে একজন রাজপুত্রকে নির্বাসন দিয়েছিল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"কে বলবে কেন? রাজা-বাদশাহরা সিংহাসনে বসার জন্য এক রাজপুত্র অন্য রাজপুত্রকে মেরে ফেলে, না হলে চোখ কানা করে দেয়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। এই জন্যই তো আমি ইতিহাস বই পড়ি না, পরীক্ষায় সেই জন্য গোল্লা পাই। যাই হোক, রাজপুত্রের জন্য এইখানে নদীর তীরে এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দিল। সে তার এক ডজন বউ, দুই ডজন দাসি বান্দি, তিন ডজন পাহারাদার, চার ডজন পোলাপান নিয়ে থাকতে এল। তখন একদিন—"

ডোরা জিজ্ঞেস করল, "নদীটা কই?"

"নদীটা সরে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নদী সরে গেছে? নদী কি জ্যান্ত মানুষ যে সরে যাবে?"

পাইকার ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "আমি এত কিছু জানি না। যেটা শুনেছি, সেটা বলছি। পছন্দ না হলে কানে আঙুল দিয়ে রাখো।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি বলেন।"

"যাই হোক এই রাজপুত্র এক জোছনা রাতে নদীর তীরে বসে মদ-গাঞ্জা এই সব খাচ্ছে—"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মদ-গাঞ্জা?"

"হ্যাঁ। রাজা-বাদশাহরা সব সময় সময় কাটানোর জন্য মদ-গাঞ্জা খায়। যাই হোক তখন ডাকাতেরা আক্রমণ করল। সবাইকে কচুকাটা করে সবকিছু লুটপাট করে নিল! ছোট বাচ্চা আর মেয়েদের ধরে নিয়ে বিক্রি করে দিল।"

"বিক্রি করে দিল?"

"হ্যাঁ। আগের যুগে সব সময় মানুষকে ধরে বিক্রি করে দিত। যাই হোক শুধু একজন রাজকন্যা বেঁচে গেল। সে একা একা এখানে ঘুরে বেড়াত। সবাই মারা যাওয়ার পরও সে একা এইখানে থেকে গেল! তারপর একদিন সে নিজেও মারা গেল— তার পরও সে এখানে থেকে গেল।"

"মারা যাওয়ার পরে?"

পাইকার ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ভূত হয়ে। এখনো আছে।"

আমি আর ডোরা চিৎকার করে উঠলাম, "এখনো আছে?"

"হ্যাঁ। গভীর রাত্রে যদি ঘুম থেকে ওঠো শুনবে সেই রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"সত্যি?"

"আমার কথা বিশ্বাস না করলে গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে বসে থেকো। তোমাদের যদি কপাল ভালো হয় তাহলে জোছনা রাতে দেখতেও পেতে পারো।"

ডোরা বলল, "থাক বাবা, আমার দেখার কোনো দরকার নাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পাইকার ভাই। আপনি কি কখনো ভূত দেখেছেন?"

"দেখি নাই আবার!"

"কী রকম ছিল ভূতটা?"

"দিনের বেলা ভূতের গল্প বলে কোনো মজা নাই, অন্ধকার হোক তখন বলব। এখন চলো ক্যাম্পের পেছন দিকটা দেখাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাম্পের পেছন দিকে গিয়ে দেখলাম একজন মহিলা একটা মাটির চুলায় বড় বড় ডেকচিতে রান্না করছেন। চুলায় আগুন ধরাতে সমস্যা হচ্ছে, তাই একটা চোঙা দিয়ে ফুঁ দিচ্ছেন, চুলা থেকে আগুন বের না হয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে আর মহিলা ধোঁয়া থেকে মাথাটা সরানোর চেষ্টা করছেন।

পাইকার বলল, "এই যে ইনি হচ্ছে আমাদের মা। মা শুনে ভেবেছিলাম বুঝি মা-খালাদের মতো বয়স্কা একজন মহিলা হবেন কিন্তু যখন ঘুরে আমাদের দিকে তাকালেন, তখন দেখলাম কমবয়সী একটা বউ। কাল রাতে আমাদের মুড়ি-কলা দিয়েছিলেন তখন অন্ধকারে চেহারা দেখতে পারি নাই, এখন দেখতে পাচ্ছি খুবই ফুটফুটে চেহারার কমবয়সী একটা মেয়ে। ডোরা ফিসফিস করে বলল, "ইশ! কী সুইট!"

পাইকার ভাই বলল, "এই হচ্ছে মা, আর আমরা সবাই তার দামড়া-দামড়া ছেলে।" পাইকার ভাই তখন মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "মা, এই যে তোমার আরো দুইটা ছেলে! এইগুলি আমাদের মতো দামড়া সাইজের না এরা আণ্ডাবাচ্চা।"

মা মুখ টিপে হেসে বললেন, "দুইটা ছেলে না, একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে।"

পাইকার ভাই চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বলেন আপনি?"

"ঠিকই বলি।"

পাইকার ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী সর্বনাশ! কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে? দুইটাই তো দেখতে একই রকম?"

ডোরা ফিক করে হেসে বলল, "একসময় আমাদের একজন মেয়ে ছিল, এখন আমরা দুইজনই ছেলে। তাই নারে রঞ্জু?"

আমি মাথা নাড়লাম। পাইকার ভাই ডোরার দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তুমি নিশ্চয়ই মেয়ে!"

ডোরা মাথা নাড়ল আর পাইকার ভাই এমন একটা ভাব করল যে একটা রাজ্য জয় করে ফেলেছে।

মা তখনো চোঙা দিয়ে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছে, তখন পাইকার ভাই এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেন আমার কাছে দেন, আমি আগুনটা ধরিয়ে দিই।"

মা বললেন, "লাগবে না। আমিই পারব।"

"আপনি তো পারবেনই। আপনি কোন কাজটা পারেন না! এর পরেরবার আপনাকে যুদ্ধে নিয়ে যাব। একটা মেশিনগান দিয়ে বসিয়ে দেব। মিলিটারিগুলোকে ছাতু করে দেবেন। মোরব্বা বানিয়ে দেবেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইকার ভাই চোঙাটা নিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা ফুঁ দিতেই দপ করে আগুনটা জ্বলে উঠল। পাইকার ভাই নিজের বুকে থাবা দিয়ে এমন একটা ভান করল যে এবারে শুধু রাজ্য না, আস্ত একটা সাম্রাজ্য জয় করে ফেলেছে। খুব অল্পতেই পাইকার ভাই খুশি হয়ে ওঠে।

মা ডেকচির ঢাকনা সরিয়ে ভেতরের তরকারিটা একটা বাঁশের হাতা দিয়ে নেড়ে দিতে থাকলেন। পাইকার ভাই সেটা দেখতে দেখতে বলল, "মা আসার আগে আমাদের ভাতের অর্ধেক থাকত চাউল, বাকি অর্ধেক থাকত জাউ। ডালের রং হতো কলেরা রোগীর ইয়ের মতো। মাছের তরকারির মাঝে আমরা একদিন এত বড় একটা কোলা ব্যাঙ পেয়েছিলাম। ব্যাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে! খাওয়া ছিল শূল বেদনার মতো যন্ত্রণা। আমরা ভেউ ভেউ করে কাঁদতাম আর খেতাম। খেতে খেতে বলতাম ওরে শালার ইয়াহিয়া তোর জন্য আজকে আমাদের এত কষ্ট।"

ডোরা বলল, "আর এখন?"

"এখন মায়ের রান্না এতই ভালো যে যদি মা একটা কোলা ব্যাঙকে রেন্দে দেয় সেইটাই আমরা কাড়াকাড়ি করে খেয়ে ফেলব। ভাত রাঁধলে মনে হয় পোলাও। বেগুন ভর্তা বানালে মনে হয় কোরমা।" পাইকার ভাই হাতে কিল দিয়ে বলল, "যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন আমি কী করব জানো?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"ঢাকা শহরে একটা রেস্টুরেন্ট দেব, রেস্টুরেন্টের নাম হবে দ্য গ্রেট মা রেস্টুরেন্ট, মা রাঁধবে আর আমি কাস্টমারদের খাওয়াব। এক সপ্তাহে লাখপতি হয়ে যাব।"

মা পাইকারের কথা শুনে কোনো কথা না বলে মুখ টিপে হাসতে হাসতে রাঁধতে লাগলেন।

পাইকার ভাই তারপর ক্যাম্পের পেছন থেকে আমাদের ক্যাম্পের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গেল। একদিকে একটা খাল, সেখানে জংলি কাঁটা গাছে বোঝাই। তিন দিকে জঙ্গল। সেখানে বড় বড় গাছে মুক্তিযোদ্ধারা সব সময় পাহারায় থাকে।

ক্যাম্পের এক পাশে পানির জন্য একটা কুয়া করা হয়েছে। গভীর কুয়ার নিচে টলটলে পানি। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘুমানোর জন্য ব্যারাক করা হয়েছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ওপরে খড়ের ছাউনি। মাটিতে খড় বিছিয়ে সেখানে ঘুমানের ব্যবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালানের ভেতরে একটা ঘরের মাঝে সব গোলাবারুদ আর অস্ত্র সাজানো। সেই ঘরের সামনে একজন সব সময় একটা স্টেনগান নিয়ে পাহারা দেয়।

পাইকার ভাই আমাদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধোদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয় করানোর কায়দাটা খুবই মজার। যেমন দূর থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে সবুজ গেঞ্জি দেখেছ? এ হচ্ছে আমাদের উত্তম কুমার। প্রত্যেক দিন সকালে মুখের মাঝে সাবান ঘষে একটা ব্লেড হাত দিয়ে ধরে ক্যাড় ক্যাড় করে দাড়ি কামিয়ে ফেলে। উত্তম কুমার সব সময় ক্লিন শেভ।" তারপর আরেকজনকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে লাল গামছা দেখেছ শুকনো মতন মানুষ? সে হচ্ছে বকর। বকরকে শুকনা দেখলে কী হবে সে হচ্ছে এক নম্বর খাদক। তার কপালের দুই ইঞ্চি বাদে পুরোটা পেট। বকর একা দশজনের খাবার খেয়ে ফেলে! শুধু নুন দিয়ে দুই গামলা ভাত খেয়ে ফেলতে পারে।" তারপর আরেকজনকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে সাদা পায়জামা দেখেছ। তার নাম জলীল, জলীলের ধারে-কাছে কখনো যাবা না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

পাইকার ভাই বলল, "তার কারণ জলীল হচ্ছে আমাদের জ্ঞানী মানুষ। দুনিয়ার সবকিছু জানে। জলীলের কাছে বসলেই জ্ঞান দিতে শুরু করে। দেশ নিয়ে জ্ঞান, বিদেশ নিয়ে জ্ঞান, রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান, যুদ্ধ নিয়ে জ্ঞান— দুই মিনিটে জ্ঞানের চাপে পাগল হয়ে যাবে।" পাইকার ভাই গলা নামিয়ে বলল, "আমরা কী ঠিক করেছি, জানো?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"আমরা ঠিক করেছি এর পরেরবার যুদ্ধ করতে যাবার সময় জলীলকে মিলিটারি ক্যাম্পে রেখে আসব।"

"কেন?"

"সে তখন মিলিটারিদের এতই জ্ঞান দিতে শুরু করবে যে মিলিটারিরা বাপ বাপ করে দেশ ছেড়ে পালাবে। দুই দিনে দেশ স্বাধীন!"

পাইকার ভাইয়ের কথা শুনে আমরা হি হি করে হাসতে থাকলাম।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে রাত্রিবেলা রেডিওটা অন করে সবাই সেটাকে ঘিরে বসেছে। কাঁকনডুবিতে যখনই কেউ রেডিও শুনেছে তখন ভলিউম খুব কমিয়ে শুনত— গ্রামে রাজাকাররা ঘোরাঘুরি করে, তারা যদি জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে কেউ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই ক্যাম্পে সেই ভয় নাই তাই রেডিওটা একেবারে ফুল ভলিউমে চালু করা হয়েছে— যারা দূরে বসেছে তারাও যেন ঠিক করে শুনতে পারে। রেডিওতে খবর শোনাল, কোথায় কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে কয়টা পাকিস্তানি মিলিটারিকে মেরেছে তার হিসাব দিল। তারপর বজ্রকণ্ঠ শোনাল, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার একটা-দুইটা লাইনকে বলে বজ্রকণ্ঠ। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে কেমন আছেন কে জানে! বেঁচে আছেন না মেরেই ফেলেছে সেটাই বা কে জানে। তারপর কয়েকটা গান শোনাল। আমার সবচেয়ে প্রিয় গান, 'আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে কিন্তু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি' সেটা যখন শোনাচ্ছিল তখন সবাই হাত নেড়ে নেড়ে মাথা দুলিয়ে তাল দিচ্ছিল। তারপর শুরু হলো চরমপত্র, সবাই তখন নড়েচড়ে বসল। চরমপত্র থেকে মজার অনুষ্ঠান মনে হয় সারা পৃথিবীতে একটাও নাই। নাকি গলায় একজন বলতে লাগল, "বাঙালি পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইরা বাঙাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মইদ্যে ওয়ার্ল্ড ফাইটিং পজিশন পাইয়া আরে বাড়ি রে বাড়ি! ভোমা ভোমা সাইজের মুছুয়াগুলা ধক ধক কইরা দম ফালাইল... ইরাবতিতে জন্ম যার ইছামতিতে মরণ তার।... আমাগো বকশীবাজারের ছক্কু মিয়া ফাল পাইরা উঠল। বাইসাব, ১৯৭১ সালে বাঙাল মুলুকে মুছুয়া নামের মাল আছিল। হেগো চোটপাট বাইড়া যাওনের গতিকে হাজার হাজার বাঙালি বিচ্ছু হেগো পিঁপড়ার মতো ডইলা শেষ করছে!..."

শুনে আমরা সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকি।

রাত যখন আরো গভীর হলো তখন ডোরা শুতে গেল মুক্তিবাহিনীর মায়ের সাথে। আমাকে শুতে দেয়া হলো ব্যারাকের এক কোনায় আলাদা একটা বিছানায়।

শুয়ে শুয়ে আমি জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ শুনতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চাপা গলায় হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। নিশ্চয়ই যারা পাহারা দিচ্ছে তারা গল্পগুজব করছে। পাইকার ভাই বলেছে, জোছনা রাতে নাকি রাজকন্যার ভূতকে দেখা যায়, কোনো একদিন দেখতে হবে। তবে পাইকার ভাইয়ের গল্পকে বিশ্বাস করা মনে হয় ঠিক হবে না।

শুয়ে শুয়ে আমার নানির কথা মনে পড়ল। বেচারি নানি একা একা কেমন আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১.

সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল আজকের দিনটা একটু অন্য রকম। সবাই মনে হয় সব কাজকর্ম ফেলে বসে বসে খুব যত্ন করে তার রাইফেল, এসএলআর কিংবা স্টেনগান পরিষ্কার করছে। কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আজ সন্ধ্যাবেলা মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল অপারেশনে যাবে। অন্যান্য দিনে সবাই যে রকম হইচই-চেঁচামেচি করে আজকে সে রকম নেই, সবাই মনে হয় একটু চুপচাপ। মনে হয় যুদ্ধে যাবার আগে সবাই এ রকম চুপচাপ হয়ে যায়।

দুপুরে মা সবাইকে ভাত বেড়ে দিল। বেশি কথা না বলে সবাই খেয়ে নিল। খেতে খেতে ডোরা আমাকে ফিসফিস করে বলল, "মা এখানে কোথা থেকে এসেছে জানিস?"

"না। কোথা থেকে?"

"রাজাকাররা মাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মাসুদ ভাইয়ের দল অ্যামবুশ করেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। মাকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে তখন কী হয়েছে জানিস?"

"কী হয়েছে?"

"তার বাড়ি থেকে বলেছে তাকে বাড়িতে রাখবে না।"

"কেন?"

"রাজাকাররা মাকে অত্যাচার করেছিল সেই জন্য।" আমি ডোরার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ডোরা থামিয়ে দিয়ে বলল, "তখন মাসুদ ভাই মাকে তাদের সাথে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে এখানে তাকে মা ডাকে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুই কেমন করে জানিস?"

"মা আমাকে বলেছে।"

"সত্যি? নিজে বলেছে?"

"হ্যাঁ। মা বলেছে কাউকে জন্ম না দিয়েই তার এতগুলো ছেলে!"

ক্যাম্পের সবাই যে আসলেই মাকে মা মনে করে আমরা সেটাও দেখলাম। যখন গুলির বেল্ট গলায় ঝুলিয়ে, গ্রেনেডগুলো গামছায় পেঁচিয়ে কোমরে বেঁধে, রাইফেল এসএলআর ঘাড়ে নিয়ে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে তখন মাসুদ ভাই বলল, "মা, আপনি আসেন।"

মা বললেন, "আমার লজ্জা করে।"

"লজ্জা করলে হবে না। আসেন। আমাদের দোয়া করেন।"

মা এসে দাঁড়ালেন, তখন সবাই তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করল। মা সবার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ফি আমানিল্লাহ।"

মাসুদ ভাই তার দলটা নিয়ে যখন রওনা দিয়েছে তখন পাইকার ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে তার হাতের এসএলআরটা ওপরে তুলে হুংকার দিয়ে বলল, "যাই! কয়টা মিলিটারি মাইরা আই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কয়টা মারবেন পাইকার ভাই?"

পাইকার ভাই বলল, "তুমি বলো।"

আমি কিছু বলার আগেই ভোরা বলল, "একশটা।"

পাইকার ভাই সাথে সাথে বলল, "ঠিক আছে।"

আজকে ক্যাম্পে মানুষজন কম, রেডিওতে খবর শুনে আমরা সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি। গভীর রাতে উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘের আড়ালে চাঁদ, তাই চারদিকে কেমন জানি আবছা একধরনের আলো। এর মাঝে মুক্তিযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে।

আমি উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"যুদ্ধ শুরু হয়েছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, শোনো।"

আমি কান পেতে শুনলাম সত্যি সত্যি বহুদূর থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে। একজন বলল, "ঐ শোনো, জি থ্রি রাইফেল। পাকিস্তানিরা গুলি করছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন বলল, "এখন নাইন এম এম কারবাইন। এটা মাসুদ ভাই।"

মুক্তিযোদ্ধারা গুলির শব্দ শুনেই বুঝে ফেলে কোনটা কে গুলি করছে। শুনতে শুনতে আমিও একসময় বুঝতে শুরু করলাম। পাকিস্তানি জি থ্রি রাইফেল কেমন জানি ট্যাক-ডুম-ট্যাক-ডুম শব্দ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র থেকে টানা কর্কশ শব্দ।

একটা বিস্ফোরণের শব্দ হতেই একজন বলল, "গ্রেনেড। নিশ্চয়ই পাইকার।"

প্রথম প্রথম পাকিস্তানিদের গুলি বেশি হচ্ছিল, আস্তে আস্তে তাদের গুলির শব্দ কমে এল। গ্রেনেডের শব্দ হলো অনেকগুলো, তারপর শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের শব্দ।

ক্যাম্পের সবাই তখন আনন্দের মতো শব্দ করে চিৎকার করতে থাকে।

মাসুদ ভাইয়ের দল ফিরে এল পরের দিন দুপুরের দিকে। গত ছত্রিশ ঘণ্টা তাদের খাওয়া নাই, ঘুম নাই কিন্তু তাদের সবার মুখে হাসি। এ রকম যুদ্ধ তারা প্রায়ই করে। মাঝে মাঝেই সবাই ফিরে আসে না, এবার সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে— আনন্দটা সে জন্য। এবারের আনন্দটা একটু বেশি, কারণ তারা একজন পাকিস্তানি মিলিটারিকে ধরে এনেছে।

পাকিস্তানি মিলিটারিটা প্রায় তালগাছের মতো লম্বা, কম বয়স, মুখে একটা ছেলেমানুষি ভাব, শুধু তাই নয়, চেহারায় ভয় বা আতঙ্ক কিছু নাই, বরং এক ধরনের আনন্দের ভাব। হাত দুটো পেছনে বাঁধা। এছাড়া তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে পাকিস্তানি মিলিটারি, তাদের সাথে এই দেশের মানুষ যুদ্ধ করছে।

কারণটা একটু পরে বোঝা গেল। মাসুদ ভাই একটা গুলির বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে বলল, "তোমরা সবাই শোনো।"

হইচই-চেঁচামেচি সাথে সাথে থেমে গেল। মাসুদ ভাই বলল, "আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর এই অপারেশন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা না, একেবারে ছত্রিশ আনা সাকসেসফুল!"

সবাই 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে উঠল। মাসুদ ভাই বলল, "যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় হঠাৎ দেখি একজন পাকিস্তানি মিলিটারি দুই হাত ওপরে তুলে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আরেকটু হলে তাকে গুলি করে ফেলে দিতাম কিন্তু হাতে কোনো অস্ত্র নাই, দুই হাত ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছে সারেন্ডার করার মতো তাই গুলি করলাম না— এত গোলাগুলির মাঝে যে তার শরীরে গুলি লাগে নাই সেইটা আল্লাহর কুদরত।"

"সে এসে আমাদের মাঝখানে হাজির, আমাদের পাশে শুয়ে কী বলল জানো?"

"কী?"

"প্রথম কথাই হচ্ছে হাম জয় বাংলা হায়! হামকো গুলি মত করো—"

আমরা সবাই অবিশ্বাসের শব্দ করলাম! মাসুদ ভাই বলল, "আমরা তাই আর গুলি করি নাই। নদীর ঘাটে যে কয়টা পাকিস্তানি মিলিটারি ছিল তারা পালিয়ে যাবার পর—"

একজন মাঝখানে জিজ্ঞেস করল, "কয়টারে ফালাইছেন?"

পাইকার ভাই বলল, "খোকন আমাদের একশর টার্গেট দিছিল, মনে হয় টার্গেট পুরা হয় নাই।"

আরেকজন বলল, "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতে হবে তাহলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে।"

মাসুদ ভাই বলল, "মিলিটারি রাজাকার পালিয়ে যাবার পরই এই জয় বাংলা পাকিস্তান মিলিটারি বলল, যে সে বেলুচিস্তানের মানুষ। তার নাম ইউসুফ শাহ। পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের ওপর যে রকম অবিচার করে, ঠিক সে রকম বেলুচিদের ওপরও অত্যাচার করে। বেলুচিরা মুখ বুঝে অত্যাচার সহ্য করছে, বাঙালিরা করে নাই। বাঙালিরা বাঘের বাচ্চা। শিয়ালের জাতি হয়ে সে বাঘের বাচ্চাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না। যদি তার কপালে থাকে তাহলে দেশ স্বাধীন হবার পর যুদ্ধবন্দি হিসেবে তার মা-ভাই-বোনের কাছে ফিরে যাবে। আর কপালে যদি না থাকে তাহলে এই বাঙাল মুলুকেই সে মরতে চায়।"

ইউসুফ শাহ মাসুদ ভাইয়ের কোনো কথা বুঝে নাই কিন্তু তার পরও সে খুব জোরে মাথা নাড়তে লাগল। আমি মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ যদি জয় বাংলা হয় তাহলে তার হাত কেন বেঁধে রেখেছেন? হাতটা খুলে দেন?"

মাসুদ ভাই বলল, "এখনো খুলি নাই তার একটা কারণ আছে। যত যাই বলি এই মানুষটা পাকিস্তানি মিলিটারি, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় কি না এখনো জানি না। সে আমাদের যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধবন্দির মতো রাখতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাই কী বলছে ইউসুফ শাহ এবারে ঠিক বুঝতে পারছিল না, তাই খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়ে একবার মাসুদ ভাইয়ের দিকে আরেকবার আমাদের দিকে তাকাতে লাগল।

পাইকার ভাই বলল, "কমান্ডার, আমি তো এই মক্কেলের সাথে পুরা রাস্তা কথা বলতে বলতে আসছি, আমি আপনাদের বলতে পারি এই লোক পুরা জয় বাংলা! আমি এরে নিয়ে পরের অপারেশনে যেতে পারি, আমাগো সাথে হে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে পারে।"

মাসুদ ভাই বলল, "হতে পারে। তবু আমি এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না।"

জলীল নামের জ্ঞানী মুক্তিযোদ্ধা বলল, "আমি একে বিশ্বাস করি না। পাঞ্জাবিরা আমাদের সাথে যে অবিচার করেছে বেলুচিদের সাথে তার এক কণাও করে নাই। বাংলাদেশে বেলুচ রেজিমেন্ট জামালপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করতেছে। তারা সেইখানে মানুষ মারতেছে। আমি এদের বিশ্বাস করি না।"

একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "আমার মনে হয় আপনারা কয়েকজন মিলে ঠিক করেন কী করবেন! সবাই মিলে আলোচনা করে এটা ঠিক করতে পারবেন না।"

শেষ পর্যন্ত তাই হলো, কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ নিজেরা নিজেরা কথা বলল, তারপর সেটা ইউসুফ শাহকে বলা হলো। ইউসুফ শাহ মাথা নেড়ে রাজি হলো। তারপর তার হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো কিন্তু আমরা দেখলাম একজন মুক্তিযোদ্ধা স্টেনগান নিয়ে কাছাকাছি বসে আছে। ঠিক করা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা একজন মুক্তিযোদ্ধা স্টেনগান নিয়ে তাকে পাহারা দেবে। ইউসুফ শাহ খুবই আনন্দের সাথে এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধার যে দলটা অপারেশন করতে গিয়েছিল, আমরা তাদের পেছনে ঘুরঘুর করতে লাগলাম যুদ্ধের গল্প শোনার জন্য। সবাই ঠিক করে গল্প করতে পারে না, কিন্তু গল্প বলার মাঝে পাইকার ভাইয়ের তুলনা নাই। সে হাত-পা নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অভিনয় করে মুখ দিয়ে শব্দ করে যুদ্ধের যা একটা বর্ণনা দিল সেটা আর বলার মতো না! যারা তার সাথে যুদ্ধ করে এসেছে তারাও পর্যন্ত যুদ্ধের পুরো ঘটনাটা পাইকার ভাইয়ের মুখ থেকে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প শেষ করার পর যখন পাইকার ভাইয়ের আশপাশে কেউ নেই তখন আমি আর ডোরা তার কাছাকাছি গিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "পাইকার ভাই, আপনাকে একটা কথা বলি?"

"বলো।"

"আগে বলেন আপনি করবেন।"

"কথাটা না বললে আমি কেমন করে বলব যে আমি করব? মনে করো এখন তুমি যদি আমাকে বলো যে শরীরে তেল মেখে ইউসুফ শাহের সাথে কুস্তি করতে হবে তাহলে আমি কোনো দিন রাজি হব না।"

"না, না, আপনাকে কারো সাথে কুস্তি করতে হবে না।"

"তাহলে আগে বলো আমাকে কী করতে হবে?"

"আমাকে আর ডোরাকে অস্ত্র চালানো শিখাবেন? রাইফেল স্টেনগান দিয়ে কেমন করে গুলি করতে হয়। কেমন করে গ্রেনেড ছুড়তে হয়—"

"তোমরা এত বাচ্চা! তোমরা গোলাগুলি শিখতে চাও?"

ডোরা বলল, "এখন তো যুদ্ধের সময়। যুদ্ধের সময় তো সবাইকে সবকিছু শিখতে হয়।"

পাইকার ভাই বলল, "ঠিক আছে দেখি। কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করে দেখি। যদি রাজি হয়—"

আমরা নিঃশ্বাস ফেললাম। মাসুদ ভাইকে রাজি করানো খুবই কঠিন। তার ধারণা, যুদ্ধ খুবই খারাপ জিনিস, আমরা ছোট মানুষ, তাই যুদ্ধ থেকে আমাদের একশ হাত দূরে থাকতে হবে।

পাইকার ভাই কীভাবে কীভাবে জানি মাসুদ ভাইকে রাজি করিয়ে ফেলল, তারপর আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। পাইকার ভাই খুব যত্ন করে আমাদেরকে রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান, কারবাইন চালানো শেখাল। সত্যিকারের গুলি দিয়ে শেখানো গেল না, তাহলে শব্দ হবে আর শব্দ শুনে পাকিস্তানিরা জেনে যেতে পারে আমরা এখানে আছি।

আমাদেরকে মর্টার দিয়ে কেমন করে শেল ছোড়া হয় সেটা দেখাল। তারপর গ্রেনেড কেমন করে ছুড়তে হয় সেটা শেখাল। ভেতর থেকে ডেটোনেটর খুলে আমাদের হাতে একটা গ্রেনেড দিয়ে কেমন করে সেফটি পিন খুলে লিভারটা জোরে চেপে ধরে রেখে দূরে ছুড়ে দিতে হয় সেটা শেখাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খুবই আগ্রহ নিয়ে গ্রেনেড ছোড়া শিখলাম। দুজনে মিলে অনেকবার প্র্যাকটিস করলাম। কে কতদূরে ছুড়তে পারি সেটা নিয়ে আমি আর ডোরা দুজনে মিলে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলাম।

পাইকার ভাই খুবই খুশি হয়ে বলল, "তোমরা দুজন খুবই ভালো গ্রেনেড ছোড়া শিখেছ। শুধু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। সেফটি লিভার খোলার চার থেকে পাঁচ সেকেন্ড পরে তো এটা ফাটবে, তাই এটা ছোড়ার পরে, এই সময়ের মাঝে তোমাদের ঘাপটি মেরে শুয়ে পড়তে হবে— তা না হলে নিজের গ্রেনেডে নিজেই মোরব্বা হয়ে যাবে।"

পাইকার ভাই তারপর আমাদের ক্রলিং করা শেখাল, যুদ্ধের সময় নাকি মাথার ওপর দিয়ে গুলি যেতে থাকে, তখন একেবারে মাটির সাথে মিশে কনুইয়ে ভর দিয়ে ক্রলিং করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে হয়।

আমি আর ডোরা তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটিতে ক্রলিং করে সময় কাটালাম। দেখতে দেখতে আমাদের কনুইয়ের চামড়া খসখসে হয়ে উঠল।

আমরা যখন পাইকার ভাইয়ের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিই তখন ইউসুফ শাহ গালে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, মাঝে মাঝেই কেমন যেন অবাক হয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ত। আমাদের মতো ছোট বাচ্চারা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে পারি সেটা সে বিশ্বাসই করতে পারত না।

সপ্তাহ খানেক পর ইউসুফ শাহকে বর্ডার পার করে পাঠানোর জন্য মাসুদ ভাই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে রেডি করল। তারা কাঁকনডুবি গ্রামের কাছে দিয়ে যাবে, তাই মাসুদ ভাই আমাকে আর ডোরাকে জিজ্ঞেস করল আমরা বাড়িতে কোনো চিঠি পাঠাতে চাই কি না।

ডোরা অনেক সময় নিয়ে লম্বা একটা চিঠি লিখল, সেখানে ক্যাম্পের সব খবর আছে। আমরা যে খুব ভালো আছি সেটা সে ভালো করে বুঝিয়ে দিল। সবাই আমাদের যত্ন করে, বিশেষ করে ক্যাম্পের মা ডোরাকে আলাদাভাবে দেখে-শুনে রাখে, সেটাও সে খুব গুছিয়ে লিখে দিল।

আমি জীবনে চিঠি লিখি নাই, নানিও লেখাপড়া জানে না, তাই চিঠি লিখে কী লাভ হবে বুঝতে পারলাম না। ডোরা তখন আমাকে ধমক দিয়ে বলল "ঢং করবি না। সুন্দর করে একটা চিঠি লেখ—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্য হয়ে আমি চিঠি লিখলাম :

নানি,

আমার কদমবুচি লইবেন। পর সমাচার এই যে মুকতি বাহিনির কেম্পে আমরা ভালা আছি। আমার জন্য তুমি চিন্তা কুনু করিও না। আমি খুবই ভালা আছি। চিন্তার কুনু কারণ নেই। তুমি কেমন আছ? আশা করি তুমি ভালা আছ। আমি ভালা আছি। আমার জন্য দুয়া করিও এবং ডোরার জন্য দুয়া করিও। একই সাথে সব মুকতি বাহিনির জন্য দুয়া করিও।

ইতি

রঞ্জু

আমার চিঠিটা দেখে ডোরা খুবই বিরক্ত হলো, বলল, "এটা কী রকম ফালতু একটা চিঠি লিখেছিস?"

আমি রেগে বললাম, "আমার ইচ্ছে হলে আমি ফালতু চিঠি লিখব। তাতে তোর কী?"

"এক কথা বারবার। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ। আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? তার ওপর কতগুলো বানান ভুল।"

আমি বললাম, "তাতে তোর সমস্যা কী? নানি লেখাপড়া জানে না—বানান ভুল থাকলেই কী আর না থাকলেই কী, কেউ একজন তাকে পড়ে শোনাবে—"

ডোরা তার পরও গজগজ করতে লাগল।

যাবার আগে ইউসুফ শাহ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। ঠিক রওনা দেয়ার আগে মা এসে দাঁড়ালেন। মুক্তিযোদ্ধা দুইজন মায়ের পা ধরে সালাম করল, মা তাদের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ফি আমানিল্লাহ।"

ইউসুফ শাহও হঠাৎ কী মনে করে মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করল। মা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ইউসুফ শাহের মাথার হাত রেখে বললেন, "ফি আমানিল্লাহ।"

ইউসুফ শাহ হাত দিয়ে চোখ মুছে তার নিজের ভাষায় কী যেন বলল। তার কথাটা কী, আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু কী বলতে চাইছে, সেটা বুঝতে আমাদের কারো কোনো সমস্যা হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.

আমরা আস্তে আস্তে ক্যাম্পে দিন কাটানোতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। মুক্তিবাহিনী প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার-দুবার করে অপারেশনে যায়। তারা এই অপারেশনগুলোকে বলে হিট অ্যান্ড রান— অর্থাৎ আক্রমণ করে সরে যাওয়া। সেই জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয় খুব কম। কখনো কখনো দূর থেকে মর্টারের গোলা ফেলে চলে আসে। মাঝে মাঝে তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে। সারা রাত গোলাগুলি করে। সকাল হবার আগে চলে আসে। সবচেয়ে সোজা অপারেশন রাজাকার আর শান্তি কমিটির মেম্বারদের শাস্তি দেওয়া অপারেশন। এই অপারেশনগুলোর কারণে রাজাকারে যোগ দেওয়া কমে গেছে।

আগে আমাদের অস্ত্র খুব বেশি ছিল না, হঠাৎ করে অনেক অস্ত্র এসে গেছে। কয়েকদিন আগে মাসুদ ভাইয়েরা খবর পেয়েছে অস্ত্রের বিশাল একটা চালান আসছে। রাজাকাররা রাত জেগে নদীতে পাহারা দেয়, নৌকা দেখলেই সার্চ করে, তাই তাদের ওপর দায়িত্ব হলো রাজাকার বাহিনীকে শেষ করে দেওয়া। মাসুদ ভাইয়েরা সময়মতো অপারেশন চালিয়েছে— গোলাগুলি শুরু হতেই রাজাকারগুলো জান নিয়ে পালিয়েছে— তখন অস্ত্রের নৌকাগুলো ভেতরে নিয়ে এসেছে। সেই অস্ত্রের ভাগ মাসুদ ভাইও পেয়েছে— দুই নৌকা অস্ত্র। তাই মাসুদ ভাইয়ের মন-মেজাজ খুব ভালো। সেই অস্ত্র আমাদের ক্যাম্পে আনা হয়েছে, মাসুদ ভাই এখন সময় পেলেই সেই অস্ত্র হাত বুলিয়ে দেখে, মিষ্টি দেখে আমাদের জিবে যে রকম পানি চলে আসে, এই অস্ত্রগুলো দেখে মাসুদ ভাইয়ের জিবে সে রকম পানি চলে আসে।

শুধু যে অস্ত্র এসেছে তা নয়, একসাথে গ্রামের কমবয়সী অনেকগুলো মানুষ এসেছে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিতে। ইপিআরের সেই নিষ্ঠুর সুবেদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নূতন মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যাচার করে যাচ্ছে! ক্রলিং করতে করতে তাদের কনুই আর হাঁটুর ছাল উঠে গেছে।

একদিন রাতে আমরা রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছি। কোনো একটা কারণে আজকে রেডিও শোনার জন্য খুব বেশি মানুষ নাই। নূতন যারা এসেছে, তাদের বেশ কয়েকজন বসে বসে চরমপত্র শুনতে শুনতে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর ছাত্ররা কীভাবে নিয়াজীর পায়ের তলা চেটে যাচ্ছে— সেটা নিয়ে যখন টিটকারি করছিল তখন হঠাৎ একজন মানুষ উঠে দাঁড়াল। আমি খুবই অবাক হলাম, চরমপত্র এত মজার একটা অনুষ্ঠান সেটা শুনতে শুনতে কেউ উঠে যেতে পারে না। হয়তো তার খুবই বাথরুম চেপেছে— কিন্তু তবু আমার কেন জানি সন্দেহ হলো। তাই আসলেই বাথরুম করতে গিয়েছে কি না, দেখার জন্য আমি মানুষটার পেছনে পেছনে গেলাম। দেখলাম সে মোটেই বাথরুম করতে যায়নি। ব্যারাকে তার জায়গায় বসে বিছানার নিচ থেকে একটা নোটবই বের করে একটা টর্চলাইটের আলোতে কিছু একটা লিখছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মানুষটা ভীষণ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

আমি বললাম, "আমি।"

মানুষটা আমার মুখে টর্চের আলো ফেলে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "আমি কে?"

"আমি রঞ্জু।"

"তুমি কী চাও।"

"কিছু চাই না।"

"তাহলে?"

"তাহলে কী?"

মানুষটা আমার কথায় খুবই বিরক্ত হলো। বলল, "তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, "এমনি।" ছোট হওয়ায় অনেক সুবিধা। কিছু বুঝি না, কিছু জানি না, হাবাগোবা মানুষের মতো ভান করে থাকা যায়। তাই আমি হাবাগোবা ধরনের মানুষ, এ রকম ভান করে দাঁড়িয়েই থাকলাম। মানুষটা তখন খেঁকিয়ে উঠে বলল, "যাও! যাও এখান থেকে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা।" তারপর হেঁটে হেঁটে চরমপত্র শুনতে চলে এলাম। ডোরা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

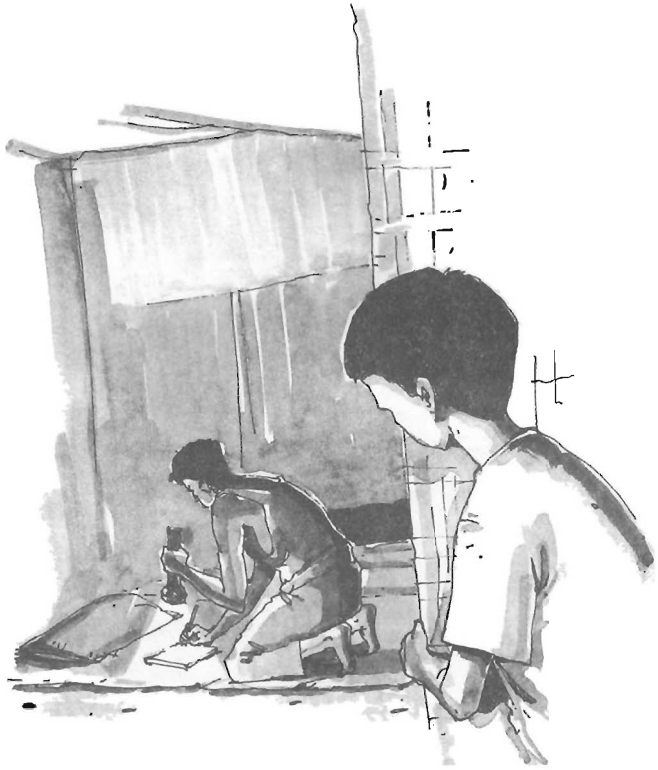

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঐ তো।"

ডোরা বিরক্ত হয়ে বলল, "ঐ তো মানে আবার কী?"

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "মনে হয় এইখানে একজন রাজাকার ঢুকেছে।"

"রাজাকার।"

"হ্যাঁ।"

ডোরা ফিসফিস করে বলল, "তুই কেমন করে বুঝতে পারলি?"

"এখনো পুরাপুরি বুঝতে পারি নাই। চরমপত্রটা শেষ হোক, তারপরে বলব।"

ডোরা শোনার জন্য অধৈর্য হয়ে গেল। তাই তাকে নিয়ে এক কোনায় গিয়ে যা কিছু বললাম শুনে ডোরাও খুব উত্তেজিত হয়ে গেল। বলল, "চল, রাজাকারকে গিয়ে ধরি। গুলি করে দিই।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "এখনো তো প্রমাণ হয় নাই সে রাজাকার। যদি রাজাকার না হয়?"

"তাহলে?"

"আগে দেখি মানুষটা কী করে।"

"কীভাবে দেখবি?"

আমি আবার মাথা চুলকালাম, বললাম, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"খাওয়ার সময় তুই মানুষটাকে ব্যস্ত রাখবি, আমি তখন তার বিছানাপত্র জামাকাপড় খুঁজে দেখব কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।"

ডোরা বলল, "ঠিক আছে।"

কাজেই খেতে বসে আমি খুব তাড়াতাড়ি গপগপ করে খেয়ে শেষ করে উঠে গেলাম। ডোরা মানুষটার পাশে বসে থাকল, মানুষটা যখন আধাআধি খেয়েছে তখন ধাক্কা মেরে তার খাবারের থালাটা ফেলে দিল। ইচ্ছে করে থালাটা ফেলেনি— হঠাৎ করে ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে, এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলে আবার নূতন করে তাকে খাবার দেয়া হলো।

আমি ততক্ষণে তার বিছানার নিচ থেকে একটা রুলটানা খাতা বের করেছি, প্রথম দিককার পৃষ্ঠাতে অনেক কিছু লেখা, আবছা অন্ধকারে পড়ার কোনো উপায় নেই। আমি বেশি ঝামেলায় না গিয়ে খাতার পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে নিলাম। খাতার সাথে একটা বলপয়েন্ট কলমও ছিল। আমি কলম দিয়ে সাদা পৃষ্ঠাতে হিজিবিজি লিখে ভরে ফেললাম। খাতাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলে পরীক্ষা করলেও অন্ধকারে বুঝতে পারবে না যে পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছি। খোঁজাখুঁজি করে আমি একটা বোতল পেলাম, বোতলের ছিপি খুলে গন্ধ নিতেই বুঝতে পারলাম ভেতরে কেরোসিন। আমাদের ক্যাম্পে কেরোসিন খুব হিসাব করে খরচ করতে হয়। তার মাঝে এতোটা কেরোসিন এই মানুষটা সরিয়ে নিল কেমন করে? তার চাইতে বড় কথা কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালায়, এই কেরোসিন দিয়ে সে কোথায় আগুন জ্বালাবে? কেন জ্বালাবে?

আমার চিন্তা করার বেশি সময় নাই। তাই কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম ব্যারাকের পেছনে। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি পড়েছিল, সেখানে বৃষ্টির পানি জমে আছে। আমি পানিটা ফেলে সেখানে কেরোসিনটা ঢেলে রাখলাম। এখন বোতলটাতে কোনো রকম তরল ভরে রাখতে হবে। সেটা অবশ্যি সমস্যা হলো না, ভীষণ বাথরুম পেয়েছিল, কাজটা বাইরে না করে বোতলের ভেতরে করে ফেললাম— এক ধাক্কায় দুটো কাজ হয়ে গেল। আমি তখন বোতলটা আগের জায়গায় রেখে ফিরে এলাম।

ততক্ষণে খাওয়া শেষের দিকে, আমি ডোরার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম কাজ শেষ। ডোরাও তখন মানুষটার সামনে থেকে সরে এল।

ক্যাম্পের পেছনে বড় বড় মাটির চুলোয় তখনো গনগনে কয়লার লালচে একটা আলো রয়েছে, সেই আলোতে আমরা মানুষটার কাগজে কী লেখা আছে পড়ার চেষ্টা করলাম। সেখানে লেখা :

রাইফেল	প্রায় ত্রিশটা
এসএলআর	প্রায় ১৫টা
এনারগা	আনুমানিক ১০টা
এলএমজি	চারটা
স্পেয়ার ব্যারেল	চারটা
স্পেয়ার ম্যাগাজিন	চার-পাঁচটা
দুই ইঞ্চি মর্টার	সাতটা
তিন ইঞ্চি মর্টার	একটা
গ্রেনেড	একশোর বেশি
গুলি	আনুমানিক দশ হাজার রাউন্ড

অন্য একটা কাগজে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, তার পাশে কে কোন গ্রামের, বাবার নাম কী এবং তার পাশে কোথাও লেখা আওয়ামী লীগ, কোথাও ন্যাপ, কোথাও হিন্দু লেখা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে আমাদের কোনো সন্দেহই থাকল না, মানুষটা নিশ্চয়ই রাজাকার। তা না হলে অস্ত্রপাতির তালিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের নাম-ঠিকানা কাগজে লিখেছে কেন?

ডোরা বলল, "মাসুদ ভাইয়ের কাছে চল।"

আমরা মাসুদ ভাইকে খুঁজে পেলাম না। শুনলাম কোনো এক জায়গায় বসে জরুরি বৈঠক করছে। পাইকার ভাইকেও খুঁজে পেলাম না, মনে হয় একই সাথে একই মিটিংয়ে আছে। আমি কয়েকজনকে বলার চেষ্টা করলাম মাসুদ ভাইকে দরকার, খুবই জরুরি কিন্তু কেউ আমাদের একটুও পাত্তা দিল না। ছোট হওয়ার এই হচ্ছে সমস্যা— কেউ গুরুত্ব দেয় না।

আমি বললাম, "কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি।"

ডোরা বলল, "যদি তার মাঝে কিছু একটা হয়ে যায়?"

আমি বললাম, "হবে না। আমি তো এই রাজাকারের সাথে একই ঘরে, সারা রাত চোখে চোখে রাখব। কিছু করতে চাইলেই চিল্লিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেব।"

রাত্রি বেলা আমি সত্যি সত্যি মানুষটাকে চোখে চোখে রাখলাম, না ঘুমিয়ে জেগে রইলাম। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম, নিজেই জানি না। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি যে জেগে আছি, তাই ঘুমিয়ে গেছি, সেটাও বুঝতে পারছি না।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আর আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সাথে সাথে আমার মনে পড়ল আমার রাজাকারটাকে চোখে চোখে রাখার কথা। আবছা অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম মানুষটা তার বিছানায় নাই। আমি সাথে সাথে উঠে বসে চারদিকে তাকালাম। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখি বাইরে আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো একজন নড়ছে। আমি চুপি চুপি বের হয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম মানুষটা কী করছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, মনে হলো একটা কাপড় টানাটানি করে সেখানে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আমি তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললাম, "সাবধান! রাজাকার! রাজাকার!"

মানুষটা ঝট করে ঘুরে আমার দিকে তাকাল, তারপর হাতের সবকিছু নিচে ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগল।

আমার চিৎকারে অনেকে ঘুম থেকে উঠে গেছে, কয়েকজন হাতে স্টেনগান নিয়ে ছুটে এসে বলল, "কোথায়? কোথায় রাজাকার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা যেদিকে দৌড়ে গিয়েছে আমি হাত দিয়ে দেখালাম। ঠিক কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারছে না, সবাই অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে। ডোরাও উঠে এসেছে। একসময় মাসুদ ভাই বের হয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "মাসুদ ভাই, রাজাকার।"

"কোথায় রাজাকার?" আমি তখন পকেট থেকে কাগজগুলো বের করে মাসুদ ভাইকে দিলাম, বললাম, "এই দেখেন।"

"এগুলো কিসের কাগজ?'

"যে মানুষটা জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তার নোটবইয়ে এগুলো লেখা ছিল।"

"তুমি কেমন করে পেলে?"

আমি তখন সবকিছু খুলে বললাম, মাসুদ ভাই সবকিছু শুনে তখন তখনই মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা দলকে পাঠাল রাজাকারটাকে জঙ্গলের ভেতর থেকে ধরে আনতে।

ঘরের বাইরে কেরোসিনের বোতলটা পাওয়া গেল। বোতলের মুখে কাপড়ের সলতে লাগিয়ে সেখানে আগুন দিয়ে বোতলটাকে অস্ত্রের ঘরে ছুড়ে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যেহেতু ভেতরে কেরোসিন নেই, অন্য কিছু আছে তাই কিছুতেই আগুন ধরাতে পারেনি। কেরোসিনের বদলে ভেতরে কী আছে, সেটা আমি পরিষ্কার করে না বললেও মাসুদ ভাই বোতলটা হাতে নিয়েই বুঝে গেলেন এবং সবাই তখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিল।

শুধু ডোরা বলল, "ছিঃ! নোংরা খবিস কোথাকার!"

রাজাকারটাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না।

ভোরবেলা নাস্তা করতে করতে মাসুদ ভাই বলল, "এখন সবাই রেডি হও, যেকোনো দিন মিলিটারি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!"

পাইকার ভাই বলল, "ভালোই হলো। আগে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের মাইলের পর মাইল হাঁটতে হতো। এখন কোনো পরিশ্রম নাই। আমাদের যুদ্ধ করতে যেতে হবে না। যুদ্ধ আমাদের কাছে চলে আসছে!"

মাসুদ ভাই হাসল, হেসে বলল, "এই ভাবে দেখলে ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হলো আমরা হচ্ছি গেরিলা। গেরিলারা তিন রকম যুদ্ধ করে। রেইড— মানে শত্রুর ঘাঁটিতে ঝটিকা আক্রমণ, অ্যামবুশ— মানে তারা যখন কোথাও যায় তখন লুকিয়ে তাদের আক্রমণ আর স্নাইপিং— অর্থাৎ দূর থেকে গুলি করা। গেরিলা যুদ্ধের কোনো কেতাবে লেখা নাই আমরা আরাম করে বসে বসে অপেক্ষা করব কোন সময় তারা আমাদের আক্রমণ করবে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাদের এখানে আসা সোজা কথা না— তাদেরকে এই পর্যন্ত আসতে দেব না, তার আগেই অ্যামবুশ করব।"

মাসুদ ভাই মাথা চুলকাল, "কিন্তু তারা আমাদের পজিশন জেনে গেছে— দূর থেকে মর্টার দিয়ে শেলিং করে ছাতু বানিয়ে দেবে। প্লেন ডাকিয়ে এনে প্লেন থেকেও স্ট্রাফিং করতে পারে।"

পাইকার ভাই একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে আর ডোরাকে দেখিয়ে বলল, "এই বাচ্চাগুলো যখন বলেছে খুবই জরুরি দরকার আমার সাথে দেখা করার, তখন যদি তাদের কথাকে গুরুত্ব দিতে তাহলে এই ঝামেলা হতো না! রাজাকারটা তাহলে এইভাবে পালাতে পারত না!"

একজন মুক্তিযোদ্ধা অপরাধী মুখে বলল, "আসলে বুঝতে পারি নাই। ভাবছি ছোট বাচ্চা তাদের আবার জরুরি কাজ আর কী হবে?"

মাসুদ ভাই বলল, "যাই হোক, যা হবার হয়েছে, এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আমরা এখন কী করব, সেটা ঠিক করা যাক।"

খুব কম কথা বলে সেই রকম একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "আসলে আমাদের এখন এই ক্যাম্পটা গুটিয়ে আশপাশের গ্রামে চলে যাওয়া উচিত। একটা একটা গ্রাম মুক্ত করে মুক্তাঞ্চল তৈরি করার সময় হয়েছে।"

মাসুদ ভাই বলল, "ঠিকই বলেছ। আমাদের এখন লুকিয়ে থাকার সময় শেষ— এখন পাকিস্তানিদের লুকিয়ে থাকার সময় শুরু।"

তখন মাসুদ ভাই অন্য সব মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কীভাবে কী করা যায়, সেটা নিয়ে আলাপ করতে লাগল। প্রথম দিকে আলাপটা সহজ ছিল, আমরা সেটা বসে বসে শুনলাম, আস্তে আস্তে আলাপটা জটিল হয়ে গেল, তখন আমি আর ডোরা উঠে গেলাম।

আমি ডোরাকে বললাম, "একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে।"

"কী ভালো হয়েছে?"

"আমরা এত দিন থেকে বলছি আমাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যেতে, আমাদের নিয়ে যায় নাই! এখন যখন যুদ্ধটা এখানেই হবে, এখন তো আমরা যুদ্ধটা দেখতে পারব!"

"খালি দেখব না, যুদ্ধ করব।" ডোরা মুখ শক্ত করে বলল, "করবই করব।"

মুক্তিবাহিনী যখন আক্রমণ করে তখন তারা হঠাৎ করে গোপনে আক্রমণ করতে পারে। যদি অবস্থা ভালো থাকে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, অবস্থা একটু খারাপ হলেই সরে পড়তে পারে। পাকিস্তান মিলিটারির সেই সুবিধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই, তাদের আক্রমণ করতে হলে অনেক লটবহর নিয়ে আক্রমণ করতে হয়— তারা কবে কখন কোন দিকে যাচ্ছে, সেই খবর অনেক আগেই পৌঁছে যায়। তাই যেদিন পাকিস্তানি মিলিটারি আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসবে আমরা একদিন আগেই তার খবর পেয়ে গেলাম।

রাত্রি বেলা খাওয়ার আগে মাসুদ ভাই সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করল। একটা গুলির বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে মাসুদ ভাই বলল, "আমরা এর আগে অনেক অপারেশন করেছি, মিলিটারির সাথে যুদ্ধ নূতন কিছু না। কিন্তু কালকের যুদ্ধটা অন্য রকম— এই প্রথমবার আমরা এক জায়গায় বসে থাকব আর মিলিটারি আমাদের সেই জায়গায় আক্রমণ করবে। আমরা আগে কখনো এই রকম যুদ্ধ করি নাই— সত্যি কথা বলতে কী— আমি এই যুদ্ধ করতে চাই না। কাজেই কালকের যুদ্ধটা হবে শুধুমাত্র ঠেকিয়ে রাখা।

"আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আমাদের অস্ত্র। আমাদের গোলাগুলি। তাই সেগুলো আমাদের রক্ষা করতে হবে। কাল সবাইকে অস্ত্র ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে— আমরা রঞ্জু-খোকনকেও একটা করে অস্ত্র দেব। মাকেও একটা অস্ত্র দেব।"

কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু আমি আর ডোরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। মাসুদ ভাই বলল, "বাকি অস্ত্র আমরা এখান থেকে সরিয়ে লুকিয়ে ফেলব। আমি মনে করি না পাকিস্তানি মিলিটারি এত দূর আসতে পারবে— তার পরও আমরা কোনো ঝুঁকি নিব না।"

"আমরা যে জঙ্গলে আছি সেখানে ঢুকতে হলে একটা খাল পার হতে হয়। আমরা সেই খালের ওপর তাদেরকে অ্যামবুশ করব। সেখানে ফাঁকা জায়গা, কভার নেয়ার জায়গা নাই। দুপুরের আগে তারা সেখানে পৌঁছাতে পারবে না, যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলেই যথেষ্ট। রাত্রে তারা এখানে থাকবে না। এই জঙ্গলে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলে তারা জন্মেও আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।"

মাসুদ ভাই আরও অনেক কিছু বলল, উত্তেজনার জন্য আমি তার বেশির ভাগই শুনতে পাচ্ছিলাম না— কাল আমাদেরও অস্ত্র দেবে— কী সাংঘাতিক! কোন অস্ত্র দেবে? ইশ! যদি একটা স্টেনগান পেতাম কী মজা হতো! সাথে একশ রাউন্ড গুলি আর দুইটা গ্রেনেড!

উত্তেজনায় আমার চোখে ঘুম আসছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমিয়েছি তখন মনে হলো প্রায় সাথে সাথে ঘুম থেকে ডেকে তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। তারপর একজন একজন করে সবাইকে অস্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া শুরু হলো। আমি আর ডোরা সত্যি সত্যি একটা করে স্টেনগান পেয়েছি। সাথে একশ রাউন্ড করে গুলি আর দুইটা গ্রেনেড। আমরা নিজেদের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছি না। স্টেনগানের কালো শীতল নলে হাত বোলাতে গিয়ে আমার শরীরে কেমন জানি শিহরণ হতে থাকে।

অন্ধকার থাকতেই আমরা পুরো ক্যাম্প খালি করে বের হয়ে গেলাম। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা অবশ্যি রাত থাকতেই খালের পাড়ে গিয়ে পজিশন নিয়েছে। আমরা যখন খালের পাড়ে গিয়েছি তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম গিয়ে দেখব সবাই বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কী অবাক ব্যাপার কোথাও কেউ নেই! আমি যখন খোঁজাখুঁজি করছি তখন হঠাৎ একটা ঝোপ নড়ে উঠল আর তার ভেতর থেকে পাইকার ভাইয়ের মাথা বের হয়ে এল! পাইকার ভাই বলল, "এই যে আণ্ডা আর বাচ্চা! দেখি অস্ত্র হাতে তোমাদের কেমন লাগে!"

আমি আর ডোরা হাতের স্টেনগান উঁচু করে ধরতেই আশপাশে অনেকগুলো ঝোপ নড়ে উঠল, সেখান থেকে অনেকগুলো মাথা বের হয়ে এল এবং সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। আমাদের একই সাথে একটু লজ্জা লাগছে, আবার আনন্দে বুকটা ফেটেও যাচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম অনেকগুলো ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে, তার ভেতরে সবাই অপেক্ষা করছে। গাছের ডালপাতা ঝোপঝাড় দিয়ে তাদের ঢেকে দেয়া হয়েছে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না, এখানে এতজন মুক্তিযোদ্ধা অপেক্ষা করছে। জঙ্গলের আরো ভেতরে আরো মুক্তিযোদ্ধাও লুকিয়ে আছে।

মাসুদ ভাই বলল, "রঞ্জু আর খোকন! তোমরা পেছনে চলে যাও।"

"পেছনে? পেছনে কেন?"

"তোমরা ছোট, সে জন্য। তোমাদের যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে হবে।"

কাজেই আমি আর ডোরা মন খারাপ করে অনেক দূরে সরে গেলাম। যেখানে গেলাম সেই জায়গাটাও খালের কাছে— কিন্তু রাস্তা থেকে অনেক দূরে। সেখানে একটা ট্রেঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেলাম। উপরে গাছপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে কেউ আছে। এই ট্রেঞ্চের ভেতরে আরো দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আছে— একজন জলীল ভাই, তাকে নিয়ে পাইকার ভাই আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবধান করে দিয়েছিল, তার কারণ জলীল ভাই সব সময় জ্ঞানের কথা বলে, সবার কান ঝালাপালা করে দেয়। পাইকার ভাইয়ের কথা ভুল নয়। সত্যি সত্যি জলীল ভাই কিছুক্ষণের মাঝে আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে কথা বলতে লাগল, "বুঝলে রঞ্জু আর খোকন, এই যুদ্ধে আমরা খুব বেকায়দায় আছি। পাকিস্তানের পক্ষে আছে আমেরিকা আর চীন। শুধু তা-ই না, সব মিডল ইস্টের দেশ। আমাদের সাথে খালি ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার সাথে রাশিয়া। ইন্ডিয়ার নিজেরই ঠিক নাই, আমাদের সাহায্য করবে কীভাবে? তার উপরে তাদের ঘাড়ে আছে এক কোটি শরণার্থী। তারা কি শরণার্থীদের খাওয়াবে, নাকি আমাদের সাহায্য করবে? তবে এই অবস্থায় একটা সুবিধা আছে। ইন্ডিয়া কত দিন এক কোটি মানুষকে খাওয়াবে? কাজেই বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের লাভ। তাই তাদের ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু সমস্যা হলো..." কিছুক্ষণের মাঝেই আমার আর ডোরার মাথা ধরে গেল।

যুদ্ধের পরিকল্পনাটা সবাইকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। মাটির সড়ক ধরে পাকিস্তান মিলিটারির দলটা খালের সামনে পৌঁছানোর পর যখন তারা খালটা পার হতে শুরু করবে তখন আক্রমণ শুরু করা হবে। সবাইকে একশবার করে বলে দেয়া হলো মাসুদ ভাই যখন তার এলএমজি দিয়ে গুলি শুরু করবে ঠিক তখন সবাইকে গুলি শুরু করতে হবে। তার আগে কেউ একটা গুলিও করতে পারবে না। মাসুদ ভাই সবাইকে বলে দিয়েছে কেউ যেন আগে গুলি না করে, যদি করা হয় তাহলে মিলিটারিকে অতর্কিতে আক্রমণ করার সুযোগটা নষ্ট হয়ে যাবে। সব মুক্তিযোদ্ধা রাজি হয়েছে। প্রথম প্রথম এটা নিয়ে সমস্যা হতো, নার্ভাস হয়ে আগেই কেউ না কেউ গুলি করে দিত। এখন সমস্যা হয় না। ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করে।

ট্রেঞ্চের ভেতরে আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করছি। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখছি। এখান থেকে দূরে মাটির সড়কটা আবছাভাবে দেখা যায়। মিলিটারিগুলো সেই সড়কে হাজির হওয়ার পরই যুদ্ধ শুরু হবে, তার আগে কারো কিছু করার নেই। অন্যেরা শুধু অপেক্ষা করবে— আমার আর ডোরার কপাল খারাপ, অপেক্ষা করার সময় আমাদের জ্ঞানী মুক্তিযোদ্ধার গভীর জ্ঞানের কথা শুনতে হবে।

ডোরা একটু পরে পরে মাথা বের করে উঁকি দিচ্ছিল— একবার উঁকি দিয়ে মাথাটা ভেতরে ঢোকানোর আগে কী মনে করে উল্টো দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাল তারপর ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। আমিও মাথা বের করলাম, দেখলাম খালের তীর ধরে মিলিটারিদের বিশাল একটা বাহিনী আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তারা মোটেও সড়ক ধরে এসে খালটা পার হচ্ছে না। উত্তর দিকে কোনো একটা জায়গায় খালটা আগে পার হয়ে নিয়েছে, এখন আমাদের দিকে আসছে! ওরা মোটেও সামনে দিয়ে আক্রমণ করবে না, ওরা আক্রমণ করবে পেছন দিক দিয়ে। সর্বনাশ!

আমি ডোরার দিকে তাকালাম, ডোরা আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, "এখন কী হবে?"

ডোরা বলল, "মাসুদ ভাইদের জানাতে হবে!"

"হ্যাঁ।" বলে আমি আর ডোরা লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। আমাদের জ্ঞানী মুক্তিযোদ্ধা হতবাক হয়ে বলল, "কী করো? কী করো?"

ডোরা বলল, "মিলিটারি চলে এসেছে! উল্টো দিক দিয়ে।"

মিলিটারিগুলো যেন আমাদের দেখতে না পায় সেই ভাবে গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটে আমি আর ডোরা মাসুদ ভাইয়ের ট্রেঞ্চটা বের করলাম, মাসুদ ভাই তাঁর এলএমজিটার পেছনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল, আমাদের দেখে আঁতকে উঠল, ধমক দিয়ে বলল, "কী করছ তোমরা? বাইরে কেন?"

আমি আর ডোরা একসাথে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "মিলিটারি!"

"মিলিটারি?"

"হ্যাঁ।" আমি হড়বড় করে বললাম, "খাল পার হয়ে গেছে, পেছন থেকে আসছে।"

ডোরা বলল, "এদিক দিয়ে আসবে না—"

মাসুদ ভাই হকচকিয়ে গেল, কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিল, দুই-এক সেকেন্ড কিছু একটা চিন্তা করল, তারপর বলল, "জঙ্গলে ঢোকার আগে অ্যামবুশ করতে হবে। সবাই বের হও।"

আমরা দেখলাম ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে পিলপিল করে মুক্তিযোদ্ধারা বের হতে শুরু করল, তারপর গুড়ি মেরে মিলিটারিদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমি আর ডোরা তাদের পিছু পিছু যেতে লাগলাম। "তোমরা ছোট, তোমরা পেছনে থাকো", এ রকম কথা বলার মতো অবস্থা কারো নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক সেকেন্ডে যুদ্ধের পুরো পরিকল্পনাটা পাল্টে দিতে হলো। মুক্তিযোদ্ধারা ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে গেল। আমি আর ডোরা একটা বড় গাছের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। এখান থেকে মিলিটারি দলটাকে দেখা যাচ্ছে। দলের সামনে একটা বাঙালি চেহারার মানুষ। সে পথ দেখিয়ে আনছে, কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মানুষটাকে আমি চিনতে পারলাম। এই মানুষটা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের সেই রাজাকার! মানুষ কেমন করে রাজাকার হয়?

মিলিটারিগুলো মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছাতেই মাসুদ ভাইয়ের এলএমজি গর্জন করে উঠল। সাথে সাথে চারপাশের অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র একসাথে গর্জন করে উঠল। আমি আর ডোরাও জীবনের প্রথমবার স্টেনগানের ট্রিগার টেনে ধরলাম, স্টেনগানটা আমাদের হাতে জীবন্ত প্রাণীর মতো কেঁপে কেঁপে উঠল, প্রচণ্ড গুলির শব্দে আমাদের কানে তালা লেগে গেল।

সামনে থাকা মিলিটারিগুলো কাটা কলাগাছের মতো নিচে পড়ে যেতে শুরু করল, অন্যগুলোও সাথে সাথে শুয়ে পড়েছে, কভার নেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড গুলির জন্য কেউ মাথা তুলতে পারছে না— গড়িয়ে গড়িয়ে খালের দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। গাছের আড়ালে থেকে গুলি করছে। একজন দাঁত দিয়ে পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুড়ে দিল। বিকট শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল।

আমি পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছিলাম না, গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ, বারুদের গন্ধ, আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মিলিটারিরা গুলি করতে শুরু করেছে, আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটে যাচ্ছে। গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে, গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই তাহলে যুদ্ধ? যুদ্ধ তাহলে এ রকম? এই রকম যুদ্ধ করে আমাদের বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে? এই যুদ্ধে কেউ কি মারা যাবে? আমি কি মারা যাব? কিন্তু আমার ভেতরে কোনো ভয় নেই, কোনো আতঙ্ক নেই। মনে হতে থাকে বেঁচে থাকা মরে থাকায় কিছু আসে যায় না। মনে হতে থাকে আকাশ-বাতাস, গাছপালা, মাটি-নদী, চাঁদ-সূর্য কোথাও কিছু নেই। মনে হতে থাকে সারা পৃথিবীতে শুধু আমরা, শুধু আমাদের হাতে আছে অস্ত্র আর জীবন্ত প্রাণীর মতো সেই অস্ত্র কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতক্ষণ যুদ্ধ হয়েছে আমরা জানি না, আমরা কি যুদ্ধে জিতেছি, না হেরেছি, সেটাও জানি না, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম গুলির শব্দ কমে এসেছে, দেখতে পেলাম মুক্তিবাহিনী 'জয় বাংলা' চিৎকার করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।

আমি আর ডোরাও 'জয় বাংলা' 'জয় বাংলা' চিৎকার করতে করতে ছুটে যেতে লাগলাম। মাসুদ ভাই আমাদের থামাল, বলল, "ওদের পালিয়ে যেতে দাও। পালিয়ে যেতে দাও।"

আমরা থামলাম। মাসুদ ভাই তখন ঘুরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "সবাই ঠিক আছে?"

দূর থেকে একজন ভাঙা গলায় বলল, "না কমান্ডার।"

মাসুদ ভাই সেদিকে ছুটে যেতে লাগল। আমাদের বুকটা ধক করে উঠল। ঠিক নাই মানে কী? গুলি খেয়ে আহত হয়েছে, নাকি কেউ মারা গিয়েছে?

আমি আর ডোরা মাসুদ ভাইয়ের পেছনে পেছনে ছুটে যাচ্ছিলাম কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে থামাল। সে ঠোঁট কামড়ে আছে আর চোখ থেকে পানি পড়ছে, আমাদেরকে বলল, "তোমরা যেয়ো না।"

"কেন?"

"দৃশ্যটা ভালো না।"

"কে?"

"জলীল।"

AMARBOI.COM

আমি আর ডোরা একসাথে চিৎকার করে উঠলাম, "জলীল ভাই?"

"হ্যাঁ।"

আমরা একটু আগে একটা ট্রেঞ্চে বসেছিলাম। জলীল ভাই আমাদেরকে জোর করে দেশ-বিদেশের কথা বলছিল, আমরা অধৈর্য হয়ে যচ্ছিলাম। আমি কি জানতাম জলীল ভাই আর কোনো দিন জ্ঞানের কথা বলে আমাদের অধৈর্য করে দেবে না? আমার কেমন জানি দুর্বল লাগতে থাকে।

আমি আর ডোরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম সবাই মিলে কিছু একটা করছে। জলীল ভাইয়ের শরীরটাকে কাপড়ে ঢেকে সরিয়ে আনতে থাকে।

ডোরা বলল, "আয়, ওদিকে যাই।"

"কোন দিকে?"

একটু আগে যেখানে পাকিস্তানি মিলিটারি ছিল ডোরা হাত দিয়ে সেই দিকটা দেখাল। আমি বললাম, "চল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর ডোরা এগিয়ে গেলাম। মাটিতে অসংখ্য গুলির খোসা— বারুদের গন্ধ। মাটিতে রক্ত। বুটের ছাপ। একটু আগেই এখানে কী ভয়ংকর যুদ্ধ হচ্ছিল, এখন কিছু নেই। কী আশ্চর্য।

ডোরা হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ স স স।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "কী হয়েছে?"

"শোন।"

আমি কান পেতে শুনলাম। অস্পষ্টভাবে একজন মানুষের গোঙানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমরা এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, কোথাও কেউ নেই কিন্তু চাপা গোঙানোর শব্দটা এখনো আসছে। মাঝে মাঝে থেমে যায় তারপর আবার শুরু হয়। আমরা স্টেনগান হাতে নিয়ে শব্দটা লক্ষ করে একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম— একটা ঝোপের আড়ালে একজন মানুষ চিত হয়ে পড়ে আছে, পায়ে গুলি লেগেছে, রক্তে সাদা পাজামা ভেসে যাচ্ছে। আমরা আরেকটু এগোতেই মানুষটা ঘোলা চোখে আমাদের দিকে তাকাল। আমরা তখন মানুষটাকে চিনতে পারলাম। এটা হচ্ছে সেই রাজাকার মানুষটি, যে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, যে পাকিস্তান মিলিটারিগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল।

আমি আর ডোরা মানুষটার দিকে স্টেনগানটা তাক করে রাখলাম, মানুষটা আমাদের দিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে রইল। কী অদ্ভুত একটা দৃষ্টি!

ডোরা বলল, "আপনি রাজাকার?"

মানুষটা কোনো কথা বলল না। ডোরা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেন রাজাকার হলেন?"

মানুষটা এবারেও কিছু বলল না, ডোরা আবার জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কেমন করে রাজাকার হয় বলবেন?"

মানুষটা বিড়বিড় করে বলল, "আমারে মাইরো না। আল্লাহ্‌র কসম।"

কী আশ্চর্য! মানুষটা ভাবছে আমরা তাকে গুলি করব। একটু আগে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার জন্য সে মিলিটারিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল, এখন সে আমাদের কাছে জান ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি ডোরাকে বললাম, "ডোরা। তুই এখানে থাক, আমি মাসুদ ভাইকে ডেকে আনি।"

ডোরা মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর তার স্টেনগানটা রেখে বলল, "যা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসুদ ভাইয়ের সাথে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এল, একজন তার রাইফেলটা রাজাকারের মাথার দিকে তাক করে হিংস্র গলায় বলল, "শুয়রের বাচ্চা— তোর জন্য— তোর জন্য—" তারপর তার শরীরে অনেক জোরে একটা লাথি দিল, লাথি খেয়ে রাজাকারটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে।

মাসুদ ভাই ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি শান্ত হও তো—"

"কেন শান্ত হব? কেন? এই শুয়রের বাচ্চার জন্য জলীল ভাই—" মানুষটা কথা শেষ করতে পারল না, হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

দুইজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে টেনে সরিয়ে নিল। মাসুদ ভাই রাজাকারটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি রাজাকার?"

মানুষটা কোনো কথা বলল না, শুধু তার ঠোঁট দুটি নড়তে লাগল। মাসুদ ভাই বললেন, "তুমি কি দেখেছ পাকিস্তান মিলিটারি যারা মরেছে, যারা গুলি খেয়েছে, আহত হয়েছে তাদের সবাইকে নিয়ে গেছে। তোমাকে নেয় নাই?"

রাজাকারটা কোনো কথা বলল না। ফ্যাকাশে মুখে মাসুদ ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাসুদ ভাই বলল, "নিজের দেশের সাথে বেইমানি করে তুমি কী পেলে? তুমি যে পাকিস্তানি মিলিটারির পা চাটো সেই মিলিটারিরাও তোমাকে বেইমান জানে। তোমাকে বিশ্বাসঘাতক জানে। সে জন্য তারাও তোমাকে ফেলে গেছে।"

মানুষটা কোনো কথা বলল না, দর দর করে ঘামতে লাগল। মাসুদ ভাই বলল, "বলো, তুমি কী করো? মুসলিম লীগ, না জামাতে ইসলামী?"

মানুষটা এমনভাবে মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল যেন সে কোনো কথা বুঝতে পারল না। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "আমি একে চিনি। এর নাম কাদের। এ জামাতে ইসলামী। পি কে কলেজের ইসলামী ছাত্রসংঘের সেক্রেটারি।"

মাসুদ ভাই উঠে দাঁড়াল, আমার আর ডোরার দিকে তাকিয়ে বলল, "রঞ্জু, খোকন, তোমরা যাও।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন মাসুদ ভাই?"

মাসুদ ভাই কঠোর মুখে বলল, "প্রশ্ন করো না। যাও।"

আমরা তখন সরে গেলাম। জঙ্গলের দিকে হেঁটে যেতে যেতে ডোরা জিজ্ঞেস করল, "রাজাকারটাকে মনে হয় মেরে ফেলবে, তাই না?"

আমি বললাম, "মনে হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩.

আমরা আবার আমাদের ক্যাম্পে ফিরে এসেছি, কিন্তু এখন এটা আগের মতো না। আগে এটা ছিল আমাদের ঘাঁটি, কিন্তু এখন এটা আমাদের ঘাঁটি না। এখন এখানে আছি অল্প সময়ের জন্য। আমরা এখান থেকে যেকোনো সময় চলে যাব। সবাই এখন নিজের কাছে তার অস্ত্র রাখে। আমি মাথার কাছে স্টেনগান নিয়ে ঘুমাই। আমার মাথার নিচে গ্রেনেড থাকে। কেউ যদি কয়েক দিন আগেও আমাকে বলত আমার নিজের একটা স্টেনগান থাকবে, গুলি থাকবে, গ্রেনেড থাকবে, তাহলে সেটা আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না।

মায়েরও একটা স্টেনগান আছে। স্টেনগানটা পাশে রেখে মা রান্না করে। যখন সবার পাতে মা খাবার তুলে দেয় তখন মায়ের ঘাড়ে একটা স্টেনগান থাকে! দেখতে খুবই মজা লাগে। যারা খায় তাদের হাতের কাছেও একটা রাইফেল না হয় এসএলআর থাকে। সব সময়েই একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব।

মিলিটারির সাথে সামনাসামনি যুদ্ধে জলীল ভাই মারা গিয়েছে, তাকে খালের পাড়ে কবর দেওয়া হয়েছে। আহত হয়েছে দুইজন। একজন বেশি একজন কম— যে বেশি আহত হয়েছে তাকে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা বর্ডার পার করিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সত্যি সত্যি হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছাতে পেরেছে কি না, আমরা জানি না। যে কম আহত হয়েছে সে ক্যাম্পেই আছে। তার বাম হাতের একটা আঙুল উড়ে গেছে, সে সময় পেলেই অবাক হয়ে তার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় তার যে একটা আঙুল কম, সেটা সে এখনো মেনে নিতে পারছে না। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই আপনার কি আঙুলে খুব ব্যথা করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। ব্যথা খুব বেশি নাই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমার যে আঙুলটা নাই মাঝে মাঝে সেই আঙুলটা চুলকায়।"

শুনে আমি আর ডোরা প্রায় হেসেই ফেলছিলাম কিন্তু সে একটুও হাসল না। বলল, "আমি মিছা কথা বলছি না। সত্যি কথা বলছি।"

তখন আমরা অবাক হয়ে গেলাম, যেটা নাই সেটা কেমন করে চুলকাতে পারে?

খুব শীত পড়েছে, তাই আমরা আগুন জ্বালিয়ে সেটা ঘিরে বসে হাত-পা গরম করছি। আমি আর ডোরা পাইকার ভাইয়ের দুই দিকে বসে তার গল্প শুনছি। পাইকার ভাই খুব মজা করে গল্প করতে পারে, হাত-পা নেড়ে বলল, "বুঝলি আণ্ডা-বাচ্চা, একবার একটা পাকিস্তান মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করেছি। হঠাৎ একটা পাকিস্তানি মিলিটারি একটা চায়নিজ রাইফেল নিয়ে বের হয়ে এসেছে। আমি তখন আমার স্টেনগান দিয়ে তার মাথায় গুলি করলাম। ফটাস করে একটা শব্দ হলো আর মাথার খুলিটা উড়ে গেল। তারপর কী হলো বল দেখি?"

ডোরা মুখ বিকৃত করে বলল, "মগজটা বের হয়ে এল?"

পাইকার ভাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না না— পাকিস্তানিদের মাথায় কোনো ঘিলু নাই! খুলিটা যখন উড়ে গেল তখন দেখি সেখানে কিছু নাই।"

ডোরা বলল, "যাহ্।"

"হ্যাঁ। মিলিটারিটা তখনো তার রাইফেল নিয়ে ছুটে আসছে— আমার কাছে এসে বলল, খামোশ।"

"মাথা ছাড়া।"

"হ্যাঁ। মাথা ছাড়া।"

ডোরা হি হি করে হেসে বলল, "তুমি এত মিথ্যুক পাইকার ভাই।"

পাইকার ভাই গম্ভীর মুখে বলল, "আমি মোটেও মিথ্যুক না। সব সত্যি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপরে কী হলো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মিলিটারিটা আমার কাছে এসে চায়নিজ রাইফেলটা আমার দিকে তাক করেছে তখন আমি কোনো উপায় না দেখে তার হাঁটুতে দিলাম একটা লাথি! তখন কী হলো বল দেখি?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হলো?"

"মিলিটারিটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল!"

"অজ্ঞান হয়ে?"

"হ্যাঁ। অজ্ঞান হয়ে। কেন বল দেখি?"

আমি আর ডোরা জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তানি মিলিটারিদের মগজ থাকে তাদের হাঁটুতে!" বলে পাইকার ভাই নিজেই হা হা করে হাসতে থাকল। আমরাও হি হি করে হাসতে থাকলাম। ডোরা পাইকার ভাইকে কিল দিতে দিতে বলল, "মিথ্যুক! মিথ্যুক! কত বড় মিথ্যুক!"

পাইকার ভাই বলল, "তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করলে না? মাঝে মাঝে দেখবে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাকিস্তানি মিলিটারি দাঁড়িয়ে গেছে, তখন সামনেও যায় না। পেছনেও যায় না। কেন বল দেখি?"

"কেন?"

"তখন তাদের ডান হাঁটু বলে সামনে যাও। বাম হাঁটু বলে পেছনে যাও— তখন সামনেও যেতে পারে না, পেছনেও যেতে পারে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।"

ডোরা বলল, "মিথ্যুক! মিথ্যুক!"

পাইকার ভাই বলল, "তখন কী করে জান?"

"কী করে?"

"তখন পেছন থেকে এসে একজন কষে তাকে একটা লাথি দেয় তখন সে আবার চলতে থাকে!"

পাইকার ভাই আবার হি হি করে হাসতে লাগল আর তাকে দেখে আমরাও হাসতে লাগলাম। কাছেই মাসুদ ভাই বসে ছিল, মাসুদ ভাইও হাসতে হাসতে বলল, "পাইকার! যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন তুমি পাকিস্তানি মিলিটারি কৌতুক নামে একটা বই বের করো— অনেক বিক্রি হবে!"

পাইকার ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন যে আমি কত কী করব, সেটা বলে শেষ করতে পারব না। প্রথম এক সপ্তাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি স্টেডিয়াম, কার্জন হল, আর্টস বিল্ডিংয়ে হাঁটব আর যার সাথেই দেখা হবে তারেই বলব, জয় বাংলা!" দৃশ্যটা কল্পনা করে পাইকার ভাইয়ের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল!

মাসুদ ভাই কিছুক্ষণ পাইকার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, "তাহলে স্বাধীনতার জন্য কাজ শুরু করে দেওয়া যাক, দেরি করে লাভ নাই।"

পাইকার ভাই সোজা হয়ে বসে বলল, "কী করতে হবে, কমান্ডার?"

"আমরা কাঁকনডুবি গ্রামের মিলিটারি ক্যাম্পটা দখল করে ফেলি।"

আমি আর ডোরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। মাসুদ ভাই আমাদের চিৎকার করতে দিল, তারপর বলল, "কয় দিনের ভেতরে মুক্তিবাহিনীর অনেক বড় আক্রমণ হবে। হেড কোয়ার্টার থেকে আমার কাছে খবর এসেছে এই ক্যাম্পটা নিউট্রালাইজ করে দিতে। বড় রাস্তাটা তাহলে ক্লিয়ার হয়।"

পাইকার ভাইয়ের হাসিখুশি মুখটা একটু গম্ভীর হলো, বলল, "কমান্ডার, এই অপারেশনটা কিন্তু অন্য দুইটা অপারেশনের মতো না। এর আগে আমরা যেটা করেছি, সেটা হচ্ছে হিট অ্যান্ড রান। আমরা আক্রমণ করেছি তারপর সরে গেছি। সেই জন্য আমাদের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় নাই।"

মাসুদ ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। এইটা কিন্তু হিট অ্যান্ড রান না। এটা হচ্ছে হিট অ্যান্ড ক্যাপচার। আমাদের ক্যাম্পটা দখল করতে হবে। বুঝেছ?"

পাইকার ভাই আর আশপাশে যারা আছে, সবাই মাথা নাড়ল। মাসুদ ভাই বলল, সে জন্য এবারে অনেক বেশি রেডি হতে হবে। প্রথমবার কিছু ভারী অস্ত্র ব্যবহার করব।"

একজন বলল, "রেকি শুরু করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, কাল থেকে রেকি শুরু করে দেব। আমি এই স্কুলটাতে মাস্টারি করেছি, তাই স্কুলটা কী রকম, ভালো করে জানি। এইটা একটা সুবিধা।"

আমি বললাম, "আমিও এই স্কুলটার ছাত্র। আমিও জানি।"

মাসুদ ভাই মাথা নেড়ে বলল, "রঞ্জু আরো ভালো করে জানে। মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ার পরে আমরা কেউ ভেতরে যাই নাই, রঞ্জু গিয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হঠাৎ করে সেই সময়টার কথা মনে পড়ে গেল, হাত দুটি একটা টেবিলের পায়ার সাথে বেঁধে আমাকে মারছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করছি আর চিৎকার করছি আর চিৎকার করছি— সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়তেই আমি কেমন জানি শিউরে উঠলাম।

পরদিন থেকে রেকি শুরু হয়ে গেল। দুইজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হলো জেলে সাজিয়ে। হাতে জাল, কোমরে মাছ রাখার টুকরি, মাথায় গামছা। কালী গাংয়ে মাছ ধরে স্কুলের পাশ দিয়ে ঘুরে আসবে। তারা সারা দিন রেকি করে গভীর রাত্রে ফিরে এল। পরের দিন আরো দুইজনকে পাঠানো হলো সবজিওয়ালা সাজিয়ে। তারাও ফিরে এল প্রায় ভোররাতের দিকে। মাসুদ ভাই তাদের সাথে সবাইকে নিয়ে কথা বলল। কীভাবে কী করা হবে, সেগুলো ঠিক করা হলো। পরের দিন সবাই বিশ্রাম নিল। এর পরের দিন ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। শুধু আক্রমণ না, দখল করে নেয়া হবে। কত দিন আগে হলেও মিলিটারির এ রকম একটা ক্যাম্প দখল করার কথা কেউ এত সহজে চিন্তাও করতে পারত না। কিন্তু দেখতে দেখতে সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। মিলিটারিরা এখন ভয়ে ভয়ে থাকে, তাদের মনের জোর বলে কিছু নেই। মাসুদ ভাই সব সময় বলে, যুদ্ধ আসলে অস্ত্র দিয়ে হয় না, যুদ্ধ হয় মনের জোর দিয়ে। আমাদের মতো মনের জোর এখন আর কারো নাই।

আমাদের বাহিনী বিশাল। সবাই মিলে রওনা দেওয়ার আগে ভারী ভারী অস্ত্রগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এগুলো কালী গাংয়ে নৌকা করে কাঁকনডুবি গ্রামে চলে যাবে। এই জঙ্গলে অপরিচিত গ্রামের মানুষ আসতে থাকল এবং যেতে থাকল। তারা মাসুদ ভাই আর অন্যদের সাথে কথা বলতে লাগল। আমরা তাদের কথাবার্তা থেকে ভাসা ভাসা বুঝতে পারলাম যে কাঁকনডুবিতে আমরা কোথায় উঠব, কী খাব— সেই সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে! আমার অবশ্যি চিন্তার কিছু নাই, নানিকে এত দিন পর দেখতে পাব সেটা চিন্তা করেই আমার আর সময় কাটছে না। মাসুদ ভাইয়েরা আমাকে এখন নানির সাথে দেখা করতে দেবে কি না, সেটা হচ্ছে প্রশ্ন।

আমরা রওনা দিলাম খুব ভোরে। রওনা দেবার আগে মাসুদ ভাই সবাইকে দাঁড়া করিয়ে একটা বক্তৃতা দিল। কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতা— সবাই সবকিছু বুঝল বলে মনে হলো না। শুধু জয় বাংলা স্লোগানটা আমরা সবাই বুঝতে পারলাম— আমরাও তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম, "জয় বাংলা!"

সারা দিন ধরে আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম। কাঁকনডুবি গ্রামে যখন পৌঁছেছি তখনো সূর্য ডোবেনি। আমরা তাই জঙ্গল থেকে বের হলাম না। আমি গাছের ফাঁক দিয়ে কাঁকনডুবি গ্রামের দিকে তাকিয়ে রইলাম, দূরে হিন্দুপাড়া সড়ক ধরে সোজা গিয়ে বাম দিকে গেলে আমার বাড়ি, আরো সামনে গেলে কালী গাং। বাম দিকে মাইল খানেক গেলে আমাদের নবকুমার হাইস্কুল, যেটার নাম এখন গাজালা ইয়াকুব হাইস্কুল! ক্যাম্পটা দখল করে প্রথমেই আমাদের স্কুলের নামটা ঠিক করতে হবে। গাজালা ইয়াকুব— কী কুৎসিত একটা নাম!

মাসুদ ভাই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে একটা আলোচনা করে যেতে লাগল। সবাই মিলে কিছু একটা ঠিক করে, কিছুক্ষণ আলাপ করে, নিজেরা নিজেদের ভেতর তর্ক করে, তারপর আবার অন্য একটা জিনিস ঠিক করে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় তাঁরা মোটামুটি ঠিক করতে পারল, ঠিক কীভাবে কী করা হবে।

তখন সবাই গাছে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে রাত গভীর হওয়ার জন্য। আমি আর ডোরা পাইকার ভাইয়ের দুই পাশে বসে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম ভয়ংকর একটা যুদ্ধ হচ্ছে, বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে, তার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার নানি চিৎকার করে বলছে, "শুয়ে পড় রঞ্জু, শুয়ে পড়! শুয়ে পড়।"

আমি তবু দাঁড়িয়েই আছি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪.

পাইকার ভাই ঘুরে বসে হাত দিয়ে আড়াল করে খুব সাবধানে তাঁর সিগারেটটা জ্বালাল, পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প থেকে যদি ম্যাচের আগুন দেখে ফেলে তারা বুঝে ফেলতে পারে আমরা এখানে আছি। পাইকার ভাই তার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, "শীতের রাত্রে শরীর গরম করার জন্য সিগারেটের উপরে জিনিস নাই!"

আমি আর ডোরা আবছা অন্ধকারে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, আমরা দুইজন শীতে কাঁপছি, সেটা যেন তার নজরেই পড়ছে না। আমি দুই হাত ঘষে একটু গরম করার চেষ্টা করে বললাম, "পাইকার ভাই, কখন যুদ্ধ শুরু হবে?"

"সবাই পজিশন নেবার পর মনে হয় শেলিং শুরু করবে।"

"শেল আমাদের উপরে পড়বে না তো?"

পাইকার ভাই হাসল, বলল, "পড়ার কথা না। মর্টার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে শুরু করে আস্তে আস্তে কমাবে।"

এটার মানে কী আমি বুঝলাম না, ডোরা মনে হয় বুঝল, সে মাথা নাড়ল। পাইকার ভাই বলল, "রকীব মর্টারের এক্সপার্ট। শেলিং শুরু হলে তাকে বলে দিতে হবে, একবার লাইন রেঞ্জ ঠিক করে ফেললে আর চিন্তা নাই!"

এই কথাটার মানেও আমি কিছু বুঝলাম না, কিন্তু ডোরা মনে হয় বুঝল, সে আবার মাথা নাড়ল। ঠিক তখন হুশ করে একটা শব্দ হলো আর তার কিছুক্ষণ পর দূরে কোথাও মর্টারের একটা শেল পড়ে একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। পাইকার ভাই মাথা নিচু করে বলল, "অ্যাটাক শুরু হয়ে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারি ক্যাম্পের ভেতর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল, চিৎকার করে মিলিটারিগুলো কথা বলতে লাগল, একটু পরেই আমরা মেশিনগানের গুলি শুনলাম। মিলিটারিগুলো মেশিনগান দিয়ে গুলি শুরু করেছে।

আমাদের কেউ একজন বলল, "লাইন ঠিক আছে, আরো বিশ গজ ভেতরে শেলিং করতে বলো।" এবারে আমি বুঝতে পারলাম, মর্টারটা ঠিক দিকেই আছে, গোলাটা আরেকটু ভেতরে ফেলতে হবে।

কিছুক্ষণের ভেতরে আবার হুশ করে শব্দ হলো, তারপর একটা শেল পড়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। আমরা দেখলাম এবারে শেলটা মিলিটারি ক্যাম্পের খুব কাছে পড়েছে। কেউ একজন চিৎকার করে বলল, "আরো দশ গজ!"

আবার হুশ শব্দ করে একটা শেল পড়ল। এবারে ঠিক ক্যাম্পের ভেতরে! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে মিলিটারিদের চিৎকার শুনতে পেলাম। এবারে ভেতর থেকে মিলিটারিগুলো টানা গুলি করতে শুরু করল।

পাইকার ভাই খুবই শান্তভাবে সিগারেটের আগুনটা ঢেকে সেটাতে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কখন গুলি করব?"

"এখন না। অনেক পরে। আগে কিছু শেলিং হোক।"

মর্টার থেকে শেল পড়তে লাগল। একটা-দুইটা বাইরে পড়ল কিন্তু বেশির ভাগ ক্যাম্পের ভেতরে।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ স্কুলের গেটের সামনে। এক ভাগ পাশে। অন্য ভাগ রয়েছে ছোটাছুটি করার জন্য। পাইকার ভাই বলল, সারা রাত যুদ্ধ হবে, কালকে সারা দিন ধরেও হতে পারে, গুলি শেষ হয়ে গেলে গুলি পৌঁছে দিতে হবে, খিদে লাগলে খাবার এনে দিতে হবে, তাই একটা দলকে ছোটাছুটি করার জন্য রাখা হয়েছে।

পাইকার ভাইয়ের সাথে আমরা এক পাশে পজিশন নিয়েছি। আমাদের এখন কিছু করা নিষেধ, পাকিস্তানিদের বুঝতে দেয়া হবে না আমরা এখানে পজিশন নিয়েছি। স্কুলের প্রাচীর এদিকে ভাঙা, ভেতরে ঢোকার একটা সুযোগ আছে। স্কুলের গেটের সামনে যে দলটি আছে তারা গোলাগুলি শুরু করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইকার ভাই খুব মনোযোগ দিয়ে শেলিংয়ের শব্দ শুনল, পাকিস্তানিদের গুলির শব্দ শুনল, মাঝে মাঝে তাকে খুব খুশি হতে দেখা গেল, পাইকার ভাই কীভাবে কীভাবে জানি বুঝে ফেলতে পারে কয়টা মিলিটারি ঘায়েল হয়েছে!

একসময় শেলিংয়ের শব্দ থেমে গেল আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা গুলি করতে শুরু করল। প্রচণ্ড গুলির শব্দের সাথে সাথে তারা জয় বাংলা বলে চিৎকার করছে, আমারও চিৎকার করার ইচ্ছা করছে কিন্তু আমাদের কোনো রকম শব্দ করা নিষেধ, তাই নিঃশব্দে মাটি কামড়ে পড়ে রইলাম। গোলাগুলির শব্দ বেড়ে যায়, আবার কমে আসে, আবার বাড়তে থাকে। মর্টার থেকে আবার শেলিং শুরু হয়ে যায়— এবারে আগেরটার সাথে তিন ইঞ্চি মর্টারটাও শেলিং শুরু করেছে। আমাদের স্কুলটাকে মনে হয় একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে— একদিক দিয়ে ভালোই হবে, যখন দেশ স্বাধীন হবে তখন আর লেখাপড়া করতে হবে না!

একসময় আমাদেরও গুলি করার সিগন্যাল দেয়া হলো, তখন আমরাও গুলি শুরু করলাম। স্কুলের ভেতরে একটা হইচই শুরু হয়ে গেল। বোঝা গেল, আমাদের ঠেকানোর জন্য কিছু মিলিটারি এই পাশে চলে আসতে শুরু করেছে। পাইকার ভাই তার এলএমজি দিয়ে টানা গুলি করে যেতে লাগলেন— প্রচণ্ড শব্দ, গুলির খোসা ছিটকে ছিটকে বের হচ্ছে, বারুদের গন্ধ, ব্যারেলটা দেখতে দেখতে আগুনের মতো গরম হয়ে যায়।

পাইকার ভাই বলেছিল সারা রাত যুদ্ধ হবে, তখন তার কথা আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু সত্যি একসময় চারদিক ফর্সা হতে শুরু করল, আমরা আশপাশে দেখতে শুরু করলাম। স্কুলের বিল্ডিংটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমনকি মাঝে মাঝে একটা-দুইটা পাকিস্তানি মিলিটারিকেও ভেতরে ছুটে যেতে দেখলাম, পাইকার ভাই একটাকে গুলি করে ফেলেও দিল!

পাকিস্তানি মিলিটারিগুলো কুৎসিত ভাষায় আমাদের গালাগাল করতে লাগল, সেই গালাগালও আমরা শুনতে পেলাম। পাইকার ভাইও চিৎকার করে পাল্টা গালাগাল দিল, তারপর আমাকে আর ডোরাকে বলল, "তোমরা আণ্ডা-বাচ্চারা আমার কাছে আছ তাই তৃপ্তি করে হারামজাদাগুলিকে গালি দিতে পারছি না!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "আপনি গালি দেন পাইকার ভাই, কোনো সমস্যা নাই।"

ডোরা বলল, "হ্যাঁ, গালি দেন! আচ্ছা মতন গালি দেন।"

পাইকার ভাই ডোরার মাথায় হাত দিয়ে তার ছোট ছোট এলোমেলো চুলগুলো আরো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "নাহ্! খোকন এখানে আছে— একজন ভদ্রমহিলা! তার সামনে খারাপ গালি দেব নাকি? ছি! তার চাইতে হারামজাদাদের গুলি করি!" কথা শেষ করে পাইকার ভাই তাঁর এলএমজি দিয়ে টানা গুলি করে যেতে লাগল। গুলির খোসা ছিটকে ছিটকে বের হতে লাগল। পাইকার ভাইয়ের মুখ পাথরের মতো শক্ত, দেখে মনে হয় প্রত্যেকটা গুলি যেন এলএমজির ব্যারেল থেকে নয়— তাঁর চোখের ভেতর থেকে বের হচ্ছে।

যখন সূর্যের প্রথম আলোটা আমাদের ওপর এসে পড়ছে তখন পাইকার ভাই গুলি খেল। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, হঠাৎ যন্ত্রণায় একটু শব্দ করে পাইকার ভাই এক পাশে ঢলে পড়ল। আমি ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে পাইকার ভাই?"

পাইকার ভাই নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "কিছু না! কেউ একজন এলএমজিটা ধরো।"

আমি আবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, "পাইকার ভাই! কী হয়েছে?"

পাইকার ভাইকে উত্তর দিতে হলো না, আমি দেখতে পেলাম টকটকে লাল রক্তে তাঁর কাপড় ভিজে এসেছে, মাটিটা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ডোরা ডুকরে কেঁদে উঠল, "পাইকার ভাই!"

পাইকার ভাই অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল, অনেক কষ্ট করে ডোরার মাথায় হাত রাখল, ফিসফিস করে বলল, "কাঁদার কিছু নাই। কাঁদে না বোকা মেয়ে।"

আমি পাইকার ভাইকে ধরে চিৎকার করে বললাম, "পাইকার ভাইয়ের গুলি লেগেছে— গুলি লেগেছে—"

মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছে, তার মাঝে কয়েকজন বুকে ঘষে ঘষে চলে এল, তাঁকে টেনে পেছনে সরিয়ে নিতে চাইছিল, পাইকার ভাই হাত দিয়ে থামাল, বলল, "আমাকে টানাটানি করো না— তোমরা যাও—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন টান দিয়ে তাঁর শার্টটা খুলে গুলির ক্ষতটা দেখার চেষ্টা করল, গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে, শার্টটা দিয়ে আবার ক্ষতটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। পাইকার ভাই দুর্বলভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, ফিস ফিস করে বলল, "তোমরা যাও! নিজের পজিশনে যাও, খোদার কসম—"

এদিক থেকে গুলি কমে এসেছে দেখে কয়েকটা মিলিটারি বাংকার থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছিল, তাই সবাই আবার নিজেদের অস্ত্র হাতে গুলি করতে শুরু করেছে। মিলিটারিগুলো আবার বাংকারে ঢুকে গেল।

আমি পাইকার ভাইয়ের হাতটা শক্ত করে ধরে রাখলাম— ডোরা সাবধানে তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিল— কানের কাছ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে শিসের মতো শব্দ করে কয়েকটা গুলি চলে গেল, ডোরা সেটা লক্ষ্যও করল না।

পাইকার ভাই ফিসফিস করে কিছু একটা বলল, আমি তাঁর কথা ঠিক শুনতে পারলাম না, মাথাটা তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গেলাম, তখন শুনলাম ফিসফিস করে বলল, "দেশ স্বাধীন হবে খোদার কসম—"

ডোরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "যাবেন না পাইকার ভাই। যাবেন না— থাকেন। আপনি থাকেন।"

পাইকার ভাই হাসার চেষ্টা করল, বলল, "আছি। আমি আছি। আমি যাব না— আমি সব সময় থাকব—" আমি দেখলাম তাঁর ঠোঁটের কোনা দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের হয়ে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। ডোরা হাত দিয়ে রক্তটা মুছে দেয়, তাঁর চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। পাইকার ভাই হাতটা তুলে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল— ডোরা হাতটা ধরে রাখল। আমি আরেকটা হাত ধরে রাখলাম। তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, একবার চোখ খুলে তাকাল, কী বিচিত্র একটা দৃষ্টি, তারপর চোখ বন্ধ করল, আর তাকাল না।

পাইকার ভাই গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার কারণে সবার মন ভেঙে গেল। যুদ্ধ প্রায় থেমেই যাচ্ছিল, সবাই অস্ত্র গুটিয়ে চলেই যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত গেল না শুধুমাত্র আমার আর ডোরার কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোরার কোলে মাথা রেখে পাইকার ভাই যখন মারা গেল তখন ডোরা আমার দিকে তাকাল, আমি ডোরার দিকে তাকালাম। ডোরার চোখ টকটকে লাল, চোখ মুছে ডোরা বলল, "চল, তুই আর আমি গিয়ে ঐ বাংকারটাতে দুইটা গ্রেনেড ফেলে আসি।"

বাংকারে মেশিনগান বসিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করছে, এর মাঝে সেই বাংকারে গিয়ে আসলে কেউ কোনো দিন একটা গ্রেনেড ফেলে আসতে পারবে না। কিন্তু আমি সেটা চিন্তা করলাম না। আমি কিড় মিড় করে দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, "চল।"

তখন স্টেনগানটা পিঠে ঝুলিয়ে হাতে একটা করে গ্রেনেড নিয়ে আমি আর ডোরা ক্রলিং করে এগোতে লাগলাম। সবাই চিৎকার করে উঠল, "কী করো! কী করো!" আমি আর ডোরা কিছুই শুনলাম না— একেবারে মাটির সাথে ঘষে ঘষে এগোতে থাকলাম। আর তখন আমাদের পিছু পিছু অন্য সব মুক্তিযোদ্ধাও বুকে ঘষে ঘষে এগোতে লাগল। শুয়ে শুয়ে গুলি করে আর অগ্রসর হয়। হঠাৎ মনে হতে লাগল সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে উড়ে যাবে— মনে হয় আমার হাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার সেই অস্ত্র! আমার স্পষ্ট মনে আছে কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "জয় বাংলা!" তারপর ছুটতে ছুটতে বাংকারের কাছে গিয়ে দাঁত দিয়ে গ্রেনেডের পিনটা টেনে খুলে ফেললাম— সূক্ষ্ম একটা ধোঁয়া বের হলো, চার সেকেন্ড পর এটা ফাটবে, আমি মনে মনে গুনলাম— এক হাজার এক, এক হাজার দুই, এক হাজার তিন— তারপর গ্রেনেডটা বাংকারের ভেতর ছুড়ে দিলাম। দেখলাম বাংকারের ভেতর একজন মিলিটারি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার অবাক হবারও শক্তি নাই।

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হলো, সাথে সাথে আরেকটা। নিশ্চয়ই এটা ডোরার গ্রেনেড আর ঠিক তখন সব মুক্তিযোদ্ধা 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করতে করতে হাতের অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে করতে স্কুলের ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি উঠে বসলাম, কাছেই ডোরা, সে কেমন জানি অবাক হয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। স্কুলের ভেতরে যে প্রায় মুখোমুখি যুদ্ধ হচ্ছে সেটা তখনো আমরা বুঝতে পারছিলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর ডোরা স্কুলের প্রাচীরে হেলান দিয়ে বসে রইলাম, কেমন যেন ঘোরের মাঝে বসে আছি, চারপাশে কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বেঁচে আছি না মরে গেছি, সেটাও যেন বুঝতে পারছি না। যুদ্ধটা কখন শেষ হয়েছে, আমরা সেটাও জানি না— একসময় শুনতে পেলাম মাসুদ ভাই চিৎকার করে ডাকছে, "রঞ্জু, খোকন— ডোরা—"

আমি আর ডোরা উঠে দাঁড়ালাম, পুরো স্কুলটা একটা ধ্বংসস্তূপ। এখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত। পাকিস্তানি মিলিটারি মরে পড়ে আছে। স্কুলের মাঠে অনেকগুলো মিলিটারি দুই হাত মাথার পেছনে দিয়ে বসে আছে। তাদের মুখে কোনো অভিব্যক্তি নাই। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাদের দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার পায়ে গুলি লেগেছে, সে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে, একজন তার পায়ে ব্যান্ডেজ লাগানোর চেষ্টা করছে। মুক্তিযোদ্ধারা ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে।

আমাকে আর ডোরাকে দেখে মাসুদ ভাই এগিয়ে এল— আমাদের পিঠে হাত রাখল আর আমরা দুইজন ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিলাম। মাসুদ ভাই হাঁটু গেড়ে বসে আমাদের দুইজনকে জড়িয়ে ধরল আর আমরা কাঁদতেই থাকলাম। মাসুদ ভাই ফিসফিস করে বলল, "তোমাদের দুইজনের জন্য আমরা আজকে যুদ্ধে জিতেছি। পাইকারের মতো তোমাদের গুলি খাওয়ার কথা ছিল। তোমরা যেভাবে গিয়েছ তোমাদের বাঁচার কথা ছিল না। কিন্তু তোমরা বেঁচে আছ। তোমরা গুলি খাও নাই, খোদা নিজের হাতে তোমাদের রক্ষা করেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দোয়া করেছে। পাইকারের দোয়া খোদা শুনেছে। বুঝেছ? পাইকার এখন ওপর থেকে তোমাদের দুইজনের দিকে তাকিয়ে আছে! তোমরা কেঁদো না— পাইকার কখনো কাঁদে নাই—"

আমরা তবু কাঁদতেই থাকলাম।

ঠিক তখন দুইজন মুক্তিযোদ্ধা একজন মিলিটারির পেছনে একটা রাইফেল ধরে তাকে ঠেলে ঠেলে মাসুদ ভাইয়ের কাছে নিয়ে এল। কাছে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাসুদ ভাইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে একজন বলল, "কমান্ডার— এইটাকে একটা বাংকারে পাওয়া গেছে। মনে হয় অফিসার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মিলিটারিটার মুখের দিকে তাকালাম, সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলাম, মানুষটা মেজর ইয়াকুব। মেজর ইয়াকুবের মুখ পাথরের মতো কঠিন, সেখানে কোনো ভয়, আতঙ্ক, ক্রোধ বা অন্য কোনো অনুভূতির চিহ্ন নাই। মাসুদ ভাই মেজর ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে থেকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি মেজর ইয়াকুব?"

মেজর ইয়াকুব কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মাসুদ ভাই হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল, "উত্তর দাও। তুমি মেজর ইয়াকুব?"

মেজর ইয়াকুব ইংরেজিতে বলল, "হ্যাঁ। আমি মেজর ইয়াকুব।"

মাসুদ ভাই হঠাৎ আমাকে ধরে মেজর ইয়াকুবের সামনে দাঁড়া করাল, বলল, "তুমি এই ছেলেটাকে চেনো?"

মেজর ইয়াকুব আমার দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে সে আমাকে চিনতে পারল, তার চোখে এক সেকেন্ডের জন্য একটা অস্বস্তি খেলা করল, কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

মাসুদ ভাই আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি চেনো এই ছেলেটাকে?" মেজর ইয়াকুব কোনো কথা বলল না, তখন মাসুদ ভাই আবার ধমক দিয়ে উঠল, চিৎকার করে বলল, "উত্তর দাও! চেনো এই ছেলেটাকে?"

মেজর ইয়াকুব মাথা নাড়ল। মাসুদ ভাই ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই বাচ্চা ছেলেটার ওপরে অত্যাচার করেছিলে?"

মেজর ইয়াকুব কোনো কথা বলল না। খুব ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো তার মাথা নিচু করল। মাসুদ ভাই বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও মেজর ইয়াকুব। তুমি এই বাচ্চা ছেলের ওপর কি অত্যাচার করেছিলে?"

মেজর ইয়াকুব কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাসুদ ভাই আমাকে ঘুরিয়ে দাঁড়া করে পিঠের শার্টটা টান দিয়ে উপরে তুলল, আমার পিঠে মিলিটারির চাবুকের দাগগুলো দেখিয়ে বলল, "এই দেখো! তোমরা এই বাচ্চাটাকে কীভাবে অত্যাচার করেছিলে, নিজের চোখে দেখো।"

মেজর ইয়াকুব কোনো কথা বলল না। মাসুদ ভাই হিংস্র গলায় বলল, "এই বাচ্চাটির কাছে মাফ চাও। তার ওপরে তোমরা যে অত্যাচার করেছ সেইজন্য তার কাছে মাফ চাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ইয়াকুব একবার মাথা তুলে তাকাল, তারপর আবার মাথা নিচু করল। মাসুদ ভাই হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "মাফ চাও ছেলেটার কাছে। না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

মাসুদ ভাই এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে মেজর ইয়াকুব পর্যন্ত চমকে উঠল। তাঁর চিৎকার শুনে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কী হচ্ছে দেখার জন্য এগিয়ে এল।

মাসুদ ভাই আমাকে ধরে রেখেছিল, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম যে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছে। হঠাৎ করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাসুদ ভাই মেজর ইয়াকুবের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর তাঁর ডান হাতটা তুলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গালে এত জোরে একটা চড় দিল যে মেজর ইয়াকুব হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে গেল। মেজর ইয়াকুবের মতো এত বড় একজন মানুষকে শুধু চড় দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া সম্ভব, সেটা আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

মেজর ইয়াকুবের ফর্সা গালটা লাল হয়ে উঠেছে। মাসুদ ভাইয়ের হাতের পাঁচটা আঙুলের ছাপ তার গালে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেজর ইয়াকুব খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মাসুদ ভাই আবার তার দিকে এগিয়ে গেল তখন মেজর ইয়াকুব খুব নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে আমাকে বলল, "বেটা, হাম ফির হায়।"

আমি মেজর ইয়াকুবের মুখে থুঃ করে থুথু দিয়ে বললাম, "তোম আসলে সরি নেহি হায়। তোম আসলে এখন ভয় পাইতা হায়!"

মেজর ইয়াকুব হাত দিয়ে তার চোখ থেকে আমার থুথুটা মুছে নেওয়ার চেষ্টা করল। মাসুদ ভাই দুইজন মুক্তিযোদ্ধাকে বলল মেজর ইয়াকুবকে নিয়ে অন্যদের সাথে বসিয়ে রাখার জন্য। একটু পরে দেখলাম সে অন্যদের মতো দুই হাত উপরে তুলে মাথার পেছনে হাত দিয়ে বসে আছে। অন্যান্য পাকিস্তানি মিলিটারিগুলো একটু অবাক হয়ে তাদের মেজরের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫.

ডোরা কিছুক্ষণ মেজর ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই মানুষটা তোকে টর্চার করেছিল?"

"নিজে করে নাই। আরেকজনকে অর্ডার দিয়েছিল।"

"একই কথা।" ডোরা স্কুলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনখানে তোকে টর্চার করেছিল?"

"ক্লাস নাইন সেকশন 'বি'।"

"সেইটা কোথায়?'

"আয় দেখাই।" বলে আমি ডোরাকে আমাদের স্কুলের ক্লাস নাইন সেকশন 'বি'তে নিয়ে গেলাম। রুমটা খালি, শুধু মেঝেতে শুকনো রক্ত। ভাঙা কয়েকটা বেঞ্চ— এখানে-সেখানে ছেঁড়া কাপড়। কয়েকটা জংধরা দা-চাকু-লোহার রড পড়ে আছে। ডোরা বলল, "কী ভয়ংকর।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কেন ডোরার কাছে রুমটা এত ভয়ংকর মনে হচ্ছে। এটা তো একটা খালি ঘর এখানে কেউ নাই, আমাকে যেদিন ধরে এনেছিল, সেদিন রুমটা ছিল ভয়ংকর।

আমরা যখন ঘরটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, ঠিক তখন মনে হলো পাশের ঘরে কোনো মানুষ নিচু গলায় কথা বলল। আমি স্টেনগানটা ধরে এগিয়ে গেলাম। রুমটার দরজার কড়া দুটো একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। দরজাটা খুলে আমি আর ডোরা ভেতরে উঁকি দিলাম। দরজা-জানালা বন্ধ, আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম ঘরের ভেতরে বেশ কয়েকটা মেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। ময়লা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছে, মনে হচ্ছে শরীরে আর কোনো কাপড় নেই— শীতে তিরতির করে কাঁপছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েগুলো আমাদের দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টি এত আশ্চর্য যে আমার বুকটা ধক করে উঠল। এত তীব্র দৃষ্টি আমি কখনো দেখিনি, সেখানে কোনো ভয় বা আতঙ্ক নেই, দৃষ্টিটা আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ। আমি কী বলব, বুঝতে পারলাম না। ঢোঁক গিলে বললাম, "আপনাদের আর কোনো ভয় নাই। যুদ্ধ শেষ।"

কথাটা শুনেও মনে হলো তাদের মাঝে একটুও পার্থক্য হলো না, তাদের চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, যুদ্ধ শেষ হলে কিংবা শেষ না হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। আমার মনে হলো, হয়তো তারা আমার কথাটা বুঝতে পারেনি। আমি আবার বললাম, "খোদার কসম। যুদ্ধ শেষ।"

লালচে চুলের একটা মেয়ে, যার চোখের দৃষ্টি সবচেয়ে ভয়ংকর আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তোমাদের যুদ্ধ শেষ। আমাদের যুদ্ধ শুরু।"

আমি এই বিচিত্র উত্তরটা শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তখন ডোরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুই যা। ঘর থেকে বের হয়ে যা। মা'কে খুঁজে বের করে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি।"

আমি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ডোরা শুনতে রাজি হলো না, আমাকে বলল, "যা, তুই যা।" তারপর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ছেলেদের কাপড় পরে থাকলেও আসলে আমি মেয়ে। আমি আপনাদের কাছে আসি?"

মেয়েগুলো অবাক হয়ে ডোরার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। ডোরা আস্তে আস্তে তাদের দিকে দুই পা এগিয়ে গেল।

সবগুলো মেয়ে আমাদের দিকে তাকালেও একজন তখনো মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে রেখেছে। আমি তার চেহারা দেখতে পারছি না— যেটুকু দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে, এই মেয়েটা বুঝি লতিফা বুবু! লতিফা বুবু?

আমি এক পা এগিয়ে গেলাম, ডোরা তখন চিৎকার করে বলল, "তুই বের হয়ে যা।"

আমি কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো বের হয়ে এলাম। আমি এদিকে-সেদিকে খুঁজে মাসুদ ভাইকে বের করলাম। তার হাত ধরে বললাম, "মাসুদ ভাই।"

"কী হয়েছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্কুলের একটা ঘরে অনেকগুলো মেয়ে।"

মাসুদ ভাইয়ের মুখটা জানি কেমন হয়ে গেল। আমি বললাম, "ডোরা ভেতরে আছে, আমাকে বলেছে মা'কে খুঁজে নিয়ে যেতে।"

মাসুদ ভাই বলল, "আমি দেখছি।"

আমি বারান্দায় বসে রইলাম। মাসুদ ভাই ছোটাছুটি করে মা'কে নিয়ে এল। সাথে আরো কয়েকজন মহিলা। তারা ঘরের ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর ডোরা বের হয়ে এল। আমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি বললাম, "ডোরা।"

ডোরা বলল, "কী?"

"আমার মনে হলো—"

"কী মনে হলো?"

"মনে হলো ভেতরে লতিফা বুবু আছে।"

ডোরা মাথা নাড়ল। বলল, "না। লতিফা বুবু নাই।"

"সত্যি?"

"সত্যি।" ডোরা আমার পাশে বসে বলল, "আমাদের লতিফা বুবু নাই, কিন্তু অন্য লতিফা বুবু আছে, অন্য জোহরা আপু আছে। অঞ্জনা বৌদি আছে।"

আমরা দুইজন চুপ করে বসে রইলাম।

মাসুদ ভাই কোথা থেকে জানি একটা বাংলাদেশের পতাকা বের করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "দেন কমান্ডার। পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা নামিয়ে এটা টানিয়ে দিই।"

মাসুদ ভাই মাথা নেড়ে বলল, "তোমরা না, এই ফ্ল্যাগটা টানাবে রঞ্জু আর খোকন, মানে রঞ্জু আর ডোরা!" তারপর পতাকাটা আমাদের হাতে দিয়ে বলল, "তোমরা পারবে না?"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "পারব।"

মাসুদ ভাই বলল, "মাঠের মাঝখানে টানালে হবে না, স্কুলের উপরে উঠে সেখানে একটা লম্বা বাঁশ বেঁধে টানাতে হবে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে!"

মাসুদ ভাই পতাকাটা আমাদের হাতে দিয়ে বলল, "যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর ডোরা পতাকাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। মাঠের মাঝখানে পুঁতে রাখা বাঁশটা টেনে তুলতেই মুক্তিযোদ্ধারা কাড়াকাড়ি করে পাকিস্তানি পতাকাটা খুলে সেটাকে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল। একজন একটা ম্যাচ দিয়ে ফ্ল্যাগটাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আমি দেখলাম পাকিস্তানি মিলিটারিগুলো পাথরের মতো মুখ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর ডোরা বাঁশটাকে নিয়ে স্কুলের বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাঁশটাকে স্কুলের দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বিল্ডিংয়ের দেয়ালের ফাঁকফোকরে পা রেখে দুইজন উপরে উঠতে থাকি। আমরা অনেকবার স্কুলের ছাদে উঠেছি— এখন গোলাগুলিতে স্কুলের দেয়ালে অনেক গর্ত হয়েছে, তাই উপরে ওঠা অনেক সোজা হয়েছে। ডোরা অবশ্যি আমার মতো এত সহজে উঠতে পারছিল না, তাই থেকে থেকে তাকে হাত ধরে সাহায্য করতে হচ্ছিল।

স্কুল বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে আমরা বাঁশটাকে টেনে উপরে তুলে আনলাম। বাঁশের আগায় পতাকাটা বেঁধে যখন সেটাকে উপরে তুলছি তখন নিচ থেকে সব মুক্তিযোদ্ধা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। পতাকা লাগানো বাঁশটাকে দেয়ালের ফাঁকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তারপর সেটার পাশে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালাম। তখন খুব বিচিত্র একটা দৃশ্য চোখে পড়ল, কাঁকনডুবি গ্রামের সব মানুষ ছুটতে ছুটতে স্কুলের দিকে আসছে। শুধু পুরুষ মানুষ নয়, মেয়েরাও আসছে। ছোট বাচ্চারাও আসছে। সবাই আনন্দে চিৎকার করছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে 'জয় বাংলা!' 'জয় বাংলা!' মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল এসএলআর স্টেনগান উপরের দিকে মুখ করে গুলি করছে। আমরাও আমাদের স্টেনগান দিয়ে আকাশের দিকে এক পশলা গুলি করলাম।

আমি আর ডোরা নিচে তাকিয়ে দেখলাম পাইকার ভাইয়ের শরীরটাকে মাঠের মাঝখানে রেখে সেটা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ তাঁর পাশে বসে তাঁকে ধরে রেখেছে। আমি হঠাৎ এক পাশে উত্তেজিত গলার শব্দ শুনতে পেলাম। সেদিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন ছেলে মিলে মতি রাজাকারকে ধরে আনছে, সবাই তাকে কিল-ঘুষি মারছে। একজন তার চুল ধরে টেনে আনছে— তাই মাথা নিচু করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটতে হচ্ছে। সবাই মিলে হঠাৎ তাকে মারতে শুরু করল, সে মনে হয় পিটুনি খেয়েই মরে যেত। মাসুদ ভাই তাকে পিটুনি থেকে উদ্ধার করে মিলিটারিদের পাশে বসিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মাঝে অন্য রাজাকারদেরও ধরে আনা হলো। তারাও প্রথমে কিছু মার খেল, তারপর দুই হাত মাথার পেছনে রেখে স্কুলের মাঠে বসে রইল।

আমি হঠাৎ মেয়েলি গলায় একটা চিৎকার শুনলাম, "রঞ্জু!"

তাকিয়ে দেখি লতিফা বুবু। লতিফা বুবুকে দেখে আমার কী যে ভালো লাগল সেটা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। নিচ থেকে লতিফা বুবু আমার আর ডোরার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। আমি আর ডোরাও হাত নাড়লাম। হঠাৎ ডোরা চোখ বড় বড় করে বলল, "ঐ যে আম্মু!"

আমি তাকিয়ে দেখি ডোরার বড় বোন নোরা আর তাঁর মা প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন। ডোরা স্কুলের ছাদ থেকে চিৎকার করে ডাকল, "আম্মু!"

আমি দেখলাম ডোরার আম্মু কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে ডোরার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

AMARBOI.COM

ডোরা বলল, "চল, নিচে নামি।"

আমি বললাম, "চল।"

আমরা নিচে নামামাত্র চারদিক থেকে সবাই আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। আমি মামুনকে দেখলাম, সে জাপটে ধরে আমাকে ঝাঁকাতে লাগল। ডোরাকে ধরে তার আম্মু হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। এর মাঝে লতিফা বুবুও আমাকে আর ডোরাকে জাপটে ধরে ফেলল। আমার তখন নানির কথা মনে পড়ল। আমার বুড়ো নানি তো এখানে আসতে পারবে না। আমি তখন সবার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বের হয়ে এলাম।

মাসুদ ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে নিচু গলায় কিছু একটা বলছিল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "মাসুদ ভাই, আমি আমার বাড়ি থেকে আসি?"

মাসুদ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সাথে কাউকে দেব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। লাগবে না।"

"তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমরা পাইকারের জানাজা পড়াব, দাফন করব।"

"ঠিক আছে" বলে আমি ছুটতে লাগলাম। স্কুলঘর থেকে বের হয়ে সড়কের ওপর দিয়ে ছুটতে থাকি, কালী গাংয়ের তীর ধরে ছুটতে থাকি, বলাই কাকুর চায়ের স্টলের পাশ দিয়ে ছুটতে থাকি, কাজী বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই, হাঁপাতে হাঁপাতে আমি উঠানে পা দিলাম। নানি বারান্দার একটা জলচৌকিতে বসে আছে। আমি কখনো নানিকে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে দেখিনি। তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে এত অবাক লাগছিল যে আমি এক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। নানি অন্যমনস্কভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল, তাই আমাকে দেখতে পায়নি। আমি ডাকলাম, "নানি।"

নানির শরীরে কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, তারপর নানি খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল। মনে হচ্ছিল নানি বুঝি মাথা তুলে তাকাতে ভয় পাচ্ছে, যদি মাথা তুলে দেখে আসলে কেউ নাই!

নানি আমার দিকে তাকাল, তারপর হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। আমি ছুটতে ছুটতে এসে নানিকে জড়িয়ে ধরলাম। নানি তার শুকনা দুর্বল হাত দিয়ে আমাকে ধরল। এমনভাবে আমাকে ধরে রাখল যে মনে হলো নানির বুঝি মনে হচ্ছে— তার হাতটা একটু আলগা করলেই আমি বুঝি হারিয়ে যাব। কত দিন থেকে আমি এই মুহূর্তটার কথা ভাবছিলাম! আমি কত দিন থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রথমবার যখন নানির সাথে দেখা হবে তখন নানিকে বলব, "জানো নানি— আমি কিন্তু সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা! আমি আর ডোরা! নানি, আমরা সত্যি সত্যি যুদ্ধ করেছি, মাসুদ ভাই বলেছে আমরা না থাকলে আজকে যুদ্ধে আমরা জিততে পারতাম না— আমরা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নামিয়ে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ টানিয়েছি। ঐ যে গুলির শব্দ শুনছ নানি, এটা কিন্তু যুদ্ধের গুলি না! এইটা আনন্দের গুলি!"

আমি নানিকে কিছুই বলতে পারলাম না, নানিকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

কাঁকনডুবি গ্রামে যুদ্ধ করে মিলিটারি ক্যাম্প দখল করে নেয়ার ঠিক দশ দিন পরে ঢাকায় পাকিস্তানি মিলিটারিরা আত্মসমর্পণ করেছিল।

কাঁকনডুবি গ্রামটি যেভাবে স্বাধীন হয়েছিল, সেদিন ঠিক সেইভাবে যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। মাসুদ ভাই তার কলেজে লেখাপড়া করতে ফিরে গেছে। লতিফা বুবুর বিয়ে হয়ে গেছে– ছেলেটা স্কুলের মাস্টার। আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল লতিফা বুবুর সাথে মাসুদ ভাইয়ের বিয়ে হোক, হয় নাই। মতি রাজাকার আর তার বাবা লতিফ চেয়ারম্যান জেলে। তাদের বাড়িটাতে এখন কেউ থাকে না। কেমন করে থাকবে? গ্রামের মানুষ বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

আমি অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম নীলিমাদের ফিরে আসার জন্য। নীলিমারা আর ফিরে আসেনি। তাদের কোনো খবরও জানি না। তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাও জানি না। যখন দেখলাম নীলিমারা ফিরে আসছে না, ফিরে আসবে বলেও মনে হয় না, তখন একদিন আমি তাদের বাড়ির তুলসীতলা খুঁড়ে নীলিমা কী পুঁতে রেখেছে সেটা বের করলাম। একটা বাঁধানো খাতা। খাতাটা আসলে একটা ডায়েরির মতন। সেখানে কত রকম কথা, গানের লাইন, কবিতা, খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা ছবি, শুকনো ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা। দেখেই বোঝা যায়, এটা নীলিমার খুব নিজস্ব একটা জিনিস কিন্তু সাথে করে নিতে পারেনি। যখন কেউ দেশ ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় তখন কেউ এগুলো সাথে নেয় না। আমি খাতাটা বাঁচিয়ে রেখেছি, যদি কোনো দিন নীলিমার সাথে দেখা হয় তাকে ফিরিয়ে দেব।

অবস্থা যখন একটু স্বাভাবিক হয়েছে তখন একদিন ডোরা তার আম্মু আর বোনের সাথে শহরে চলে গেল। আমার মনে আছে, ঠিক বিদায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবার আগে আমরা যখন কালীগাংয়ের ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি তখন ডোরা আমাকে ফিসফিস করে বলল, "রঞ্জু, তোকে একটা কথা বলি?"

আমি বললাম, "কী কথা?"

"যখন আমি তোকে ছেড়ে চলে যাব তখন কিন্তু তুই মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি না। তাহলে তোকে দেখলেই আমার চোখে পানি চলে আসবে। আমার খুব অল্পতে চোখে পানি চলে আসে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

ঠিক যখন ডোরা আলাউদ্দিন চাচার নৌকাতে উঠতে যাচ্ছে আমি তখন জোর করে মুখটা হাসি হাসি করে রাখলাম। ডোরা যে শুধু তার মুখটা হাসি হাসি করে রাখল তা না, শব্দ করে হাসতে শুরু করল যেন খুবই মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে।

হাসতে হাসতে একসময় ডোরার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি পড়তে লাগল। ডোরা এমন ভান করল যেন সে জানেই না যে তার চোখ থেকে পানি পড়ছে। হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "রঞ্জু, তুই আমাকে চিঠি লিখবি।"

আমি বললাম, "লিখব।"

ডোরা বলল, "লম্বা লম্বা চিঠি লিখবি।"

"লিখব।"

"কাঁকনডুবির সবার খবর দিবি।"

"দিব।"

"সত্যি দিবি তো?"

আমি বললাম, "দিব। সত্যি দিব।"

তখন ডোরা ঘুরে আলাউদ্দিন চাচার নৌকায় উঠে গেল। আমি শেষ পর্যন্ত হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম, চেষ্টা করলাম যেন চোখ থেকে পানি বের না হয়। যখন ডোরা, তার আম্মু আর বোনকে নিয়ে নৌকাটা কালীগাংয়ের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে দূরে সরে যেতে লাগল, আস্তে আস্তে ছোট হয়ে ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল তখন আমার চোখ থেকে পানি বের হয়ে এল।

আশপাশে কেউ নেই তাই আমি চোখ মোছারও চেষ্টা করলাম না।

কী হবে চোখের পানি মুছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~